– মাইকেল মধুসূদন দত্ত ♦ বঙ্গভাষা ১৪৯
– লালন সাঁই ♦ খাঁচার ভিতর অচিন পাখি ১৫১
– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ♦ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ১৫৩
– কাজী নজরুল ইসলাম ♦ আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ১৫৬
– জীবনানন্দ দাশ ♦ বাংলার মুখ আমি ১৫৯
– হাসান হাফিজুর রহমান ♦ অমর একুশে ১৬১
– আলাউদ্দিন আল আজাদ ♦ স্মৃতিস্তম্ভ ১৬৫
– শামসুর রাহমান ♦ তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা ১৬৭
– সৈয়দ শামসুল হক ♦ আমার পরিচয় ১৭০

ছোটগল্প ও অন্যান্য রচনা
– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ♦ পোস্টমাস্টার ১৭৩
– রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ♦ বায়ুযানে পঞ্চাশ মাইল ১৭৯
– বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ♦ পুঁইমাচা ১৮২
– শওকত ওসমান ♦ মৌন নয় ১৯৫
– সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ♦ নয়নচারা ২০১
– জাহানারা ইমাম ♦ একাত্তরের দিনগুলি ২০৮
– হাসান আজিজুল হক ♦ খাঁচা ২১৬
– আখতারুজ্জামন ইলিয়াস ♦ অপঘাত ২২৯

প্রবন্ধ
– বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ♦ বাঙ্গালা ভাষা ২৫২
– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ♦ সভ্যতার সংকট ২৫৯
– হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ♦ তৈল ২৬৬
– প্রমথ চৌধুরী ♦ যৌবনে দাও রাজটিকা ২৭০
– কাজী নজরুল ইসলাম ♦ বর্তমান বিশ্বসাহিত্য ২৭৭
– মুহম্মদ আবদুল হাই ♦ আমাদের বাংলা উচ্চারণ ২৮৩
– কবীর চৌধুরী ♦ আমাদের আত্মপরিচয় ২৯৩

নাটক
– মুনীর চৌধুরী ♦ কবর ২৯৯

(♦ এই কোর্সের অনুমোদিত পাঠ থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রতি সেমিস্টারে বদল সাপেক্ষ প্রয়োজনীয় পাঠ নির্বাচন করবে ; অনুমোদিত নয় এমন কোনো পাঠ সংযুক্ত করা যাবে না।)

প্রথম খণ্ড

ভাষা ও নির্মিতি

ভাষা

ভাষা হলো যোগাযোগের মাধ্যম। কিন্তু মাতৃভাষা মানুষের শুধু যোগাযোগ নয় চিন্তা স্বপ্ন আর বেঁচে থাকার প্রেরণা। প্রাণী মাত্রেরই ভাষা আছে। সে বিচারে প্রত্যেক মানুষেরই ভাষা আছে। তবে সব ভাষা সুসংবদ্ধ নয়। বাঙালির সৌভাগ্য, আমরা এমন একটি ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে পেয়েছি যা প্রাচীন এবং সুসংবদ্ধ। ভাষা প্রকাশের যে দক্ষতা, যেমন: শোনা বলা পড়া লেখা এর সবই সুন্দরভবে বাংলা ভাষাতে অর্জন করা চলে। পৃথিবীর অনেক ভাষাতেই লিপি প্রয়োজনের তুলনায় সংখ্যায় অতি নগণ্য। সে ভাষাতেও ঠিকঠাকভাবে মনের ভাব প্রকাশ করে লেখা যায় না। সে দিক থেকে বাংলা ভাষায় আছে এমন ধ্বনিগুচ্ছ এবং লিপির বিন্যাস যা একটি অনিন্দ্যসুন্দর ভাষার দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। তারপর এই ভাষাতে যুক্ত হয়েছে যতিচিহ্নের শৃঙ্খলা; এসেছে উচ্চারণের রীতি-পদ্ধতি; এসেছে বানানের নিয়ম। এ-সবই একদিনে হয়নি, হয়েছে শত শত বছর ধরে, বহু মনীষী ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগের কারণে। আজ মাতৃভাষার বিবেচনায় পৃথিবীতে বাংলা ভাষার স্থান চতুর্থ। বাংলাদেশে প্রধান ভাষা বাংলা। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ডসহ ভারতের নানাপ্রান্তে বাংলা ভাষার মানুষ রয়েছে; আছে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জার্মানিসহ বহির্বিশ্বের বেশ কিছু দেশে। এতোগুলো দেশে বহু সংখ্যক বাঙালির মাতৃভাষা বাংলার প্রাণকেন্দ্র এই বাংলাদেশ। বাংলা এ দেশের সংবিধান-স্বীকৃত একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যে চেতনার সৃষ্টি হয় সে। ধারাবাহিকতাতেই ১৯৭১ সালে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের। আজ ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত এবং সে-সূত্রেই বিশ্বব্যাপী মানুষ ২১শে ফেব্রুয়ারি ও বাংলা ভাষা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠছে। তাছাড়াও এ ভাষার মহান কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন। বাংলা ভাষা নিয়ে বিশ্ববাসীর আগ্রহ সেদিন থেকেই। এখন এ আগ্রহ অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর নানা স্তর অতিক্রম করে বাংলা ভাষার জন্ম। এই ভাষায় রচিত প্রাপ্ত আদিগ্রন্থের নাম 'চর্যাপদ'। হাজার বছর আগে এই গ্রন্থ রচিত হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক 'চর্যাপদ' আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা ভাষার জন্ম ও বিকাশধারায় মুখের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা, বিশেষ করে লেখার ভাষা দুটো রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। তাই মুখের ভাষা এবং লেখার ভাষার বেশ বৈচিত্র্য দেখা যায়। আজ তা বেশ স্পষ্ট। বাঙালির মুখে যেমন আঞ্চলিক ভাষারীতি আবার প্রমিত ভাষাতেও তাকে কিন্তু অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করতে হয়; বন্ধুমহলে আবার খানিকটা আটপৌরে ভাষাতে তাকে কথা বলতে দেখা যায়। লেখার ক্ষেত্রে এখন অবশ্য চলিতরীতিই প্রধান হয়ে উঠেছে। তবে, কিছুকাল আগেও সাধুরীতি ব্যবহার হতো প্রচুর। সব মিলিয়ে

একথা বলা যায়, বাংলা হলো জীবন্ত ভাষা। কারণ, এর আছে প্রয়োজনীয় ধ্বনি সমাহার, শব্দরাশির প্রাণবন্যা, গ্রহণ-বর্জনের অপার শক্তি আর অমিত বাক্য সৃজনের সর্বোচ্চ সংখ্যক উপাদান। মুখের ভাষার ক্ষেত্রে একটি ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপকে ভৌগোলিক উপভাষা বলা হয়। বাংলা ভাষার প্রধান প্রধান ভৌগোলিক উপভাষাগুলো বঙ্গীয়, কামরূপী, বরেন্দ্রী, ঝাড়খণ্ডী, রাঢ়ী নামে পরিচিত। আবার, বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগের ভাষার মধ্যেও কিন্তু এ দিক থেকে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হবে। যেমন, রংপুরের ভাষার সঙ্গে চট্টগ্রামের ভাষা মিলবে না, সিলেটের ভাষার সঙ্গে মিলবে না বরিশালের ভাষার। এ কারণেই যে-কোনো ভাষারই মান-রূপ থাকতে হয় এবং বাংলা ভাষার তা আছে। এই মান-রূপটি চর্চার মধ্য দিয়ে আত্মস্থ করা জরুরি। কারণ, ভৌগোলিক উপভাষাগুলো মানুষ নির্দিষ্ট অঞ্চলে জন্মাবার কারণে পরিপার্শ্ব থেকে স্বাভাবিকভাবেই অর্জন করে থাকে কিন্তু ভাষার মান-রূপটি তাকে অর্জন করতে হয় আয়াসের মধ্যেমে। এই আয়াসের সঙ্গে মনোযোগ সংযুক্ত হলে ভাষার মান-রূপটি আয়ত্ত করা খুবই সহজ হয়ে ওঠে।

বাংলা ধ্বনি ও বর্ণ

ভাষার সংগঠন বিশ্লেষণের জন্য অবয়বগত দিক থেকে ধ্বনি, রূপ ও বাক্ সংগঠন এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। ভাষার দেহের অংশ না হলেও ভাষার শব্দ ও বাক্যের অর্থ বা তাৎপর্যের রয়েছে নিজস্ব সংগঠন। একইভাবে লিখন প্রণালীর এবং বানান পদ্ধতির স্বতন্ত্র সংগঠন রয়েছে। ভাষার ধ্বনি সংগঠন বিশ্লেষণের তত্ত্ব 'ধ্বনিতত্ত্ব' (Phonology), রূপ সংগঠন বিশ্লেষণের তত্ত্ব 'রূপতত্ত্ব' (Morphology), বাক্য সংগঠন বিশ্লেষণের তত্ত্ব 'বাক্যতত্ত্ব' (Syntex), অর্থ সংগঠন বিশ্লেষণের তত্ত্ব 'অর্থতত্ত্ব' (Semantics) আর 'লিখন প্রণালী' বা Writing System বিশ্লেষণের তত্ত 'Graphemics'। মুখের ভাষার বর্ণনা বা বিশ্লেষণে ধ্বনি সংগঠন বিশ্লেষণ হল ধ্বনিতত্ত্ব বা Phonology ; সেই আদলে কোন কোন বাংলা ব্যাকরণে বাংলা বর্ণমালার বর্ণের উচ্চরণ বিশ্লেষণ 'ধ্বনিতত্ত্ব' শিরোনামে করা হয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', পবিত্র সরকারের 'পকেট বাংলা ব্যাকরণ', জ্যোতিভূষণ চাকীর 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' সমূহে 'ধ্বনিতত্ত্ব' শিরোনাম ব্যবহৃত। পক্ষান্তরে, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' ও মুহম্মদ এনামুল হক 'ব্যাকরণ-মঞ্জরী' গ্রন্থে যথাক্রমে 'ধ্বনি প্রকরণ' ও 'বর্ণ ও ধ্বনি প্রকরণ' শিরোনাম ব্যবহার করেছেন।

মুখের ভাষার ধ্বনির উচ্চারণ স্থান ও রীতি এবং শ্রুতির আলোচনা 'ধ্বনিতত্ত্ব', কিন্তু লিখিত ভাষার বর্ণমালার আলোচনার 'ধ্বনিতত্ত্ব' নামকরণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। 'ধ্বনি প্রকরণ' পরিভাষাও সেই সমস্যার সমাধান করে না। সে জন্য 'বর্ণ ও ধ্বনি প্রকরণ' বা 'ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ' তুলনামূলকভাবে লিখিত ভাষার ব্যাকরণের বর্ণ ও বর্ণের উচ্চারণ বা ধ্বনির আলোচনায় অধিকতর উপযোগী মনে হয়। 'ধ্বনিতত্ত্ব' শিরোনামেও অবশ্য কোন দোষ নেই; কারণ একটি ভাষার লিখন প্রণালীর বর্ণমালা সেই ভাষার ধ্বনিমালারই প্রতীক, ধ্বনি বা ধ্বনি পরম্পরার প্রতিলিপি বা প্রতিবর্ণীকরণের প্রয়াস থেকেই লিপি, বর্ণ বা হরফের সৃষ্টি। আমরা সচেতনভাবেই 'অক্ষর' শব্দটি লিপি বা বর্ণ অর্থে ব্যবহার থেকে বিরত থেকেছি কারণ ব্যাকরণে, ছন্দশাস্ত্রে, ভাষাতত্ত্বে 'অক্ষর' ইংরেজি Syllable অর্থে ব্যবহৃত, Script বা Letter অর্থে নয়। বাংলাতে অক্ষর বলতে অনেক সময় লিপি বা বর্ণ নির্দেশ করা হলেও 'বাংলা

ব্যাকরণে' 'অক্ষর'-এর পারিভাষিক অর্থ 'সিলেবল।' এক আয়াসে উচ্চরিত ধ্বনি বা ধ্বনি পরম্পরাকে অক্ষর বলে। সুতরাং আমরা লিপি বা বর্ণ বা হরফ অর্থে অক্ষর শব্দটি ব্যবহার করব না। সিলেবল অর্থে অক্ষর শব্দটি ব্যবহার করব।

স্বর ও ব্যঞ্জন

বাক্‌যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত যেসব ধ্বনির সাহায্যে ভাষা সৃষ্টি হয়, সে সব ধ্বনির মৌলিক বা প্রাথমিক বিভাজন হচ্ছে স্বর ও ব্যঞ্জন। জিহ্বা বা ঠোঁটের সঙ্গে কোনরূপ স্পর্শ ছাড়া অর্থাৎ মুখ বিবর বা নাকের মধ্যে বিনা বাধায় ঘোষবৎ যেসব ধ্বনি উচ্চারিত হয়, সেগুলোই হল স্বরধ্বনি ; যেমন–আ ই উ এ ও প্রভৃতি। স্বরধ্বনির মৌখিক বা সানুনাসিক উভয় প্রকার উচ্চারণ সম্ভব। মৌলিক স্বরধ্বনি উচ্চারণে বায়ু বিনা বাধায় কেবল মুখের ভেতর দিয়ে আর সানুনাসিক বা আনুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণে বাতাস মুখ ও নাকের ভেতর দিয়ে বিনা বাধায় বেরিয়ে যায়। যেসব ধ্বনি স্বরধ্বনি নয় সেগুলোকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলা যেতে পারে। স্বরধ্বনি উচ্চারণে মুখ বিবর, জিহ্বা বা ঠোঁটে কোন প্রকার বাধাপ্রাপ্ত হয় না কিন্তু ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে মুখ বিবর বা ঠোঁটে জিহ্বার সাহায্যে বাধার সৃষ্টি হয়। ব্যঞ্জনধ্বনিও মৌলিক ও নাসিক্য উভয় প্রকার হতে পারে।

মৌখিক ব্যঞ্জনধ্বনিতে বাতাস মুখ দিয়ে আর নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে বাতাস কেবল নাক দিয়ে বের হয়ে যায়। ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ, ক খ গ ঘ, চ ছ জ ঝ, ট ঠ ড ঢ, ত থ দ ধ, প ফ ব ভ প্রভৃতি। স্বরধ্বনি বিচারের প্রধান তিনটি মাপকাঠি অনুসারে একটি স্বধ্বনি উচ্চরণে জিহ্বার অংশ, জিহ্বার উচ্চতা ও ঠোঁটের আকৃতি বিচার করে যথাক্রমে সম্মুখ-মধ্য-পশ্চাৎ, উচ্চ-মধ্য-নিম্ন এবং প্রসৃত-গোলাকৃতি রূপে চিহ্নিত করা হয়। ব্যঞ্জনধ্বনির বিচার করা হয় একটি ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চরণ স্থান ও উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী। স্বরধ্বনি যৌগিক স্বর বা অর্ধস্বর রূপেও উচ্চারিত হয়। ব্যঞ্জনধ্বনি একক, যুগ্ম বা যুক্তভাবে উচ্চারিত হতে পারে। একটি ভাষার ধ্বনি সংগঠন বিশ্লেষণ করতে গেলে সে ভাষার স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর সনাক্তকরণ এবং যৌগিক ও অর্ধস্বরসহ স্বরধ্বনিগুলোর আর সংযুক্তসহ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির বিশ্লেষণ করতে হয়।

বাংলা স্বরধ্বনি ও স্বরবর্ণ

মান কথ্য বাংলার স্বরধ্বনির সংখ্যা ৭টি–এ আ ই উ এ ও এ্যা। স্বরধ্বনি বিচারের তিনটি মাপকাঠিতে জিহ্বার যে অংশ থেকে সৃষ্ট, জিহ্বার উচ্চতা এবং ঠোঁটের আকৃতি অনুসারে বাংলা স্বরধ্বনিগুলোকে নিম্নোক্তভাবে সাজানো যায়। এ স্বরধ্বনিগুলোর প্রতিটির মৌখিক সানুনাসিক উচ্চারণ সম্ভবপর।

সম্মুখ প্রসৃত	মধ্য	পশ্চাৎ গোলাকৃতি
উচ্চ i ই		u উ উচ্চ
উচ্চ মধ্য e এ		o ও উচ্চ মধ্য
নিম্ন মধ্য a এ্যা		c অ নিম্ন মধ্য
নিম্ন	a আ	

মান কথ্য বাংলায় যে ৭টি স্বরধ্বনি পাওয়া যায় বিভিন্ন বাংলা উপভাষায় স্বরধ্বনির সংখ্যা কমবেশি অনুরূপ, তবে মান বাংলার স্বরধ্বনির সঙ্গে বিভিন্ন বাংলা উপভাষার স্বরধ্বনির তুলনা আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় নয়। আমাদের আলোচ্য মান বাংলা স্বরধ্বনির সঙ্গে বাংলা স্বরবর্ণগুলোর সম্পর্ক বিচার। আমরা আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপিতে বাংলা স্বরধ্বনি এবং সে ধ্বনির প্রতীকরূপে যেসব বাংলা বর্ণ বা লিপি ব্যবহৃত হয় তা নির্দেশ করছি।

স্বরধ্বনি	স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনান্ত স্বর বা-কার চিহ্ন
c	অ	া
a	আ	ি, ী
i	ই ঈ	ু ূ
u	উ ঊ	ে
e	এ	ো
o	ও	ৃ, একক স্বর নয়, বাংলায় উচ্চরণ রি+ ই = বা ঋ
ri	ঋ	ৈ, একক স্বর নয়, বাংলায় ও+ ই = ঐ যৌগিক স্বর
oi	ঐ	ৌ, একক স্বর নয়, বাংলায় ও+ উ = ঔ যৌগিক স্বর
ou	ঔ	

বাংলায় স্বরধ্বনি ও স্বরবর্ণের ঐ তালিকা পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বাংলায় 'অ' ছাড়া প্রতিটি স্বরধ্বনির ব্যঞ্জনান্ত স্বরের প্রতীক রয়েছে; যেমন আ–া, ই–ি, ঈ–ী, উ–ু, ঊ–ূ, এ–ে। এমনকি ঋ-এর জন্য ৃ, ঐ-এর জন্য ৈ এবং ঔ-এর জন্য ৌ-কার রয়েছে। কেবল অ-এর ব্যঞ্জনান্ত রূপ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যেই অন্তর্নিহিত; যেমন, ক–kc, খ–khc, গ–gc, ঘ–ghc ইত্যাদি। কিন্তু ক্–k, খ্–kh, গ্–g ঘ্–ghc যার অর্থ, হসন্ত চিহ্ন দিলে ব্যঞ্জনবর্ণ শুধু ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতীক অন্যথা একটি ব্যঞ্জন ও স্বরধ্বনি অ-এর প্রতীক। আমরা অবশ্য লেখার সময় সর্বদা হসন্ত ব্যবহার করি না। বাংলা বর্ণমালা লিখতে ও পড়তে শিখলে বুঝতে পারা যায় বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ কখন শুধু ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতীক আবার কখন তা ব্যঞ্জন + অ-এর প্রতীক। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণমালায় অ-এর ব্যঞ্জনান্ত রূপ-এর স্বতন্ত্র কোন প্রতীক না থাকার ফলে বিদেশিদের বাংলা লিখতে, পড়তে ও শিখতে একটু অসুবিধা হলেও বাংলা লিখন প্রণালী বাহুল্য বর্জিত হয়েছে। বাংলা বর্ণমালা আক্ষরিক (Syllabic) এবং অনাক্ষরিক (Alphabetic)-এর মিশ্র লিখন প্রণালী।

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি ও বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ

উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী মান কথ্য বাংলার ২৯টি ব্যঞ্জনধ্বনির তালিকা, পাশে বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণ :

ব্যঞ্জন বর্ণগুলো হসন্ত চিহ্ন দিয়ে দেখান হয়েছে কারণ বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণগুলোতে ব্যঞ্জনধ্বনি + অ-এর ব্যঞ্জনান্ত রূপ নিহিত। সেজন্য হসন্ত দিয়ে ব্যঞ্জনবর্ণকে কেবল ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতীক রূপে নির্দেশ করা হয়েছে। ঐ তালিকা পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হবে যে, কণ্ঠনাসিক্য ব্যঞ্জনবর্ণ ঙ এবং ং দন্ত্য ব্যঞ্জন ত ও ৎ-এর উচ্চারণ এক, পশ্চাৎ কণ্ঠ্য হ এবং বিসর্গের উচ্চারণ

অভিন্ন। তালব্য স্বল্পপ্রাণ বর্গীয় জ এবং অন্তস্থ য-এর উচ্চারণে কোন পার্থক্য নেই। তালব্য ও দন্ত্য উষ্ম শিসজাত ধ্বনির প্রতীক রূপে শ, ষ, স তিনটি বর্ণই ব্যবহৃত হয়, মূর্ধন্য ড় এবং ঢ়-এর উচ্চারণ এক ও অভিন্ন। দন্ত্য ন এবং মূর্ধন্য ণ বর্ণের উচ্চারণে কোন পার্থক্য নেই; এমনকি ঞ-র উচ্চারণও ন-এর মত। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করা যেতে পারে–বাঙ্‌লা/বাংলা, অর্থাত/অর্থাৎ, বাহ্‌/বাঃ, জাদুঘর/যাদুঘর, শাদা/সাদা, আসা/আশা, আশার/আষাঢ়, আষাঢ়/আসার, ষাঢ়/সাড়, শাড়ি/সারি, শব/সব, স্বরযন্ত্র/ষড়যন্ত্র, রানি/রাণি, সরণি/স্মরণি, সুসমতা/সুষমতা ইত্যাদি।

	স্পৃষ্ট				নাসিক্য	তাড়নজাত	পার্শ্বিক	উষ্ম ও শিস
	অঘোষ		ঘোষ					
	স্বল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	স্বল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ				
কণ্ঠ্য	k ক্	kh খ্	g গ্	gh ঘ্	y ঙ্/ং			h হ্/ঃ
তালব্য	c চ্	ch ছ্	j জ্/য	jh ঝ্				√s
মূর্ধন্য	t ট্	th ঠ্	d ড্	dh ঢ্		r ড়/ঢ়		শ্/ষ্/স্
দন্ত্য	t ত্/ৎ	th থ্	d দ্	dh ধ্	n ন্/ণ্/ঞ	r র্	l ল্	s স্/শ্
ওষ্ঠ্য	p প্	ph ফ্	b ব্	bh ভ্	m ম্			

সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ

ক্ – প্রথম বর্ণ
ক + ক = ক্ক, ক + র =ক্র, ক্র, ক + ত = ক্ত, ক + ল = ক্ল, ক + স = ক্স, ক + য়=ক্য
খ্ – প্রথম বর্ণ
খ + র = খ্র, খ + য় = খ্য
গ্ – প্রথম বর্ণ
গ + দ = গ্দ, গ + ধ = গ্ধ, গ + ন = গ্ন, গ + র = গ্র, গ + ল = গ্ল
ঘ্ – প্রথম বর্ণ
ঘ + র = ঘ্র
ঙ্ – প্রথম বর্ণ
ঙ + ক = ঙ্ক, ঙ + খ = ঙ্খ, ঙ + গ = ঙ্গ, ঙ + ঘ = ঙ্ঘ
চ্ – প্রথম বর্ণ
চ + চ = চ্চ, চ + ছ = চ্ছ, চ + য় = চ্য
ছ্ – প্রথম বর্ণ
ছ + র = ছ্র
জ্ –প্রথম বর্ণ
জ + জ = জ্জ, জ + ঝ = জ্ঝ, জ + র = জ্র, জ + য় = জ্য
ঞ্ – প্রথম বর্ণ
ঞ + চ = ঞ্চ, ঞ + জ = ঞ্জ, ঞ + ছ = ঞ্ছ

ট্ ড্ – প্রথম বর্ণ
ট + ট = ট্ট, ট + র = ট্র, ড + ড = ড্ড, ড + র = ড্র
ণ্ – প্রথম বর্ণ
ণ + ট = ণ্ট, ন + ঠ = ণ্ঠ, ন + ড = ণ্ড, ণ্ড, ণ + হ = ণ্হ
ত্ – প্রথম বর্ণ
ত + ত = ত্ত, ত + থ = ত্থ, ত + র = ত্র, ত্র
থ্ – প্রথম বর্ণ
থ + র = থ্র
দ্ – প্রথম বর্ণ
দ + র = দ্র, দ + ধ = দ্ধ
ন্ – প্রথম বর্ণ
ন + ত = ন্ত, ন + দ = ন্দ, ন + থ = ন্থ, ন + ধ = ন্ধ, ন + হ = ন্হ
প্ – প্রথম বর্ণ
প + ট = প্ট, প + ঠ = প্ঠ, প + ত = প্ত, প + প = প্প, প + র = প্র, প + ল = প্ল
ফ্ – প্রথম বর্ণ
ফ + র = ফ্র
ব্ – প্রথম বর্ণ
ব + দ = ব্দ, ব + ধ = ব্ধ, ব + র = ব্র, ব + ল = ব্ল
ভ্ – প্রথম বর্ণ
ভ + র = ভ্র, ভ্র
ম্ – প্রথম বর্ণ
ম + র = ম্র, ম + ল = ম্ল, ম + প = ম্প, ম + ফ = ম্ফ, ম + ব = ম্ব, ম + ভ = ম্ভ, ম +ম = ম্ম
শ্ – প্রথম বর্ণ
শ + চ = শ্চ, শ + ছ = শ্ছ, শ + ন = শ্ন, শ + ম = শ্ম, শ + র = শ্র, শ + ল = শ্ল
ষ্ – প্রথম বর্ণ
ষ + ক = ষ্ক, ষ + ট = ষ্ট, ষ + ঠ = ষ্ঠ, ষ + ণ = ষ্ণ, ষ + প = ষ্প, ষ + ম = ষ্ম
র্ – প্রথম বর্ণ
র + ক = র্ক, র + খ = র্খ, র + গ = র্গ, র + ঘ = র্ঘ, র + চ = র্চ, র + ছ = র্ছ, র + জ = র্জ
ল্ – প্রথম বর্ণ
ল + ক = ল্ক, ল + গ = ল্গ, ল + ট = ল্ট, ল + ল = ল্ল, ল + প = ল্প, ল + ম = ল্ম, ল + য় = ল্য
হ্ – প্রথম বর্ণ
হ + ব = হ্ব, হ + ল = হ্ল
স্ – প্রথম, তিন বর্ণের সংযুক্তি
স + ত + র = স্ত্র, স + প + র = স্প্র
স + ক + র = স্ক্র, ন + ত + র = ন্ত্র

যুক্তব্যঞ্জন উচ্চারণের নিয়ম

পবিত্র সরকার 'পকেট বাংলা ব্যাকরণে' যুক্ত ব্যঞ্জন উচ্চারণের কয়েকটি নিয়ম লিপিবদ্ধ করেছেন; যথা–

১. ম-ফলা, য-ফলা, আর ব-ফলার ক্ষেত্রে শব্দের গোড়ায় শুধু সঙ্গের ব্যঞ্জনটিই উচ্চারিত হয়। 'ফলা'র কোনও উচ্চারণ নেই। যেমন–স্মরণ (শঁরোন্) ; ধ্যান, ব্যয় [ব্যায়্], শ্বাস [শাশ্] ব্যতিক্রম ন্ম, ল্ম, র্ম, ল্ম। কিন্তু শব্দের গোড়ায় না থাকলে ওই ব্যঞ্জনগুলিরই ডবল উচ্চারণ হয়–বিস্মরণ [বিশ্শরোন], অধ্যায় [ওদ্ধায়], অব্যয় [অব্বোয়], প্রশ্বাস [প্রশ্শাশ্]।

ক্ষ আর জ্ঞ – এ দুটি যুক্ত ব্যঞ্জন ও শব্দের গোড়ায় খ আর গ, আর গোড়ায় না থাকলে ক্খ্ আর গ্গ্ ; যেমন–ক্ষত [খতো] কিন্তু বিক্ষত [বিক্খতো], জ্ঞাত [গ্যাঁতো] কিন্তু অজ্ঞাত [অগ্গাতো]।

২. র-ফলার ক্ষেত্রেও এইভাবে শব্দের গোড়ায় র-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনটি একবার উচ্চারিত হয়, কিন্তু অন্য জায়গায় ডবল হয়ে যায়; যেমন– ত্রাণ কিন্তু পরিত্রাণ [পোরিত্ত্রাণ], প্রথম [প্রোথোম্] কিন্তু বিপ্র [বিপ্প্রো], শ্রম [শ্রোম্] কিন্তু বিশ্রাম [বিস্স্রাম্]।

কিন্তু আজকালকার সচেতন, পরিশীলিত উচ্চরণে ঋ-ফলা, যা বাংলায় 'রি' ছাড়া আর কিছুই নয়, তার ক্ষেত্রে কোথাও ব্যঞ্জন ডবল হয় না ; যেমন–বিক্রীত [বিক্রিতো] কিন্তু বিকৃত [বি-ক্রিতো], মৃত [মৃিতো], অমৃত [অ-মৃিতো]।

সাধারণ ও স্বাভাবিক উচ্চারণে শব্দের গোড়ায় না থাকলে ঋ-কারের ব্যঞ্জন ডবল হয়–অমৃম্রিতো, সুকৃতি [সুক্রিতি], অপসৃত [অপোস্সৃিতো] ইত্যাদি আমরা প্রায় শুনি।

সাধু ও চলিত (প্রমিত) ভাষা

বাংলা ভাষায় লিখিত ভাষার দুটি রূপ, সাধু ও চলিত। সাধু ভাষা পুরাতন, চলিত ভাষা নতুন। সাহিত্যের ভাষা বিশ শতকের প্রথম দেড় দশক অবধি ছিল প্রধানত সাধু ভাষা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মীর মশাররফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সকলেই সাধু ভাষায় প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি রচনা করেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ সাধু ভাষায় নাটক রচনা করেছেন। তবে সংলাপে তারা কখনও কখনও কথ্য ভাষা ব্যবহার করতে দ্বিধা করেননি। প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' গ্রন্থে সাধু ভাষা ও কলকাতার কথ্য ভাষার মিশ্রিত গদ্য পাওয়া যায়। 'আলালের ঘরের দুলালে' সাধু ভাষার সঙ্গে কথ্য ভাষার মিলন ঘটানোর প্রয়াস আর 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'তে সাধু ভাষাকে কলকাতার আদিবাসীদের উপভাষার আশ্রয় করে লেখা গদ্য পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত দুই রীতির একটিও বাংলা সাহিত্যের গদ্য হয়ে উঠতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্য সৃষ্টিতে সাধু ও চলিত উভয় রীতিই ব্যবহার করেছেন। তবে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্র' পত্রিকায় লেখার সময় থেকে তিনি চলিত রীতির গদ্যকে তার গদ্য সাহিত্যের বাহন করেন। প্রমথ চৌধুরী বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে চলিত রীতিতে প্রবন্ধ এবং ১৯১৪ সালে 'সবুজপত্র' প্রকাশ করে চলিত রীতিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। বাংলা ভাষায় সাধু ও চলিত উভয় গদ্যরীতিই সাহিত্যের ভাষা এবং কৃত্রিম, তবে লিখিত চলিত রীতির ভাষা মান কথ্য রীতির কাছাকাছি। সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য মূলত সর্বনাম, ক্রিয়া ও শব্দ ব্যবহারে। চলিত ক্রিয়াপদের রূপ কতিপয় ক্ষেত্রে সংকুচিত বা সংক্ষিপ্ত, সর্বনামের রূপও

তাই। সাধু বাংলায় তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের আর চলিত বাংলায় অর্ধতৎসম বা সংস্কৃত নয় এমন সব শব্দের ব্যবহার বেশি; যেমন–সাধু হংস, চলিত হাঁস, সাধু বৃক্ষ, চলিত গাছ, সাধু পুত্র, চলিত ছেলে, সাধু নাসিকা, চলিত নাক, সাধু তপ্ত, চলিত গরম, সাধু দংশন, চলিত কামড়, সাধু আগমন, চলিত আসা, সাধু দান ও চলিত দেওয়া ইত্যাদি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, চলিত ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়া ব্যবহার করেও বাক্যে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা যায় না; যেমন–তাহারা তাহাদের সন্তানদিগকে লইয়া ঢাকা হইতে ট্রেনযোগে চট্টগ্রাম যাত্রা করিল (সাধু), তারা তাদের সন্তানদের নিয়ে ঢাকা থেকে ট্রেনে চট্টগ্রাম যাত্রা করল (চলিত), তারা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঢাকা থেকে ট্রেনে চিটাগাং রওনা হল।

বাংলা 'কর' ধাতু বিভিন্ন পুরুষ ও কালে সংযোজন ও প্রসারণ থেকে বাংলা সাধু ও চলিত রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়া রূপের উদাহরণ :

সর্বনাম–ক্রিয়া

সাধু– আমি/আমরা করি, করিতেছি, করিয়াছি, করিয়াছিলাম, করিতেছিলাম, করিলাম, করিব, করিতে থাকিব।

চলিত– আমি/আমরা করি, করছি, করেছি, করেছিলাম, করছিলাম, করলাম, করব, করতে থাকব।

সাধু– তুমি/তোমরা কর, করিতেছ, করিয়াছ, করিয়াছিলে, করিতেছিলে, করিলে, করিবে, করিতে থাকিবে।

চলিত– তুমি/তোমরা কর, করছ, করেছ, করেছিলে, করছিলে, করলে, করবে, করতে থাকবে।

সাধু– সে/তাহারা করে, করিতেছে, করিয়াছে, করিয়াছিল, করিতেছিল, করিল, করিবে, করিতে থাকিবে।

চলিত– সে/তারা করে, করছে, করেছে, করেছিলে, করছিলে, করল, করবে, করতে থাকবে।

সাধু– তিনি/তাঁহারা/আপনি/আপনারা/উনি/উনারা করেন, করিতেছেন, করিয়াছেন, করিয়াছিলেন, করিতেছিলেন, করিলেন, করিবেন, করিতে থাকিবেন।

চলিত– তিনি/তাঁরা/উনি/ওঁরা/আপনি/আপনারা করেন, করছেন, করেছেন, করেছিলেন, করছিলেন, করলেন, করবেন, করতে থাকবেন।

সাধু– আমি/আমরা করাই, করাইতেছি, করাইয়াছি, করাইতেছিলাম, করাইয়াছিলাম, করাইলাম, করাইব, করাইতে থাকিব।

চলিত– আমি/আমরা করাই, করাচ্ছি, করিয়েছি, করিয়েছিলাম, করাচ্ছিলাম, করালাম, করাব, করাতে থাকব।

সাধু– তুমি/তোমরা করাও, করাইতেছ, করাইয়াছ, করাইতেছিলে, করাইয়াছিলে, করাইলে, করাইবে, করাইতে থাকিবে।

চলিত– তুমি/তোমরা করাও, করাচ্ছ, করিয়েছ, করিয়েছিলে, করাচ্ছিলে, করালে, করাবে, করাতে থাকবে।

সাধু– সে/তাহারা/উনি/উনারা করায়, করাইতেছে, করাইয়াছে, করাইতেছিল, করাইয়াছিল, করাইল, করাইবে, করাইতে থাকিবে।

চলিত– সে/তারা/ও/ওরা করায়, করাচ্ছে, করিয়েছে, করিয়েছিল, করাচ্ছিল, করাল, করাবে, করাতে থাকবে।

সাধু– আপনি/আপনারা/তিনি/তাঁহারা/উনি/উনারা করান, করাইতেছেন, করাইয়াছেন, করাইতেছিলেন, করাইয়াছিলেন, করাইলেন, করাইবেন, করাইতে থাকিবেন।

চলিত– আপনি/আপনারা/তিনি/তাঁরা/ওঁরা/উনারা করান, করাচ্ছেন, করিয়েছেন, করিয়েছিলেন, করাচ্ছিলেন, করালেন, করাবেন, করাতে থাকবেন।

এসব উদাহরণ থেকে বুঝা যায়, সর্বনামে তাহারা > তারা, তাহার > তার, তাহাদের > তাদের, উনি > ও, উনারা > ওরা, উনার/ওনার/ওর, উহাদের/ওদের যথাক্রমে সাধু ও চলিত রূপ। অনুরূপভাবে, ক্রিয়াতেও করিতেছি > করছি, করিয়াছি > করেছি, করিয়াছিলাম > করেছিলাম, করিতেছিলাম > করছিলাম, করিলাম > করলাম, করিব > করব, করিতে > করতে, করাইয়া, করিয়ে, করাইতে > করাতে যথাক্রমে সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদের রূপ। এ ছাড়া সাধু রীতিতে ইহা, উহা, যাহা, তাহা, চলিত রীতিতে ইহা > এ, এটা, উহা > ও, ওটা, সেটা, যাহা > যা, তাহা > তা, ইহার > এর, উহার > ওর, তাহার > তার, যাহার > যার রূপে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু চলিত রীতি মানে কথ্যরীতির কাছাকাছি সে জন্য সাধু রীতি অপেক্ষা চলিত রীতিতে ভাষার পরিবর্তন অধিক।

মৌখিক বা কথ্য ভাষায় আঞ্চলিক ও মান কথ্য ভাষার মিশ্রণ দূষণীয়। যেমন লিখিত ভাষায় সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ দূষণীয়, যে মিশ্রণকে গুরু চণ্ডালি বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মান কথ্য এবং চলিত লিখিত রীতিতে যথাক্রমে বিভিন্ন উপভাষা ও সাধু ভাষার মিশ্রণ লক্ষ্য

করা যায় যা সচেতনভাবে পরিহার করা উচিত। একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন, মৌখিক বা কথ্য বাংলা ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈচিত্র্য বা উপভাষাগুলি জীবন্ত ভাষা। কাজে কাজেই উপভাষা অশুদ্ধ, মান ভাষা শুদ্ধ এই ধারণা ভুল। বিভিন্ন উপভাষার বা উপভাষার সঙ্গে মান ভাষার মিশ্রণ ঘটালে ভাষা অশুদ্ধ হয়ে পড়তে পারে। তেমনি সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা দুটিই শুদ্ধ, মিশ্রণ ঘটলে অশুদ্ধ। সুতরাং যখন বিশেষ কোন আঞ্চলিক বা উপভাষা বলব তখন কেবল সেটিই বলব; তা অন্য উপভাষা বা মান ভাষার সঙ্গে মেশাব না। আবার যখন মান ভাষা

ব্যবহার করব তখন তার সঙ্গে কোন উপভাষা মিশিয়ে ফেলব না। যখন সাধু ভাষায় লিখব তখন চলিত ভাষার সঙ্গে মেশাব না। আবার যখন চলিত ভাষা লিখব তখন সাধু সর্বনাম বা ক্রিয়াপদ ব্যবহার করব না। আমরা কথা বলা বা লেখার সময় মাঝে মাঝে আঞ্চলিক, মান, সাধু, চলিত সব মিশিয়ে খিচুড়ি করে ফেলি যা যথার্থই গ্রাম্যতা ও মূর্খতার লক্ষণ। এ অভ্যাস পরিবর্তন করা প্রয়োজন। মুখের ভাষার ক্ষেত্রে আমরা ঘরে বা গ্রামে আঞ্চলিক এবং বাইরে আনুষ্ঠানিক পরিবেশে মান কথ্য-ভাষা ব্যবহার করে থাকি বা অবস্থা ও পরিবেশ অনুসারে যথার্থ আর লেখার জন্যে এখন প্রধানত চলিত ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে। সুতরাং লেখার সময় আমাদের যথার্থভাবে চলিত রীতির ভাষা ব্যবহার করাই সঙ্গত। যখন যে ভাষার প্রয়োজন তখন সে ভাষা ব্যবহার করব, একটার সঙ্গে আরেকটা মেশাব না।

বাংলা বানানের নিয়ম

উনিশ শতকের পূর্বে বাংলা বানানের কোনো নিয়ম ছিল না। উনিশ শতক থেকে বাংলা ভাষার বানান প্রমিত করার প্রয়াস দেখা যায়। তখন তৎসম শব্দের বানান নির্ধারণ করা হয় সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী। কিন্তু সম্ভব হয়নি অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দের বানানের নিয়ম নির্ধারণ করা। তৎসম, অতৎসম, প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ ইত্যাদি সহযোগে গঠিত মিশ্র শব্দের বানানে নানান বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়। বাংলা বানানের নিয়ম আবিষ্কার ও তা সূত্রবদ্ধ করার ব্যাপারে যিনি প্রথমে ভাবেন ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিশ্বভারতী বিশ শতকের বিশের দশকে চলিত ভাষার বানানরীতি নির্ধারণ করেন। প্রস্তাবনা-পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ রীতি তৈরি করেন। বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র রচনাবলী' এ বানানরীতি অনুসরণে মুদ্রিত হয়। ১৯৩৬ সাথে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানত অ–তৎসম শব্দের, কিছু ক্ষেত্রে তৎসম শব্দের বানানের নিয়ম নির্ধারণ করেন। এতে অনেক বিকল্প বানানের সুযোগ রাখা হয়। কিছু রক্ষণশীল পণ্ডিত বিরোধিতা করলেও রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রসহ অনেক পণ্ডিত ও লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানরীতিকে সমর্থন করেন। বাংলাদেশে ১৯৪৭ সালের পর তৎকালীন সরকার, কিছু প্রতিষ্ঠান ও কোনো কোনো ব্যক্তি বাংলা বানান ও লিপি সংস্কারের চেষ্টা করেন। এতে বাংলার মূল বৈশিষ্ট্য রক্ষা না করে ইসলামি শব্দ ও যুক্তিবিহীন বানানরীতি চালুর অপচেষ্টা চলে। এ প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ১৯৪৭ সালের বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে এবং ১৯৭৬ সালের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টে পাঠ্যপুস্তকের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বানানরীতি প্রণয়ন ও তা অনুসরণ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়। পাঠ্যপুস্তকে বানানের সমতা বিধানের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৮৪ সালে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। তারা অভিন্ন বানানের কিছু নিয়ম সুপারিশ করেন। বিভিন্ন কারণে তা বহুল প্রচারিত হয়নি। ১৯৮৮ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কুমিল্লায় একটি জাতীয় কর্মশিবিরের আয়োজন করেন। এই কর্ম কমিশন সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমিতে বাংলা বানানের সমতা বিধানের জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করেন। এ নীতিমালা অবলম্বনে একটি শব্দতালিকা প্রণয়ন করা হয়। ড. আনিসুজ্জামানের নেতৃত্ব একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে বাংলা বানানের নিয়ম ও শব্দ তালিকা চূড়ান্ত করা হয়, এবং ১৯৯২ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম

ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড তা 'পাঠ্য বইয়ের বানান' নামে একটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেন।

বাংলা একাডেমি বাংলা বানানের সমস্যা ও বিভ্রান্তি দূর করে বানানের নিয়মগুলো সূত্রবদ্ধ করার লক্ষ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। এ কমিটি বিশ্বভারতীর বানানরীতি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়ম এবং বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রবর্তিত পাঠ্য বইয়ের বানানরীতিকে সমন্বিত করে একটি অভিন্ন বানানের নিয়ম নির্ধারণ করেন। এটিই 'বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম।' ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে এটি পুস্তিকা আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। ২০০০ সালে এ নিয়মের কিছু সূত্র সংশোধিত হয় এবং তা 'বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান'-এর পরিমার্জিত সংস্করণের পরিশিষ্ট হিসেবে মুদ্রিত হয়। 'বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' অনুসরণে বিশেষজ্ঞ কমিটির অন্যতম সদস্য জামিল চৌধুরী 'বাংলা বানান–অভিধান' প্রণয়ন করেন। এ অভিধান ১৯৯৪ সালের জুনে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়।

বানান সংস্কারের কোনো প্রয়াস 'বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' নয়। ব্যাকরণগত বিধান রক্ষা করে বানানের নিয়মগুলো বেঁধে দেওয়া হয়েছে, এবং একই শব্দের বানানে একাধিক বিকল্প যথাসম্ভব বর্জন করে সমতা বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের 'পাঠ্য বইয়ের বানান' এবং বাংলা একাডেমি প্রণীত 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে'র মধ্যে অনেকাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও এদের মধ্যে দু-একটি ক্ষেত্রে কিছু গরমিল থেকে যায়। তাই একাডেমি প্রণীত 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে'র সঙ্গে সমতা বিধানের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০০৫ সালে আবার একটি 'বানানরীতি সমতা বিধান কমিটি' গঠন করে। এ কমিটির সুপারিশের আলোকে একটি সংশোধিত, সংযোজিত ও পরিমার্জিত বানানরীতি প্রণীত হয়। সকল পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের জন্য এ বানানরীতি অনুসরণ করা হবে বলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড একটি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে।

বাংলাদেশ সরকার অবশেষে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যপুস্তকে এবং সরকারি বিভিন্ন কাজে বাংলা একাডেমি প্রণীত বানানরীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিত 'বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকা ছাড়াও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত বাংলা বানানের নিয়ম বিস্তারিত আলোচনার পর বিশেষজ্ঞ কমিটি 'বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম'-এর পরিমার্জিত সংস্করণ চূড়ান্ত করা হয়। বাংলা একাডেমি পরিমার্জিত সংস্কারণ হিসেবে ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে 'বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' পুনর্মুদ্রণ করে। বাংলাদেশে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে এটিই হবে একমাত্র বানানরীতি।

বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম (পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১২)

১

তৎসম শব্দ

১.১ এই নিয়মে বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের নির্দিষ্ট বানান অপরিবর্তিত থাকবে।

১.২ যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে ই বা উ এবং কারচিহ্ন ি ু হবে।

যেমন:

কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, চুলি, তরণি, ধমনি, ধরণি, নাড়ি, পঞ্জি, পদবি, পলি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, যুবতি, রচনাবলি, লহরি, শ্রেণি, সরণি, সূচিপত্র;

১.৩ রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন :

অর্জ্জন, উদ্ধর্ব, কর্ম্ম, কার্ত্তিক, কার্য্য, বার্দ্ধক্য, মূর্চ্ছা, সূর্য্য ইত্যাদির পরিবর্তে অর্জন, ঊর্ধ্ব, কর্ম, কার্তিক, কার্য, বার্ধক্য, মূর্ছা, সূর্য ইত্যাদি হবে।

১.৪ সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) হবে। যেমন :

অহম্ + কার = অহংকার

এভাবে ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন।

সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে ং হবে না যেমন:

অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, বঙ্কিম, বঙ্গ, লঙ্ঘন, শঙ্কা, শৃঙ্খলা, সঙ্গে, সঙ্গী।

১.৫ সংস্কৃত ইন্-প্রত্যায়ন্ত শব্দের দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুযায়ী সেগুলোতে হ্রস্ব ই-কার হয়। যেমন:

গুণী→ গুণিজন, প্রাণী→ প্রাণিবিদ্যা, মন্ত্রী→ মন্ত্রিপরিষদ।

তবে এগুলোর সমাসবদ্ধ রূপে ঈ-কারের ব্যবহারও চলতে পারে। যেমন:

গুণী→ গুণীজন, প্রাণী→ প্রাণীবিদ্যা, মন্ত্রী→ মন্ত্রীপরিষদ।

ইন্-প্রত্যায়ন্ত শব্দের সঙ্গে -ত্ব ও - তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হবে। যেমন:

কৃতী→ কৃতিত্ব, দায়ী→ দায়িত্ব, প্রতিযোগী→ প্রতিযোগিতা, মন্ত্রী→ মন্ত্রিত্ব, সহযোগী→ সহযোগিতা।

১.৬ বিসর্গ (ঃ)

শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন:

ইতস্তত, কার্যত, ক্রমশ, পুনঃপুন, প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, মূলত।

এছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শব্দমধ্যস্থ বিসর্গ-বির্জত রূপ গৃহীত হবে । যেমন:

দুস্থ, নিস্তব্ধ, নিস্পৃহ, নিশ্বাস।

২

অতৎসম শব্দ

২.১ ই , ঈ, উ, ঊ

সকল অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র, শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কারচিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে । যেমন :

আরবি, আসামি, ইংরেজি, ইমান, ইরানি, উনিশ, ওকালতি, কাহিনি, কুমির,

কেরামতি, খুশি, খেয়ালি, গাড়ি, গোয়ালিনি, চাচি, জমিদারি, জাপানি, জার্মানি, টুপি, তরকারি, দাড়ি, দাদি, দাবি, দিঘি, দিদি, নানি, নিচু, পশমি, পাখি, পাগলামি, পাগলি, পিসি, ফরাসি, ফরিয়াদি, ফারসি, ফিরিঙ্গি, বর্ণালি, বাঁশি, বাঙালি, বাড়ি, বিবি, বুড়ি, বেআইনি, বেশি, বোমাবাজি, ভারি, (অত্যন্ত অর্থে), মামি, মালি, মাসি, মাস্টারি, রানি, রুপালি, রেশমি, শাড়ি, সরকারি, সিন্ধি, সোনালি, হাতি, হিজরি, হিন্দি, হেঁয়ালি।

চুন, পুজো, পুব, মুলা, মুলো।

পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন:

ছেলেটি, বইটি, লোকটি।

সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ, ও যোজন পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন:

এটা কী বই? কী আনন্দ! কী আর বলব? কী করছ? কী করে যাব? কী খেলে? কী জানি? কী 'দুরাশা! তোমার কী! কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে! কী পড়ো? কী যে করি! কী বাংলা কী ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী।

কীভাবে, কীকরম, কীরূপে প্রভৃতি শব্দেও ঈ-কার হবে।

যেসব প্রশ্নবাচক বাক্যের উত্তর হ্যাঁ বা না হবে, সেইসব বাক্যে ব্যবহৃত 'কি' হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লেখা হবে।

যেমন:

তুমি কি যাবে? সে কি এসেছিল?

২.২ এ, অ্যা

বাংলায় এ বর্ণ বা ে-কার দিয়ে এ এবং অ্যা এই উভয় ধ্বনি নির্দেশিত হয়। যেমন :

কেন, কেনো (ক্রয় করো): খেলা, খেলি; গেল, গেলে, গেছে; দেখা, দেখি; জেনো, যেন।

তবে কিছু তদ্ভব এবং বিশেষভাবে দেশি শব্দ রয়েছে যেগুলির ্যা-কার যুক্ত রূপ বহুল পরিচিত। যেমন :

ব্যাঙ, ল্যাঠা।

এসব শব্দে ্যা অপরিবর্তিত থাকবে।

বিদেশি শব্দে ক্ষেত্র-অনুযায়ী অ্যা বা ্যা-কার ব্যবহৃত হবে । যেমন:

অ্যাকাউন্ট, অ্যান্ড (and), অ্যাসিড, ক্যাসেট, ব্যাংক, ভ্যাট, ম্যানেজার, হ্যাট।

২.৩ ও

বাংলা অ-ধ্বনির উচ্চারণ বহু ক্ষেত্র ও-র মতো হয়। শব্দশেষের এসব এ ধ্বনি ও-কার দিয়ে লেখা যেতে পারে। যেমন :

কালো, খাটো, ছোটো, ভালো ;

এগারো, বারো, তেরো, পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো;

করানো, খাওয়ানো, চড়ানো, চরানো, চালানো, দেখানো, নামানো, পাঠানো,

বসানো, শেখানো, শোনানো, হাসানো;

কুড়ানো, নিকানো, বাঁকানো, বাঁধানো, ঘোরালো, জোরালো, ধারালো, প্যাঁচানো;

করো, চড়ো, জেনো, ধরো, পড়ো, বলো, বসো, শেখো, করাতো, কেনো, দেবো, হতো, হবো, হলো, কোনো, মতো।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় শব্দের আদিতেও ও-কার লেখা যেতে পারে। যেমন :

কোরো, বোলো, বোসো।

২.৪ ং, ঙ

শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন :

গাং, ঢং, পালং, রং, রাং, সং।

তবে অনুস্বারের সঙ্গে স্বর যুক্ত হলে ঙ হবে। যেমন :

বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের।

বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দে অনুস্বার থাকবে।

২.৫ ক্ষ, খ

অতৎসম শব্দ খিদে, খুদ, খুদে, খুর, (গবাদি পশুর পায়ের শেষ প্রান্ত), খেত, খ্যাপা ইত্যাদি লেখা হবে।

২.৬ জ, য

বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন :

কাগজ, জাদু, জাহাজ, জুলুম, জেব্রা, বাজার, হাজার।

ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি শব্দে বিকল্পে 'য' লেখা যেতে পারে। যেমন :

আযান, ওযু, কাযা, নামায, মুয়ায্যিন, যোহর, রমযান, হযরত।

২.৭ মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন

অতৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন :

অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গভর্নর, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, রানি, সোনা, হর্ন।

তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-য়ের পূর্বে যুক্ত নাসিক্যবর্ণ ণ হয় । যেমন :

কণ্টক, প্রচণ্ড, লুণ্ঠন।

কিন্তু অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ-য়ের আগে কেবল ন হবে । যেমন :

গুন্ডা, ঝান্ডা, ঠান্ডা, ডান্ডা, লন্ঠন।

২.৮ শ, ষ, স

বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যেমন :

কিশমিশ, নাশতা, পোশাক, বেহেশ্‌ত, শখ, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, শামিয়ানা, শার্ট, শৌখিন;

আপন, জিনিস, মসলা, সন, সাদা, সাল (বৎসর), স্মার্ট, হিসাব ;

স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্ট্রিট, স্টুডিয়ো, স্টেশন, স্টোর;

ইসলাম, তসলিম, মুসলমান, মুসলিম, সালাত, সালাম;

এশা, শাওয়াল (হিজরি মাস), শবান (হিজরি মাস)।

ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি s ধ্বনির জন্য স Ges -sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। যেমন:

পাসপোর্ট, বাস;

ক্যাশ;

টেলিভিশন;

মিশন, সেশন;

রেশন, স্টেশন।

সেখানে বাংলায় বিদেশি শব্দের বানান পরিবর্তিত হয়ে স ছ-এর রূপ লাভ করেছে সেখানে ছ-এর ব্যবহার থাকবে। যেমন :

তছনছ, পছন্দ, মিছরি, মিছিল।

২.৯ বিদেশি শব্দ ও যুক্তবর্ণ

বাংলায় বিদেশি শব্দের আদিতে বর্ণবিশেষ সম্ভব নয়। এগুলো যুক্তবর্ণ দিয়ে লিখতে হবে। যেমন :

স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং।

তবে অন্য ক্ষেত্রে বিশ্লেষ করা যায়। যেমন :

মার্কস, শেসসপিয়র, ইসরাফিল।

২.১০ হস-চিহ্ন

হস-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন :

কলকল, করলেন, কাত, চট, চক, জজ, ঝরঝর, টক, টন, টাক, ডিশ, তছনছ, ফটফট, বললেন, শখ, হুক।

তবে যদি অর্থবিভ্রান্তি বা ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হস-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন :

উহ্, বাহ্, যাহ্।

২.১১ উর্ধ্ব-কমা

উর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন :

বলে (বলিয়া), হয়ে, দুজন, চাল (চাউল), আল (আইল)।

৩

বিবিধ

৩.১ সমাসবদ্ধ শব্দগুলো যথাসম্ভব একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন :

অদৃষ্টপূর্ব, অনাস্বাদিতপূর্ব, নেশাগ্রস্ত, পিতাপুত্র, পূর্বপরিচিত, বিষাদমণ্ডিত, রবিবার, লক্ষ্যভ্রষ্ট, সংবাদপত্র, সংযতবাক, সমস্যাপূর্ণ, স্বভাবগতভাবে।

বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ শব্দটিকে এক বা একাধিক হাইফেন (–) দিয়ে যুক্ত করা যায়। যেমন :

কিছু–না–কিছু, জল–স্থল–আকাশ, বাপ–বেটা, বেটা-বেটি, মা–মেয়ে।

৩.২ বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন :

ভালো দিন, লাল গোলাপ, সগন্ধ ফুল, সুনীল আকাশ, সুন্দরী মেয়ে, স্তব্ধ, মধ্যাহ্ন।

৩.৩ না–বাচক না এবং নি–এর প্রথমটি (না) স্বতন্ত্র পদ হিসেবে এবং দ্বিতীয়টি (নি) সমাসবদ্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হবে । যেমন :

করি না, কিন্তু করিনি।

এছাড়া শব্দের পূর্বে না–বাচক উপসর্গ 'না' উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যেমন :

নাবালক, নারাজ, নাহক।

অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভূত হলে না–এর পর হাইফেন ব্যবহার করা যায়। যেমন :

না–গোনা পাখি, না–বলা বাণী, না–শোনা কথা।

৩.৪ অধিকন্তু অর্থে ব্যবহৃত 'ও' প্রত্যয় শব্দের কার–চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমন :

আজও, আমারও, কালও, তোমারও।

৩.৫ নিশ্চয়ার্থক 'ই' শব্দের সঙ্গে কার–চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমন :

আজই, এখনই।

৪

ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম এই নিয়মের আওতাভুক্ত নয়।

৫

ক্রিয়াপদের রূপ

৫.১ উঠ্ ধাতু

(আমি) উঠতাম, উঠেছিলাম, উঠছিলাম, উঠলাম, উঠেছি, উঠছি, উঠি, উঠব; ওঠাতাম, উঠিয়েছিলাম, ওঠাচ্ছিলাম, ওঠালাম, উঠিয়েছি, ওঠাচ্ছি, ওটাই, ওঠাব

(তুমি) উঠতে, উঠেছিলে, উঠছিলে, উঠলে, উঠেছ, উঠছ, ওঠো, উঠবে, উঠো; ওঠাতে, উঠিয়েছিলে, ওঠাচ্ছিলে, ওঠালে, উঠিয়েছ, ওঠাচ্ছে, ওঠাও, ওঠাবে, উঠিয়ো

(তুই) উঠতি(স), উঠেছিলি, উঠছিলি, উঠলি, উঠেছিস, উঠছিস, উঠিস, উঠবি, ওঠ; ওঠাতি, উঠিয়েছিলি, ওঠাচ্ছিলি, ওঠালি, উঠিয়েছিস, ওঠাচ্ছিস, ওঠাস, ওঠাবি, ওঠা (সে) উঠত, উঠেছিল, উঠছিল, উঠল, উঠেছে, উঠছে; ওঠে, উঠবে, উঠুক; ওঠাত, উঠিয়েছিল, ওঠাচ্ছিল, ওঠাল, উঠিয়েছে, ওঠাচ্ছে, ওঠায়, ওঠাবে, ওঠাক (আপনি/তিনি) উঠতেন, উঠেছিলেন, ওঠেন, উঠবেন, উঠুন ; ওঠাতেন, উঠিয়েছিলেন, ওঠাচ্ছিলেন, ওঠালেন, উঠিয়েছেন, ওঠাচ্ছেন, ওঠাবেন, ওঠান, উঠে, উঠিয়ে

৫.২ কর্ ধাতু

করতাম, করেছিলাম, করছিলাম, করলাম, করেছি, করছি, করি, করব; করাতাম, করিয়েছিলাম, করাচ্ছিলাম, করালাম, করিয়েছি, করাচ্ছি, করাই, করাব

করতে, করেছিলে, করছিলে, করলে, করেছ, করছ, করো, করবে, করা; করাতে, করিয়েছিলে, করাচ্ছিলে, করালে, করিয়েছ, করাচ্ছ, করাও, করাবে, কোরিয়ো

করতি(স), করেছিলি, করছিলি, করলি, করেছিস, করছিস, করিস, করবি, কর; করাতি, করিয়েছিলি, করাচ্ছিলি, করালি, করিয়েছিস, করাচ্ছিস, করাস, করাবি, করা করত, করেছিল, করছিল, করল, করেছে, করছে, করে, করবে, করুক; করাতো, করেছিল, করাচ্ছিল, করালো, করিয়েছে, করাচ্ছে, করায়, করাবে, করাক

করতেন, করেছিলেন, করছিলেন, করলেন, করেছেন, করছেন, করেন, করবেন, করুন;
করাতেন, করিতেছিলেন, করাচ্ছিলেন, করালেন, করিয়েছেন, করাচ্ছেন, করাবেন, করান, করে [ক'রে], করিয়ে

৫.৩ কাট্ ধাতু

কাটতাম, কেটেছিলাম, কাটছিলাম, কাটলাম, কেটেছি, কাটছি, কাটি, কাটব; কাটাতাম, কাটিয়েছিলাম, কাটাচ্ছিলাম, কাটালাম, কাটিয়েছি, কাটাচ্ছি, কাটাই, কাটাব কাটাতে, কেটেছিলে, কাটছিলে, কাটলে, কেটেছ, কাটছ, কাটো, কাটবে, কেটো; কাটাতে, কাটিয়েছিলে, কাটাচ্ছিলে, কাটালে, কাটিয়েছ, কাটাচ্ছ, কাটাও, কাটাবে, কাটিয়ো

কাটতি(স), কেটেছিলি, কাটছিলি, কাটলি, কেটেছিস, কাটছিস, কাটিস, কাট, কাটবি; কাটাতি, কাটিয়েছিলি, কাটাচ্ছিলি, কাটালি, কাটিয়েছিস, কাটাচ্ছিস, কাটাস, কাটা, কাটাবি

কাটত, কেটেছিল, কাটল, কেটেছে, কাটছে, কাটে, কাটুক, কাটবে; কাটাত, কাটিয়েছিল, কাটাচ্ছিল, কাটাল, কাটিয়েছে, কাটাচ্ছে, কাটায়, কাটাক, কাটাবে কাটতেন, কেটেছিলেন, কাটছিলেন, কাটলেন, কেটেছেন, কাটছেন, কাটেন, কাটুন, কাটাবেন; কাটাতেন, কাটিয়েছিলেন, কাটাচ্ছিলেন, কাটালেন, কাটিয়েছেন, কাটাচ্ছেন, কাটান, কাটাবেন, কেটে, কাটিয়ে

৫.৪ খা ধাতু

খেতাম, খেয়েছিলাম, খাচ্ছিলাম, খেলাম, খেয়েছি, খাচ্ছি, খাই, খাব; খাওয়াতাম, খাইয়েছিলাম, খাওয়াচ্ছিলাম, খাওয়ালাম, খাইয়েছি, খাওয়াচ্ছি, খাওয়াই, খাওয়াব

খেতে, খেঁয়েছিলে, খাচ্ছিলে, খেলে, খেয়েছ, খাচ্ছ, খাও, খেয়ো, খাবে; খাওয়াতে, খাইয়েছিলে, খাওয়াচ্ছিলে, খাওয়ালে, খাইয়েছ, খাওয়াচ্ছ, খাওয়াও, খাইয়ো, খাওয়াবে খেতি (স), খেয়েছিলি, খাচ্ছিলি, খেলি, খেয়েছিস, খাচ্ছিস, খাস, খাবি, খা; খাওয়াতি, খাইয়েছিলি, খাওয়াচ্ছিলি, খাওয়ালি, খাইয়েছিস, খাওয়াচ্ছিস, খাওয়াস, খাওয়াবি, খাওয়া

খেতো, খেয়েছিল, খাচ্ছিল, খেলো, খেয়েছে, খাচ্ছে, খায়, খাবে, খাক; খাওয়াত, খাইয়েছিল, খাওয়াচ্ছিল, খাওয়াল, খাইয়েছে, খাওয়াচ্ছে, খাওয়ায়, খাওয়াবে, খাওয়াক

খেতেন, খেয়েছিলেন, খাচ্ছিলেন, খেলেন, খেয়েছেন, খাচ্ছেন, খান, খাবেন; খাওয়াতেন, খাইয়েছিলেন, খাওয়াচ্ছিলেন, খাওয়ালেন, খাইয়েছেন, খাওয়াচ্ছেন, খাওয়ান, খাওয়াবেন

খেয়ে, খাইয়ে

৫.৫ দি ধাতু

দিতাম, দিয়েছিলাম, দিচ্ছিলাম, দিলাম, দিয়েছি, দিচ্ছি, দিই, দেবো; দেওয়াতাম, দিইয়েছিলাম, দেওয়ালাম, দিইয়েছি, দেওয়াচ্ছি, দেওয়াই, দেওয়াব

দিতে, দিয়েছিলে, দিচ্ছিলে, দিলে, দিয়েছ, দিচ্ছ, দাও, দিয়ো, দেবে; দেওয়াতে, দিইয়েছিলে, দেওয়াচ্ছিলে, দেওয়ালে, দিইয়েছ, দেওয়াচ্ছ, দেওয়াও, দিইয়ো, দেওয়াবে

দিতি(স), দিয়েছিলি, দিচ্ছিলি, দিলি, দিয়েছিস, দিচ্ছিস, দিস, দিবি, দে; দেওয়াতি, দিইয়েছিলি, দিওয়াচ্ছিলি, দেওয়ালি, দিইয়েছিস, দেওয়াচ্ছিস, দেওয়াস, দেওয়াবি, দেওয়া

দিত, দিয়েছিল, দিচ্ছিল, দিলো, দিয়েছে, দিচ্ছে, দেয়, দেবে, দিক; দেওয়াত, দিইয়েছিল, দেওয়াচ্ছিল, দেওয়ালো, দিইয়েছে, দেওয়াচ্ছে, দেওয়ায়, দেওয়াবে, দেওয়াক

দিতেন, দিয়েছিলেন, দিচ্ছিলেন, দিলেন, দিয়েছেন, দিচ্ছেন, দেন, দেবেন, দিন; দেওয়াতেন, দিইয়েছিলেন, দেওয়াচ্ছিলেন, দেওয়ালেন, দিইয়েছেন, দেওয়াচ্ছেন, দেওয়াবেন, দেওয়ান, দিয়ে

৫.৬ দৌড়া ধাতু

দৌড়াতাম, দৌড়েছিলাম, দৌড়াচ্ছিলাম, দৌড়ালাম, দৌড়েছি, দৌড়াচ্ছি, দৌড়াই, দৌড়াব

দৌড়াতে, দৌড়েছিলে, দৌড়াচ্ছিলে, দৌড়ালে, দৌড়েছ, দৌড়াচ্ছ, দৌড়াও, দৌড়াবে দৌড়াতি(স), দৌড়েছিলি, দৌড়াচ্ছিলি, দৌড়ালি, দৌড়েছিস,

দৌড়াচ্ছিস, দৌড়াস, দৌড়াবি

দৌড়াত, দৌড়েছিল, দৌড়াচ্ছিল, দৌড়াল, দৌড়েছে, দৌড়াচ্ছে, দৌড়ায়, দৌড়াবে, দৌড়াক

দৌড়াতেন, দৌড়েছিলেন, দৌড়াচ্ছিলেন, দৌড়ালেন, দৌড়েছেন, দৌড়াচ্ছেন, দৌড়ান, দৌড়াবেন, দৌড়ে

৫.৭ যা ধাতু

যেতাম, গিয়েছিলাম, যাচ্ছিলাম, গেলাম, গিয়েছি, যাচ্ছি, যাই, যাব; যাওয়াতাম, যাইয়েছিলাম, যাওয়াচ্ছিলাম, যাওয়ালাম, যাইয়েছি, যাওয়াচ্ছি, যাওয়াই, যাওয়াব

যেতে, গিয়েছিলে, যাচ্ছিলে, গেলে, গিয়েছ, যাচ্ছ, যাও, যেয়ো, যাবে; যাওয়াতে, যাওয়াচ্ছিলে, যাওয়ালে, যাওয়াচ্ছ, যাওয়াও, যাইয়ো, যাওয়াবে

যেতি (স), গিয়েছিলি, যাচ্ছিলি, গেলি, গিয়েছিস, যাচ্ছিস, যাস, যাবি, যা; যাওয়াতি, যাইয়েছিলি, যাওয়াচ্ছিলি, যাওয়ালি, যাইয়েছিস, যাওয়াচ্ছিস, যাওয়াস, যাওয়াবি, যাওয়া যেত, যাচ্ছিল, গেল, গিয়েছে, যাচ্ছে, যায়, যাবে, যাক; যাওয়াত, যাওয়াচ্ছিল, যাওয়াল, যাইয়েছে, যাওয়াচ্ছে, যাওয়ায়, যাওয়াবে, যাওয়াক

যেতেন, গিয়েছিলেন, যাচ্ছিলেন, গেলেন, গিয়েছেন, যাচ্ছেন, যান, যাবেন; যাওয়াতেন, যাইয়েছিলেন, যাওয়াচ্ছিলেন, যাওয়ালেন, যাইয়েছেন, যাওয়াচ্ছেন, যাওয়ান, যাওয়াবেন, গিয়ে

৫.৮ শিখ্ ধাতু

শিখতাম, শিখেছিলাম, শিখছিলাম, শিখলাম, শিখেছি, শিখছি, শিখি, শিখব; শেখাতাম, শিখিয়েছিলাম, শেখাচ্ছিলাম, শেখালাম, শিখিয়েছি, শেখাচ্ছি, শেখাই, শেখাব

শিখতে, শিখেছিলে, শিখছিলে, শিখলে, শিখেছ, শিখছ, শেখো, শিখো, শিখবে; শেখাতে, শিখিয়েছিলে, শেখাচ্ছিলে, শেখালে, শিখিয়েছ, শেখাচ্ছ, শেখাও, শিখিয়ো, শেখাবে

শিখতি(স), শিখেছিলি, শিখছিলি, শিখলি, শিখেছিস, শিখছিস, শিখিস, শিখবি, শেখ; শেখাতি, শিখিয়েছিলি, শেখাচ্ছিলি, শেখালি, শিখিয়েছিস, শেখাচ্ছিস, শেখাস, শেখাবি, শেখা

শিখত, শিখেছিল, শিখছিল, শিখল, শিখেছে, শিখছে, শেখে, শিখবে, শিখুক; শেখাত, শিখিয়েছিল, শেখাচ্ছিল, শেখাল, শিখিয়েছে, শেখাচ্ছে, শেখায়, শেখাবে, শেখাক শিখতেন, শিখেছিলেন, শিখছিলেন, শিখলেন, শিখেছেন, শিখছেন, শেখেন, শিখবেন; শেখাতেন, শিখিয়েছিলেন, শেখাচ্ছিলেন, শেখালেন, শিখিয়েছেন, শেখাচ্ছেন, শেখান, শেখাবেন

শিখে, শিখিয়ে

৫.৯ শু ধাতু

শুতাম, শুয়েছিলাম, শুচ্ছিলাম, শুলাম, শুয়েছি, শুচ্ছি, শুই, শোব; শোয়তাম, শুইয়েছিলাম, শোয়াচ্ছিলাম, শোয়ালাম, শুইয়েছি, শোয়াচ্ছি, শোয়াই, শোয়াব

শুতে, শুয়েছিলে, শুচ্ছিলে, শুলে, শুয়েছ, শুচ্ছ, শোও, শুয়ো, শোবে; শোয়াতে, শুইয়েছিলে, শোয়াচ্ছিলে, শোয়ালে, শুইয়েছ, শোয়াচ্ছ, শোয়াও, শুইয়ো, শোয়াবে

শুতি (স), শুয়েছিলি, শুচ্ছিলি, শুলি, শুয়েছিস, শুচ্ছিস, শুস, শুবি, শো; শোয়াতি, শুইয়েছিলি, শোয়াচ্ছিলি, শোয়ালি, শুইয়েছিস, শোয়াচ্ছিস, শোয়াস, শোয়াবি, শোয়া

শুতো, শুয়েছিস, শুচ্ছিল, শুলো, শুয়েছে, শুচ্ছে, শোয়া, শোবে, শুক; শোয়াত, শুইয়েছিল, শোয়াচ্ছিল, শোয়াল, শুইয়েছে, শোয়াচ্ছে, শোয়ায়, শোয়াবে, শোয়াক

শুতেন, শুয়েছিলেন, শুচ্ছিলেন, শুলেন, শুয়েছেন, শুচ্ছেন, শোন, শোবেন; শোয়াতেন, শুইয়েছিলেন, শোয়চ্ছিলেন, শোয়ালেন, শুইয়েছেন, শোয়াচ্ছেন, শোয়ান, শোয়াবেন

শুয়ে, শুইয়ে

৫.১০ হ ধাতু

হতাম, হয়েছিলাম, হচ্ছিলাম, হলাম, হয়েছি, হচ্ছি, হই, হব; হওয়াতাম, হইয়েছিলাম, হওয়াচ্ছিলাম, হওয়ালাম, হইয়েছি, হওয়াচ্ছি, হওয়াই, হওয়াব

হতে, হয়েছিল, হচ্ছিলে, হলে, হয়েছ, হচ্ছ, হও, হোয়ো, হবে;

হওয়াতে, হইয়েছিল, হওয়াচ্ছিলে, হওয়ালে, হইয়েছ, হওয়াচ্ছ, হওয়াও, হওয়ায়ো, হওয়াবে

হতি (স), হয়েছিলি, হচ্ছিলি, হলি, হয়েছিস, হচ্ছিস, হোস, হবি, হ; হওয়াতি, হইয়েছিলি, হওয়াচ্ছিলি, হওয়ালি, হইয়েছিস, হওয়াচ্ছিস, হওয়াস, হওয়াবি, হওয়া

হতো, হয়েছিল, হচ্ছিল, হলো, হয়েছে, হচ্ছে, হয়, হবে, হোক; হওয়াত, হইয়েছিল, হওয়াচ্ছিল, হওয়াল, হইয়েছে, হওয়াচ্ছে, হওয়ায়, হওয়াবে হওয়াক

হতেন, হয়েছিলেন, হচ্ছিলেন, হলেন, হয়েছেন, হচ্ছেন, হন, হোন, হবেন; হওয়াতেন, হইয়েছিলেন, হওয়াচ্ছিলেন, হওয়ালেন, হইয়েছেন, হওয়াচ্ছেন, হওয়ান, হওয়াবেন, হয়ে

যতিচিহ্ন

বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য বাক্যের মধ্যে বা বাক্যের শেষে কিংবা বাক্যের আবেগ (আনন্দ, বেদনা, দুঃখ), জিজ্ঞাসা ইত্যাদি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বাক্যগঠনে যেভাবে

বিরতি দিতে হয় এবং লেখার সময় বাক্যের মধ্যে তা দেখানোর জন্য যেসব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তা-ই **বিরামচিহ্ন** বা **যতিচিহ্ন** বা ছেদচিহ্ন।

নিচে বিভিন্ন প্রকার যদিচিহ্নের নাম, আকৃতি এবং তাদের বিরতি কালের পরিমাণ নির্দেশিত হলো :

যতি চিহ্নের নাম	আকৃতি	বিরতি-কাল-পরিমাপ
কমা	,	১ (এক) বলতে যে সময় প্রয়োজন
সেমিকোলন	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়
দাঁড়ি (পূর্ণচ্ছেদ)	।	এক সেকেন্ড
দুই দাঁড়ি	॥	এক সেকেন্ড বা একটু বেশি
জিজ্ঞাসা চিহ্ন	?	এক সেকেন্ড
বিস্ময় চিহ্ন	!	এক সেকেন্ড
কোলন	:	এক সেকেন্ড
কোলন ড্যাশ	:-	এক সেকেন্ড
ড্যাশ	–	এক সেকেন্ড
হাইফেন	-	থামার প্রয়োজন নেই
ইলেক বা লোপচিহ্ন বা উর্ধ্বকমা	'	থামার প্রয়োজন নেই
উদ্ধরণ চিহ্ন	‘’/ “”	‘এক’ উচ্চারণে যে সময় লাগে
ব্রাকেট (বন্ধনী-চিহ্ন)	()	থামার প্রয়োজন নেই
	{}	থামার প্রয়োজন নেই
	[]	থামার প্রয়োজন নেই
বিকল্পচিহ্ন	/	থামার প্রয়োজন নেই

কালের ব্যবধানে যতিচিহ্নের ধারণা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। অনেকে কথা বলেন ধীর গতিতে, অনেকে দ্রুত, কেউ বা মধ্য লয়ে। সে ক্ষেত্রে সময়ের হিসেবে বিরামচিহ্ন নির্ধারণ করাটা বেশ কষ্টসাধ্য।

যতিচিহ্নের ধারণা

কয়েকটি বিরামচিহ্ন বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয় এবং কিছু বিরামচিহ্ন বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। নিচে এগুলোর পরিচয় দেওয়া হলো।

কালের ব্যবধানে যতিচিহ্নের ধারণা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। অনেকে কথা বলেন ধীর গতিতে, অনেকে দ্রুত, কেউ বা মধ্য লয়ে। সে ক্ষেত্রে সময়ের হিসেবে বিরামচিহ্ন নির্ধারণ করাটা বেশ কষ্টসাধ্য।

যতিচিহ্নের ধারণা

কয়েকটি বিরামচিহ্ন বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয় এবং কিছু বিরামচিহ্ন বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। নিচে এগুলোর পরিচয় দেওয়া হলো।

ক. বাক্যের শেষে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন : বাক্যের শেষে নিচের চারটি বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হয়:

দাঁড়ি (।)

বাক্যের সমাপ্তি বা পূর্ণ–বিরতি বোঝাতে বাক্যের শেষে দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহৃত হয়। দণ্ডায়মান সকলরেখার মতো এর আকৃতি। অন্যান্য যতির তুলনায় দাঁড়ি চিহ্নের ব্যবহার বেশি। যেমন :

উঠানের শেষে তুলসী গাছটা আবার শুকিয়ে উঠেছে।
রেণু মাঝে মাঁঝে আমাদের জন্য ডালমুট ভেজে আনতো বাসা থেকে।

প্রশ্নচিহ্ন বা জিজ্ঞাসা চিহ্ন (?)

প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা বোঝাতে **প্রশ্নচিহ্ন বা জিজ্ঞাসা চিহ্ন** ব্যবহৃত হয়। যেমন :

নতুনদাকে বাঘে নিল না তো রে? তুই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাস?

বিস্ময় চিহ্ন (!)

হৃদয়াবেগ (ভয়, ঘৃণা, আনন্দ ও দুঃখ ইত্যাদি) প্রকাশ করতে এবং সম্বোধন পদের পরে বিস্ময় চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন :

আহা! কী চমৎকার দৃশ্য ! বাঃ! কী সুন্দর ফুল!

দুই দাঁড়ি (॥)

মধ্যযুগের কাব্যে পূর্ণ যতি বোঝাতে দুই দাঁড়ি ব্যবহৃত হতো। কবিতা বা গানের স্তবকের শেষেও দুই দাঁড়ির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন :

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান ॥

গানের উদাহরণ :

তোমার ময়ূরপঙ্খি বোঝাই করি নীল বাদাম উড়াইয়া।
ভাটিয়ালি গান গাইয়া, অচিন দেশের নাইয়া, কোন দেশে চলেছ বাইয়া ॥

খ. বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন : বাক্যের মধ্যে সাধারণ নিচের বিরামচিহ্নগুলো বসে:

কমা (,)

বাক্যের মধ্যে অল্প বিরতির জন্য কমা ব্যবহৃত হয়। বাক্যে অনেক ক্ষেত্রে কমা বসে :

ক. বাক্য পাঠকালে সুস্পষ্টতা বা অর্থ–বিভাগ দেখাবার জন্য সেখানে স্বল্প বিরতির প্রয়োজন, সেখানে কমা ব্যবহৃত হয়। যেমন :
রঙের খেলা খেলিতে খেলিতে তাহার উদয়, রং ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত।
বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে, আমাকে এক ভিতর পুরিলে?

খ. পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ এক সঙ্গে বসলে শেষ পদটি ছাড়া বাকি পদগুলোর পর কমা বসে। যেমন :
সুখ, দুঃখ, আশা, নৈরাশ্য একই মালিকার পুষ্প।

গ. সম্বোধন পদের পরে কমা বসে। যেমন :
বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে, আমাকে এর ভিতর পুরিলে?

ঘ. জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খণ্ডবাক্যের পরে কমা বসে। যেমন :
যদি তুমি আস, তাহলে আমি যাব।

ঙ. উদ্ধরণ চিহ্নের আগে (খণ্ডবাকের শেষে) কমা বসে । যেমন :
হৈম বলিল, "আমার বাবা তো কখনোই মিথ্যা বলেন না।"

চ. মাসের তারিখ লিখতে বার ও মাসের পর কমা বসে। যেমন :
১৬ পৌষ, বুধবার, ১৪২০ বঙ্গাব্দ। ৫ আগস্ট, সোমবার, ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ।

ছ. বাড়ি বা রাস্তার নম্বরের পরে কমা বসে। যেমন :
৯, ইকবাল রোড, ঢাকা ১২০৭।

জ. সমজাতীয় একাধিক পদ পরপর থাকলে কমা বসে। যেমন :
তিনি বাজারে গিয়ে আম, জাম, কাঁঠাল কিনলেন।

ঝ. এক ধরনের পদ জোড়ায় জোড়ায় থাকলে প্রতি জোড়াকে আলাদা করতে কমা বসে। যেমন:
মামা-মামি, চাচা-চাচি, ফুফা-ফুফি আমাদের সঙ্গে বনভোজনে গিয়েছিলেন।

ঞ. এক ধরনের একাধিক বাক্যাংককে আলাদা করতে কমা বসে। যেমন :
আমাদের কাছে শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বরীন্দ্র-জয়ন্তী, নজরুল-জয়ন্তী।

সেমিকোলন (;)

কমার চেয়ে বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে সেমিকোলন বসে। যেমন :
সৌদামিনীর স্বামী স্থির করলে, আর একটা বিয়েই যুক্তিযুক্ত; অন্তত চেষ্টা করে দেখা যাক।

কোলন (:)

একটি পূর্ণ বাক্যের পরে অন্য একটি বাক্যের অবতারণা করতে হলে কোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন :

সভায় সিদ্ধান্ত হল : এক মাস পরে নতুন সভাপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

কোলন ড্যাশ (:–)

উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করতে হলে কোলন ড্যাশ ব্যবহৃত হয়। যেমন :

উৎসের দিক থেকে পাঁচ প্রকার:–তৎসম শব্দ, অর্ধ–তৎসম শব্দ, তদ্ভব শব্দ, দেশি শব্দ ও বিদেশি শব্দ।

ড্যাশ (–)

যৌগিক ও মিশ্র বাক্যে পৃথক ভাবাপন্ন দুই বা ততোধিক বাক্যের সমন্বয় বা সংযোগ বোঝাতে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন :

তোমরা দরিদ্রের উপকার কর–এতে তোমাদের সম্মান যাবে না–বাড়বে।

হাইফেন (-)

সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখাবার জন্যে হাইফেন ব্যবহৃত হয়। যেমন:

এ আমাদের শ্রদ্ধা-অভিনন্দন, আমাদের প্রীতি-উপহার।

ইলেক বা লোপচিহ্ন বা উর্ধ্বকমা (')

উর্ধ্বকমার ইংরেজি প্রতিশব্দ অ্যাপস্ট্রফি। শব্দ বা পদের কোনো একটি বর্ণের লোপ পেলে সে জায়গায় উপরের দিকে উর্ধ্বকমা ব্যবহৃত হয়। যেমন ;

দুইটির > দু'টি নয়জন > ন'জন করিয়া > 'করে' ধরিয়া > 'ধরে' ইত্যাদি।

'বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে' বলা হয়েছে, উর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন :

বলে (বলিয়া), হয়ে, দুজন, চাল (চাউল), আল (আউল)।

উদ্ধরণ চিহ্ন ('' / "")

বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিকে উদ্ধরণ চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন :

শিক্ষক বললেন, "গতকাল জাপানে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছে।"

উদ্ধরণ চিহ্ন দুরকম :

একক উদ্ধরণ চিহ্ন ('') ও দ্বৈত উদ্ধরণ চিহ্ন ("")।

উপরের উদাহরণে একক উদ্ধরণ চিহ্নও ব্যবহার করা যায়। তবে প্রত্যক্ষ উক্তিতে সাধারণত দ্বৈত উদ্ধরণ চিহ্নই ব্যবহৃত হয়। আবার কোনো গল্প বা কবিতার নাম উল্লেখ করা হলে একক উদ্ধরণ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, এবং গল্প বা কবিতাটি কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, তার নামের ক্ষেত্রে দ্বৈত উদ্ধরণ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন :

ফররুখ আহমদের 'পাঞ্জেরি' কবিতাটি "সাত সাগরের মাঝি" কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

ব্রাকেট বা বন্ধনী-চিহ্ন () , {}, []

ব্রাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন গণিতশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে প্রথম বন্ধনীটি বিশেষ ব্যাখ্যামূলক অর্থে সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । যেমন :

ত্রিপুরায় (বর্তমানে কুমিল্লা) তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

বিন্দু চিহ্ন (./.../... ... ...)

শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিন্দু চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন :

তিনি পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেছেন। রাজু এবার এস.এস.সি. পাস করেছে।

তবে এখন ডিগ্রি লেখার ক্ষেত্রে বিন্দু চিহ্ন (.) ব্যবহৃত হয় না। যেমন:

এবার এইচএসসি পরীক্ষার ফল খুব ভালো।

উদ্ধৃতি দেওয়ার সময় বিন্দু চিহ্ন তিনবার ব্যবহৃত হয় একটি বাক্যের একটি বা একাধিক শব্দ বাদ দিলে। যেমন :

ফ্রেমের ভেতর থেকে আমার সন্তান
চেয়ে থাকে ...

ত্রিবিন্দু চিহ্ন তিনবার ব্যবহৃত হয় একটি অনুচ্ছেদ বা স্তবকের এক বা একাধিক লাইন বা চরণ উদ্ধৃতি দেওয়ার সময় বাদ দিলে। যেমন :

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই-ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
... ...
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী ॥

বিকল্পচিহ্ন (/)

উপরের দিকটি ডান দিকে হেলানো দাঁড়ির চেয়ে সামান্য বড় এক ধরনের সরলরেখাকে বিকল্পচিহ্ন বলে। একাধিক জায়গায় এ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

বাক্যের মধ্যে একটি পদের বিকল্পে অন্য পদকে বোঝাতে বিকল্পচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন :

আখ্যানপত্রে গ্রন্থের সংকলক এবং/অথবা সম্পাদকের নাম মুদ্রিত আছে।

কবিতার চরণ সাধারণ পর্বের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়। কবিতা উদ্ধৃত করার সময় কবিতার চরণগুলোকে গদ্যের আকারে সাজাতে বিকল্পচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন :

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি/ কেমন করে।/ আকাশ কাঁপে তারার আলোর/ গানির ঘোরে।/ তেমনি করে আপন হাতে/ ছুঁলে আমার বেদনাতে,/ নূতন সৃষ্টি জাগল বুঝি/ জীবন- 'পরে।

বিবৃতিমূলক [হাঁ-বোধক, না-বোধক], প্রশ্ন, বিস্ময় ও অনুজ্ঞা বাক্যে বিরামচিহ্ন

বিবৃতিমূলক বাক্য

হাঁ-বোধক বাধ্য : সমুদ্রে নানা রকম প্রাণী বাস করে।

না-বোধক বাক্য : আমি নিশ্চয়ই জানতাম-কোনোমতেই তাকে নিরস্ত্র করা যাবে না।

প্রশ্নবোধক বাক্য

বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে, আমাকে এর ভিতর পুরিলে?

বিস্ময়বোধক বাক্য

আবার শ্রী-কান্ত!

অনুজ্ঞাবোধক বাক্য

এখানে যেন আর কখনো তোমাকে না দেখি।

বঙ্গানুবাদ

এক ভাষায় রচিত কোনো বিষয় অন্য ভাষায় রূপান্তর করাকে অনুবাদ বলে। যেমন:

Honesty is the best policy.-সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে অনুবাদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। জ্ঞান অর্জনের জন্য মানুষকে বিভিন্ন ভাষায় রচিত বই পড়তে হয়। বর্তমানে পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারের বেশি ভাষা প্রচলিত আছে। কোনো মানুষের পক্ষেই এতগুলো ভাষা শেখা সম্ভব নয়। কিন্তু সমস্ত ভাষায় রচিত যে জ্ঞানভাণ্ডার, তার জ্ঞান আহরণ করার অধিকার প্রতিটি মানুষের রয়েছে। এজন্য অন্য ভাষার সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে মানুষকে অনুবাদের উপর নির্ভর করতে হয়। এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যেমন সারা বিশ্বের ভাষা থেকে অনুবাদ করা হচ্ছে, তেমনি মধ্যযুগেও ব্যাপকভাবে অনুবাদ হয়েছে। অনুবাদের প্রাথমিক দিকে মৌলিক অবদান লক্ষ করা যায় মধ্যযুগের সাহিত্যে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ইংরেজি ও হিন্দি সাহিত্য থেকে গ্রন্থ অনুবাদ করেন। মধ্যযুগের সাহিত্যেও মূলত অনুবাদ ছিল। এ সময় সংস্কৃত, ফারসি, হিন্দি ইত্যাদি ভাষা থেকে বাংলায় অজস্র অনুবাদ হয়েছে। মধ্যযুগের অনুবাদ ছিল অধিকাংশই কবিতাকারে লেখা। পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে অনূদিত হয় সারা বিশ্বের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য। ইংরেজি ছাড়া ল্যাটিন, জার্মান, ফরাসি, রুশ ভাষায় রচিত উল্লেখযোগ্য সাহিত্য এখন বাংলায় অনুবাদাকারে পাওয়া যায়। নোবেল পুরস্কার বা বুকার বা অন্যান্য পুরস্কার পাওয়া গ্রন্থও অনূদিত হচ্ছে এদেশে।

অনুবাদের শ্রেণিবিভাগ

অনুবাদ দু প্রকার । যেমন :

আক্ষরিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদ।

আক্ষরিক অনুবাদ (literal translation)

মূলের হুবহু অনুবাদকে আক্ষরিক অনুবাদ বলে। আক্ষরিক অনুবাদে মূল ভাষার বাক্যশৈলী, বাণী, ভঙ্গি, সুর ইত্যাদি অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াস থাকে। যেমন :

Many men many mind– অনেক মানুষ অনেক মন।

ভাবানুবাদ (faithful rendering/transcreation)

মূলের সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে মূল ভাবকে ঠিক রেখে স্বাধীনভাবে যে অনুবাদ হয় তাকে ভাবানুবাদ বলে।

Many men many mind–নানা মুনির নানা মত।

যে অনুবাদে যথার্থ্য ও পুনর্সৃষ্টি–এ দুয়ের সমন্বয় সাধিত হয়, তা–ই উৎকৃষ্ট অনুবাদ। মূলের যথার্থতা বিঘ্নিত না করে যথাসম্ভব সহজ ও সাবলীল ভাষায় নতুন সৃষ্টি করাই অনুবাদের লক্ষ্য। সার্থক অনুবাদ এক ধরনের মৌলিক সৃষ্টি।

প্রধানত ইংরেজির মাধ্যমেই আমাদের দেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান–বিজ্ঞান প্রসার লাভ করেছে। আজ অবশ্য সাধারণভাবে অনুবাদের কথা বলতেই আমরা ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ বুঝে থাকি।

প্রতিটি ভাষারই একটি গঠনকৌশল থাকে। বাক্য গঠনকৌশল ও পদস্থাপনের রীতিতে প্রতিটি ভাষাই স্বতন্ত্র। ইংরেজি ও বাংলার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। তাই অনুবাদের সময় উভয় ভাষার নিয়ম–শৃঙ্খলা ও প্রয়োগবিধি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

সৃজনশীল রচনার অনুবাদ

১৭৯০ সালে ইংল্যান্ডের লেখক আলেক্সান্ডার ফ্রেজার টাইটলার সৃজনশীল রচনার অনুবাদ প্রসঙ্গে কতকগুলো বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে লিখেছেন :

ক. মূল কাজের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র ধরবে অনুবাদকের চিন্তা ভাবনা, ধ্যান দর্শনকে খণ্ডিত না করে।

খ. মূল কাজের শৈলী যতদূর সম্ভব, বজায় রাখতে হবে অনুবাদে।

গ. অনুবাদকের দক্ষতা থাকতে হবে দুটি ভাষায়; মূল ভাষা ও অনুবাদকের নিজের ভাষায়।

ঘ. অনূদিত লেখকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনুবাদকের স্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে।

ঙ. অনুবাদের ভাষায় জটিলতা থাকা উচিত নয়। অনূদিত ভাষায় প্রচলিত ও সাধারণ্যে ব্যবহৃত শব্দাবলির সাহায্যেই অনুবাদ করা উচিত।

অনুবাদের নিয়ম ও সচেতনতা

অনুবাদের সময় নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে :

১. প্রথমে মূল অংশটি (text) ভালোভাবে পড়ে এর যাথাযথ অর্থ করা প্রয়োজন। একই অর্থ নানা অর্থ প্রকাশ করতে পারে। তাই কোন শব্দ কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা স্বচ্ছভাবে বুঝে নিতে হবে।

২. সংশ্লিষ্ট ভাষায় idiom ও phrase সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

৩. ইংরেজি নামগুলো ইংরেজি হিসেবেই অনুবাদ করতে হবে।

৪. হুবহু শাব্দিক বা আক্ষরিক অনুবাদ করতে গেলে যথার্থ হয় না। ভাষা শুদ্ধ ও সহজবোধ্য না হলেও অনুবাদ হবে না। মূল রচনার আলংকারিক গুণ অনুবাদে যেন বজায় থাকে, সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৫. মূল ভাষা ও অনূদিত ভাষার গঠনশৈলী, শব্দভাণ্ডার, প্রবাদ-প্রবচন অর্থাৎ ব্যাকরণের সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

৬. ক্রিয়ার কাল, বচন, পুরুষ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তির বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

৭. অনুবাদের শেষে বারবার পড়ে দেখা উচিত, যেন তা বাংলা মনে হয়।

ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদের নিয়ম

ইংরেজিতে একটি কথা প্রচলিত, অনুবাদ ও তর্জমা একই সঙ্গে বিশ্বস্ত ও সুন্দর হয় না। হয় তা বিশ্বস্ত অর্থাৎ মূলানুগ হয়, না–হয় সুন্দর । যিনি সাহিত্যের তর্জমা করেন, তাঁকে বিশ্বস্ততা ও সৌন্দর্য দু দিকেই নজর দিতে হয়। আবার, সংবাদপত্রের জন্য যিনি খবর কিংবা নিবন্ধাদি তর্জমা করছেন, তুলনায় তাঁকে বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে হয় মূলের প্রতি বিশ্বস্ততার ওপরেই। সেজন্য তিনি যে ভাষা বিষয়ে উদাসীন হবেন, তা সমীচীন নয়। তাঁর ভাষা পুষ্পিত হবে না, কিন্তু স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হবে। আমরা সাধারণত যে অনুবাদ করি, তা আক্ষরিক অনুবাদ। আক্ষরিক তর্জমার ইংরেজি বাগতঙ্গিমা ও প্রকাশরীতির বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না, শুধু ইংরেজি শব্দগুলো নিজ ভাষায় অনূদিত হয়।

ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে:

১. ইংরেজি ভাষার বিভিন্ন প্রকার বাক্যের গঠনশৈলী জানতে হবে।

২. ইংরেজি ভাষার শব্দভাণ্ডার সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে।

৩. আপাত দৃষ্টিতে সহজ ইংরেজি সরল বাক্যের অনুবাদ সব সময় সহজ নয়। সেদিকে দক্ষতা

অর্জন করতে হবে। যেমন :

I am well.-এর আক্ষরিক অনুবাদ 'আমি ভালো আছি'। কিন্তু I am going well.-এর আক্ষরিক অনুবাদ 'আমি ভালো আছি' বললে হবে না। হবে 'আমি (লেখাপড়া প্রভৃতি কাজ) ভালোই করছি' কিংবা 'আমার (লেখাপড়া প্রভৃতি কাজ) ভালোই চলছে' অথবা 'আমার সময় ভালোই কাটছে'।

৪. উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

৫. জটিল বাক্য ছোট ছোট সরল বাক্যে খণ্ডায়ন করলে অনুবাদ করতে সহজ হয়।

৬. ইংরেজি কোনো প্রবাদবাক্যের আক্ষরিক অর্থ না করে বাংলায় ওই অর্থ বা ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত কোনো প্রবাদবাক্য ব্যবহার করা উত্তম। যেমন :

Cut your coat according to your cloth.-এর আক্ষরিক অনুবাদ 'আয় বুঝে ব্যয় কর।'

৭. ইংরেজি ও বাংলা ভাষার গঠনশৈলী এক নয়। সাধারণ বর্তমান কালে ইংরেজি বাক্য গঠিত হয় কর্তা + ক্রিয়া + কর্ম-এ প্রক্রিয়ায়, কিন্তু বাংলা বাক্য গঠিত হয় কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া-এ প্রক্রিয়ায়। তাই ভাষার গঠনশৈলী সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে।

৮. বাংলায় হয়, হন, হই ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু ইংরেজি am, is, are ব্যবহৃত হয় যেমন :

He is my friend-এর আক্ষরিক অনুবাদ হওয়া উচিত 'সে হয় আমার বন্ধু'। কিন্তু বাংলায় এর অনুবাদ হয় 'সে আমার বন্ধু'।

৯. Introductory 'It' I 'There'-এর প্রতিশব্দ অনুবাদে সাধারণত বসে না। যেমন :

'There is a post office in our village'-এর অনুবাদ হবে 'আমাদের গ্রামে ডাকঘর আছে'।

১০. ইংরেজি বহুবচন বাংলায় বর্জন করা হয়। ইংরেজিতে বহুবচনবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়; ফলে বহুবচনের ব্যবহার হয় দু বার। কিন্তু বাংলায় বহুবচনের দ্বিত্ব ব্যবহার বর্জনীয়।

১১. Who-এর পর যদি singular verb থাকে, তাহলে who =কে, এবং তার পরে যদি plural verb তাকে তাহলে who ='কে কে' বা 'কারা'-ভাবে অনুবাদ করতে হয় । যেমন :

Who has come?-কে এসেছে?

Who have come?-কারা এসেছে? বা, কে কে এসেছ?

অবশ্য, নির্দিষ্ট অর্থে 'কে কে' ব্যবহৃত হলে, ইংরেজিতে whice boys/persons ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

১২. শর্তবাচক বাক্যকে বিভিন্নভাবে অনুবাদ করা যায়। ইংরেজি conditional sentence-এর if clause-এর অনুবাদে সরাসরি 'যদি' শব্দটি ব্যবহার করে 'যদি-তবে' রীতিটি অনুসরণ

করা যায়। কিন্তু বর্ণনার বৈচিত্র্য, বাক্যের সংক্ষেপণ কিংবা পারস্পরিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজন হলে 'যদি' ব্যবহার না করে অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার না করেও if clause-কে বাংলায় অনুবাদ করা যায়। যেমন :

If you want to go, go.-তুমি যদি যেতে চাও, তাহলে যাও। অথবা, তুমি যেতে চাইলে যাও।

১৩. যেখানে ইংরেজিতে perposition + verb (-ing) ব্যবহৃত হয়, বাংলায় সেখানে অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। যেমন:

On hearing this, she cried out loudly.-একথা শুনে সে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে উঠল।

১৪. ইংরেজিতে verb + ing (gerund) subject হিসেবে ব্যবহৃত হলে, বাংলা অনুবাদে 'ধাতু+আ' বা 'ধাতু+আ+নো' দ্বারা গঠিত অসমাপিকা ক্রিয়া কর্তা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন:

Swimming is a good exercise.-সাঁতারকাটা একটি ভালো ব্যায়াম।

১৫. ইংরেজিতে verb+ing যদি gerund হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে present participle (adjective) হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তা objcetive case-এর পরে বসে, তাহলে তার বাংলা অনুবাদ 'ধাতু+ তে'-এভাবে করা হয়। যেমন :

I saw him running-আমি তাকে দৌড়াতে দেখলাম।

১৬. verb+ing দ্বারা গঠিত adjcetive (persent participle) যদি noun -এর আগে attributive adjcetive হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে তার আগে বাংলা অনুবাদ 'ধাতু বা শব্দমূল+অন্ত/মান' এভাবে করা হয় যেমন :

Do not go on running bus.-চলন্ত (√চল্ +অন্ত) বাসে উঠো না।

১৭. ইংরেজি please শব্দটি বাংলায় 'দয়া করে, অনুগ্রহপূর্বক' ইত্যাদি দ্বারা 'অতি-আনুষ্ঠানিক' বা formal রীতিতে অনুবাদ করা যায়। কিন্তু কথ্যরীতিতে বা স্বাভাবিক লেখাতে এভাবে please শব্দটির অনুবাদ না করাই ভালো। কারণ, 'দয়া করে' ও 'অনুগ্রহ করে'-এগুলো বাংলা রীতির স্বভাববিরুদ্ধ। এ ক্ষেত্রে বিকল্প বর্ণনা বেছে নেওয়াই ভালো। যেমন:

Give me some fine rice, please.-এ বাক্যটির অনুবাদ 'আমাকে দয়া করে কিছু সরু চাল দিন' না লিখে লিখতে হবে 'আমাকে কিছু সরু চাল দিন'।

১৮. ইংরেজি বাক্যের subject কোনো impersonal pronoun হলে তা সাধারণভাবে

সবাইকে বোঝায়। এরূপ বাক্যকে বাংলায় অনুবাদ করতে হয় সচরাচর পরোক্ষভাবে কিংবা কর্মবিহীন কর্মবাচ্যে। যেমন:

One Should love one's parents.–এর বাংলায় অনুবাদ 'একজনের উচিত একজনের মা-বাবাকে ভালোবাসা' না হয়ে হবে 'মা-বাবাকে ভালোবাসা উচিত'।

১৯. ইংরেজি passive voice-এর অনুবাদ কখনো কখনো বাংলায় কর্তৃবাচ্য ভালো শোনায়। যেমন :

We are told.-এর অনুবাদ 'আমরা শুনেছি'।

২০. ইংরেজি proverb, phrase, idiom ইত্যাদির অনুবাদকালে বাংলায় প্রবাদ, প্রবচন, বাগ্‌ধারা ইত্যাদি থাকলে তা ব্যবহার করা যায়। যেমন:

Don't carry to new castle.-এর অনুবাদ 'তেলা মাথায় তেল দিও না'।

২১. সাধু ও চলিত উভয় রীতিতেই অনুবাদ করা যায়। তবে সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ ঘটানো যাবে না।

ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদের নমুনা

১. Liberty does not descent upon a people; a people must raise themselves to it. It is a fruit that must be earned before it can be enjoyed. That freedom means freedom only from foreign rule is an out worn idea. It is not merely government that should be free, but people themselves should be free. And no freedom has only real value for the common man or woman unless it also means freedom from want, disease and ignorance.

বঙ্গানুবাদ : স্বাধীনতা কোনো জাতির কাছে নেমে আসে না; বরং জাতিকে স্বয়ং এর কাছে উঠে আসতে হয়। এটি এমন একটি ফল যা ভোগ করতে চাইলে অবশ্যই আগে অর্জন করে নিতে হবে। বিদেশি শাসন থেকে মুক্তিলাভ মানেই স্বাধীনতা–এটি একটি পুরনো ধারণা। শুধু সরকার স্বাধীন হলেই চলে না, বরং জনগণকেও স্বাধীন হতে হয়। যে স্বাধীনতা অভাব, রোগ–ব্যাধি ও অজ্ঞতা থেকে মুক্তির প্রদান করে না, সাধারণ মানুষের কাছে সে স্বাধীনতার সত্যিকার কোনো মূল্য নেই।

২. A newpaper is the storehouse of knowledge. We can know the conditions, manner and customs of other countries of the world from a newpaper. It is in fact, the summary of all history. It supplies informations to all classes of people. The businessman can find the condition of the world market about his goods. The sporstman can see the results of important games in different parts of the world.

বঙ্গানুবাদ : সংবাদপত্র একটি জ্ঞানভাণ্ডার। সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অবস্থা, আচার-আচরণ ও রীতিনীতি সম্বন্ধে জানতে পারি। এটি বস্তুত সমকালীন ইতিহাসের সার-সংক্ষেপ। সংবাদপত্র সকল শ্রেণির লোকের জন্য

তথ্য সরবরাহ করে। ব্যবসায়ী তার পণ্য সম্পর্কে বিশ্ব-বাজারের অবস্থা জানতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ খেলার ফলাফল সম্পর্কে ক্রীড়াবিদরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে অবহিত হয়।

৩. A garden is not a source of beauty only. It is also a source of income to men. Men for their great love of flowers decorate the homes with them on occasions. Men love flowers, for they are the symbols of beauty and purity. A village home without any garden looks bare and poor.

বঙ্গানুবাদ : বাগান কেবল সৌন্দর্যের উৎসই নয়, এটি মানুষের আয়েরও উৎস। ফুলের প্রতি গভীর অনুরাগের কারণে লোকেরা মাঝে মাঝে ফুল দিয়ে ঘর সাজায়। মানুষ ফুল ভালোবাসে, কেননা ফুল সৌন্দর্য ও পবিত্রতার প্রতীক। বাগানহীন কোন গ্রামের বাড়ি নগ্ন ও নিষ্প্রাণ দেখায়।

৪. Honesty is the best policy. An honest man is respected by all. Everyone trusts him. No one can prosper in life if he is not honest. An honest shopkeeper is liked very much by his customers. All go to his shop and buy things from him. They begin to trust him. His credit grows and his business flourishes.

বঙ্গানুবাদ : সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। সৎ ব্যক্তিকে সকলেই সম্মান করে। সকলেই তাকে বিশ্বাস করে। সৎ না হলে কেউ জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে না। একজন সৎ দোকানদারকে তাঁর ক্রেতাগণ অত্যধিক পছন্দ করে। সবাই তার দোকানে যায় এবং তার কাছ থেকে জিনিসপত্র ক্রয় করে। তারা তাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। তার আয় বৃদ্ধি পায় এবং তার ব্যবসার উন্নতি সাধন হয়।

৫. There is a proverb– "Cut your coat according to your cloth." We should be satisfied with what we earn in an honest way. In a developing country like ours luxuries of all kinds should be avoided. The rich should not forget the pitiable condition of the common people. Some people earn money in the most unfair way.

বঙ্গানুবাদ : প্রবাদ আছে– "আয় বুঝে ব্যয় কর।" আমরা সৎভাবে যা উপার্জন করি তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে সব ধরনের বিলাসিতা পরিত্যাজ্য। সাধারণ মানুষের শোচনীয় অবস্থার কথা ধনীদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কিছু কিছু লোক সম্পূর্ণ অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করে থাকে।

৬. Dhaka is a famous old city. It is now the capital of Bangladesh. Islam Khan, a Mughal provincial governor, made it the capital of Bangladesh. Jahangir was then the emperor of Delhi. After the name of jahangir, Dhaka was called jahangir Nagar. Dhaka stands on the Buriganga.

বঙ্গানুবাদ : ঢাকা একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর। এটি বর্তমানে বাংলাদেশের রাজধানী। মুঘল সুবাদার ইসলাম খান একে বাংলাদেশের রাজধানী করেন। তখন জাহাঙ্গীর

ছিলেন দিল্লির সম্রাট। জাহাঙ্গীরের নামানুসারে ঢাকাকে জাহাঙ্গীর নগর বলা হতো। ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত।

৭. Honesty is a noble virtue. It is secret of success in every sphere of life. The valuė of honesty is very great. It wins love, respect and fearlessness. An honest man passes his days in respect and happiness. Honesty is the bet policy.

বঙ্গানুবাদ : সততা একটি মহৎ গুণ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এটিই সাফল্যের চাবিকাঠি। সততার মূল্য অত্যধিক। এ সততা ভালোবাসা, সম্মান ও নির্ভীকতা অর্জন করে। একজন সৎ ব্যক্তি সম্মানিত ও সুখী জীবন যাপন করে। সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

৮. Books are men's beat compainons in life. You must have very good friends but you cannot get them when you need. They may not speak gently to you. One or two may prove false and do much harm. But books are always ready to be by your side. Some books may make you laugh. Some other may give much pleasure. Others again may give your knowledge and new ideas.

বঙ্গানুবাদ : বই মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গী। তোমার নিশ্চয়ই খুব ভালো বন্ধু আছে কিন্তু প্রয়োজনের সময় তুমি তাদের পাও না। তারা তোমার সঙ্গে ভালো করে কথা নাও বলতে পারে। দু একজন মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত হতে পারে এবং ক্ষতিও করতে পারে। কিন্তু বই সব সময় তোমার পাশে থাকতে প্রস্তুত রয়েছে। কোনো কোনো বই তোমাকে হাসাতে পারে, কোনো কোনো বই তোমাকে খুব আনন্দ দিতে পারে। আবার কোনো কোনো বই তোমাকে জ্ঞান এবং নতুন ধারণা প্রদান করতে পারে।

৯. It is impossible to describe the beauty of the Taj in words. It has been called 'a dream in marble' and 'a tear drop on the cheeks of time'; but the fairest phrase fail to do justice to the surpassing creation of art. The Taj is best by moonlight when the dazzling white of the marble is mellowed into a dreamy softness. The most charming view, perhaps, is obtained from the palace on the opposite bank of the river when the plinth is not visible and the building looks a fairy costly in the air, hung among the cloud.

বঙ্গানুবাদ : তাজমহলের সৌন্দর্য অনির্বচনীয়। কেউ কেউ তাকে 'মর্মরে রচিত স্বপ্ন' এবং কেউ বা তাকে 'কালের কপোলতলে একবিন্দু অশ্রু' বলে আখ্যাত করেছেন। কিন্তু মানবের সুন্দরতম ভাষাবিন্যাসেও এই অতুলনীয় শিল্পসৃষ্টির প্রতি সুবিচার করা হয় না। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে পাষাণপুঞ্জের অত্যুজ্জ্বল শুভ্র বর্ণ যখন একটি স্বপ্নালু কোমলতার রূপ পরিগ্রহ করে তখনই তাজমহলকে দেখতে হবে। নদীর অপর তীরবর্তী প্রাসাদ থেকে সম্ভবত তাদের সর্বাপেক্ষা নয়নমুগ্ধকর দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। সেই স্থান থেকে তাজমহলের ভিত্তিমূল দেখা যায় না বলে এই মর্মরপ্রাসাদটিকে মেঘলোকবিলম্বিত নভোশায়ী একটি পরীর দুর্গের মতই দেখায়।

১০. Socrates never believed that all men are equal. If all were treated as

equal there would be one flock and no shepherd. This opinion of Socrates gave offence to many people. Socrates was regular in prayer and had a firm belief in God. He hald that only God knows what is good for us. So our prayer should simply be, "Give me what is good"

বঙ্গানুবাদ : সক্রেটিস কখনও বিশ্বাস করতেন না যে, সব মানুষ সমান। যদি সবাই সমান হত, তাহলে শুধু মেষপালই থাকত, মেষপালক থাকত না। সক্রেটিসের এ মতবাদ অনেককে আহত করল। তিনি নিয়মিত প্রার্থনা করতেন; তাঁর ছিল স্রষ্টার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি মনে করতেন যে, একমাত্র স্রষ্টাই জানেন আমাদের জন্য কোনটা মঙ্গলজনক। তাই আমাদের শুধু প্রার্থনা হবে, "আমাদের জন্য যা মঙ্গলজনক তাই আমাদের দাও।"

ভাবানুবাদের দৃষ্টান্ত পেতে আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হতে পারি। তিনি একাধিক ইংরেজি গ্রন্থ থেকে আখ্যান গ্রহণ করে তা বাংলা ভাষায় রূপান্তর করেছেন। যেমন, উইলিয়াম শেক্সপিয়রের 'The Comedy Of Errors' নামটি তিনি 'ভুলের কমেডি' বা 'ভুলের হাসির নাটক' অনুবাদ না করে করেছেন 'ভ্রান্তিবিলাস' বলে। এটিই ভাবানুবাদ। বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে বোঝার জন্য এই গ্রন্থ থেকে সামান্য পাঠ উল্লেখ করা হলো।

শেক্সপিয়র লিখেছেন :

'To admit no traffic to our adverse towns:
Nay, more,
If any born at Ephesus be seen
At any Syracusan marts and fairs,–
Again, if any syracusan born
Come to the bay of Ephesus, he dies,
His goods confiseate to the duke's didpose;
Unless at thousand marks be levied,
To quit the penalty and to ransom him,–
Thy substance, valued at the highest him.–
Thy substance, Valued at the highest rate,
Cannot amount unto a hundred marks:
Therefore, by law thou art condemn'd to die.'

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চরিত্র-নাম পাল্টে দিয়ে এর বঙ্গানুবাদ করেছেন এভাবে :

'জয়স্থলে অধিরাজ বিজয়বল্লভ স্বয়ং রাজকার্যের পর্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি সবিশেষ অবগত হইয়া সোমদত্তের দিকে দৃষ্টি সঞ্চারণপূর্বক বলিলেন, অহে, হেমকূটবাসী বণিক! তুমি প্রতিষ্ঠিত বিধির লঙ্ঘনপূর্বক জয়স্থলের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছ, এই অপরাধে আমি তোমার পাঁচ সহস্র মুদ্রা দণ্ড করিলাম; যদি অবিলম্বে এই দণ্ড দিতে না পার, সায়ংকালে তোমার প্রাণদণ্ড হইবেক।'

–ভাবানুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদক এরূপ স্বাধীনতা নিতে পারেন।

নির্মিতি

দিনলিপি বা ডায়রি

দিনলিপি হলো দিনের লিপি অর্থাৎ প্রতিদিনের রচনা। মানুষের জীবনে প্রতিদিনের ঘটে যাওয়া ঘটনা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, পর্যবেক্ষণ, জীবনবোধ ইত্যাদির লিপিবদ্ধ রূপকে দিনলিপি (diary) বলে। এতে মূলত ব্যক্তিগত জীবনের ক্রিয়াকলাপ, অনুভূতি, প্রতিক্রিয়া, ভাবাবেগ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। ধারাবাহিক কোনো ঘটনা, বিশেষ ভাবনা, ধারণা, স্বপ্ন, আশা-নিরাশা, আনন্দ-হতাশা, পরিকল্পনা–এসব বিষয়েও দিনলিপিতে স্থানলাভ করে। মনে রাখা প্রয়োজন, দিনলিপি লেখক শুধু নিজের জন্যই রচনা করেন; এর পাঠক তিনি নিজেই। তাই এখানে কোনো কল্পিত, মিথ্যে, মনোরঞ্জনের কিছু থাকে না। অবশ্য কেউ বিখ্যাত হয়ে গেলে তাঁর দিনলিপি আর 'ব্যক্তিগত' থাকে না। সেটা হয়ে যায় তাঁর সমাজ বা রাষ্ট্রের সম্পদ। তাই সে ধরনের দিনলিপি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত পাঠযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

দিনলিপি লেখন একটি ভালো অভ্যাস। দিনলিপির মাধ্যমে সহজ-সরল ভাষায় স্পষ্ট ও সরাসরি নিজেকে প্রকাশ করা যায়। একজন মানুষ যদি দিনলিপি লেখে, প্রতিদিনের মধ্যদিয়ে সে এক সময় অনেকটা দিন অতিক্রম করার পর নিজের জীবনের পরিবর্তন উপলব্ধি করতে পারবে। এভাবে মাস, বছর, যুগ পেরিয়ে আমাদের জীবনধারার বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়। নিজের অতীতের কথা স্পষ্টভাবে স্মরণ করা সম্ভব দিনলিপির মধ্যদিয়ে। আমি কী ছিলাম, কেমন ছিলাম, কী করেছি– কীভাবে করেছি, এক সময় এসব প্রশ্নের উত্তর আমরা জানতে পারি দিনলিপির মাধ্যমে। এবং দিনলিপি পাঠ করে আমরা বিস্মিত হতে পারি, আনন্দিত হতে পারি, দুঃখ পেতে পারি। প্রতিটি মানুষেরই দিনিলিপি লেখা প্রয়োজন। যারা দিনলিপি লেখেন, এক সময় তাদের সেরা সঙ্গী হয়ে ওঠে দিনলিপি। কেউ যদি ভুল পথে চলে, দিনলিপি পাঠ করে তার মধ্যে সেই বোধের জন্ম নিলে সে নিজেই নিজেকে সংশোধন করতে পারে। নিজের জীবনকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার জন্যও তাই দিনলিপি লেখা উচিত।

মানুষ সাধারণত সারা দিনের ঘটনা, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, পর্যবেক্ষণ, পরিকল্পনা ইত্যাদি দিনশেষে রাতে দিনলিপিতে লিখে রাখে। তবে যে প্রতিদিন রাতেই দিনলিপি লিখতে হবে এমন কোনো কথা নেই। যে কোনো সময়, যে কোনো স্থানে দিনলিপি লেখা যায়। এজন্য কেনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। কদিন বা অনেক দিন দিনলিপি লেখা না হলেও কিছু যায় আসে না; আবার লেখা শুরু করলেই হয়। অতীতের ঘটনা স্মৃতিচারণ করলে তেমন কোনো অসুবিধা হয় না। তবে কিছু বিষয় স্মৃতি থেকে বিস্তারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দিনলিপি

সাধারণত স্বহস্তে লিখিত হয়। অবশ্য বর্তমানে অনেকেই কম্পিউটার বা অনলাইনেও দিনলিপি লেখেন।

যারা নিয়মিত দিনলিপি লেখেন, প্রতিবেদন রচনায় তারা পারদর্শী হতে পারেন এবং সাংবাদিকতায় তাদের সাফল্য লাভের সম্ভাবনা থাকে। বিশ্বের অনেক খ্যাতনামা লেখক বা দিনলিপিকার উত্তরাধিকারের হাতে তুলে দিয়েছেন অনবদ্য দিনলিপি। এসব দিনলিপি আমাদের বারবার তাদের পানে টেনে নিয়ে যায়, তাঁদের অন্তর্জগৎ সম্পর্কে জানার আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দেয়।

দিনলিপির নিয়ম-কানুন

১. দিনলিপির প্রথম পৃষ্ঠার শুরুতেই বাম পাশে তারিখ ও দিনের নাম লিখতে হয়। কোন তারিখে কী ঘটেছে তা এই তারিখ ও দিন লেখার মধ্যদিয়ে স্পষ্ট হয়।

২. দিনলিপির ভাষা হবে সহজ, স্পষ্ট ও সাবলীল। এতে ঘটনা, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি পর্যবেক্ষণ, পরিকল্পনা ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয়।

৩. কোনো ঘটনা বর্ণনার সময় স্থানের নাম, সময়, পরিবেশ লিখতে হয়। এতে বাস্তবতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৪. দিনলিপি লেখার পূর্ব মুহূর্তে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা গুছিয়ে নিতে হয়, যেন বর্ণনাকালে সময় ও ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। দিনলিপির বিবরণ অবশ্যই গোছালো ও পরিচ্ছন্ন হতে হবে।

৫. ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশই দিনলিপি, তাই নিজস্ব অভিমত, দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি উন্মুক্তভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়।

৬. লেখার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রবহমাণতা ও সাবলীলতা প্রত্যাশিত। এমনভাবে দিনলিপি লেখা উচিত যাতে পাঠকের পড়ার আগ্রহের জন্ম নেয় এবং পড়তে ভালো লাগে।

৭. দিনলিপিতে অসত্য ভাষণ দেওয়া যাবে না। প্রকৃত ও সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে হবে। মিথ্যাভাষ একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। তাই শিক্ষার্থীদের এমনভাবে দিনলিপি লেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে যা থেকে মনে হবে নিখুঁত বাস্তবতারই প্রতিফলন।

৮. দিনলিপি আকারে ছোটও হতে পারে, তবে কেউ বিস্তারে সব কিছু লিখতে চাইলে অথবা তা সাহিত্যিক দিনলিপি হলে তার আয়তন স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পাবে।

দিনলিপির নমুনা

একাত্তরের দিনগুলি
জাহানারা ইমাম

১৩ই এপ্রিল : মঙ্গলবার ১৯৭১

চারদিন ধরে বৃষ্টি। শনিবার রাতে কি মুষলধারেই যে হলো, রোববার তো সারা দিনভর একটানা। গতকাল সকালের পর বৃষ্টি থামলেও সারা দিন আকাশ মেঘলা ছিল। মাঝে মাঝে এক পশলা বৃষ্টি। জামী ছড়া কাটছিল, 'রোদ হয় বৃষ্টি হয়, খ্যাঁক-শিয়ালের বিয়ে হয়।' কিন্তু আমার মনে পাষাণভার। এখন সন্ধার পর বৃষ্টি নেই, ঘনঘন মেঘ ডাকছে আর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বসার ঘরে বসে জনালা দিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম, আমার জীবনেও এতদিনে সত্যি সত্যি দুর্যোগের মেঘ ঘন হয়ে আসছে। এই রকম সময়ে করিম এসে ঢুকল ঘরে, সমানে সোফায় বসে বলল, 'ফুফুজান এ পাড়ার অনেকেই চলে যাচ্ছে বাড়ি ছেড়ে। আপনারা কোথাও যাবেন না?'

'কোথায় যাব? অন্ধ, বড়ো শ্বশুরকে নিয়ে কেমন করে যাব ? কিন্তু এ পাড়া ছেড়ে লোকে যাচ্ছে কেন? এখানে তো কোনো ভয় নেই!'

'নেই, মানে ? পেছনে এত কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো–,

'হল তো সব খালি, বিরান, যা হবার তাতো প্রথম দুদিনেই হয়ে গেছে। জানো বাবুদের বাড়িতে তার মামার বাড়ির সবাই এসে উঠেছে শান্তিনগর থেকে?'

'তাই নাকি? আমরা তো ভাবছিলাম শান্তিনগরে আমার দুলাভাইয়ের বাসায় যাব।'

'তাহলে দেখ–ভয়টা আসলে মনে। শান্তিনগরের মানুষ এলিফ্যান্ট রোডে আসছে মিলিটারির হাত থেকে পালাতে, আবার তুমি এলিফ্যান্ট রোড থেকে শান্তিনগরেই যেতে চাচ্ছ নিরাপত্তার কারণে।'

যুক্তিটা বুঝে করিম মাথা নাড়ল, খুব দামি কথা বলছেন ফুফুজান। আসলে যা কপালে আছে তা হবেই। নইলে দ্যাখেন না, ঢাকার মানুষ খামোকা জিঞ্জিরায় গেল গুলি খেয়ে মরতে। আরো একটা কথা শুনেছেন ফুফুজান? নদীতে নাকি প্রচুর লাশ ভেসে যাচ্ছে। পেছনে হাত বাঁধা, গুলিতে মরা লাশ।'

শিউরে উঠে বললাম, 'রোজই শুনছি করিম। যেখানেই যাই এ ছাড়া আর কথা নেই। কয়েকদিন আগে শুনলাম ট্রাকভর্তি করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে হাত আর চোখ বেঁধে, কতো লোকে দেখেছে। এখন শুনছি সদরঘাট, সোয়ারীঘাটে নাকি দাঁড়ানো যায় না পচা লাশের দুর্গন্ধে। মাছ খাওয়াই বাদ দিয়েছি এজন্য।'

১০ই মে : সোমবার ১৯৭১

বেশ কিছু দিন বাগানের দিকে নজর দেওয়া হয়নি। আজ সকালে নাশতা খাবার পর তাই বাগানে গেলাম। বাগানে বেশ কটা হাই-ব্রিড টি-রোজের গাছ আছে। এই ধরনের গোলাপ গাছের খুব বেশি যত্ন করতে হয়–যা গত দুমাসে হয়নি।

খুরপি হাতে কাজে লাগার আগে গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। মাখনের মতো রঙের 'পিস' অর্থাৎ 'শান্তি'। কালচে-মেরুন 'বনি প্রিন্স' আর 'এনা হার্কনেস'। ফিকে ও গাঢ় বেগুনি রঙের 'সিমোন' আর 'ল্যাভেন্ডার'। হলুদ 'বুকানিয়ার', সাদা 'পাসকালি'।

বনি প্রিন্স-এর আধফোটা কলিটি এখনো আমার বেড-সাইড টেবিলে কালিদানিতে রয়েছে। কলি অবশ্য নেই, ফুটে গেছে এবং প্রায় ঝরে পড়ার অবস্থা। 'পিস'-এর গাছটায় একটা কলি কেবল এসেছে–যদিও সারাদেশ থেকে 'পিস' উধাও।

বাগান করা একটা নেশা। এ নেশায় দুঃখ-কষ্ট খানিকক্ষণ ভুলে থাকা যায়। গত কয়েক মাস ধরে নেশাটার কথা ভাববারই অবকাশ পাই নি। এখন ভয়ানক বিক্ষিপ্ত মনকে ব্যস্ত রাখার গরজেই বোধ করি নেশাটার কথা আমার মনে পড়েছে।

১২ই মে : বুধবার ১৯৭১

জামীর স্কুল খুলছে দিন দুই হলো। সরকার এখন স্কুল-কলেজ জোর করে খোলার ব্যবস্থা করছে। এক তারিখে প্রাইমারি স্কুল খোলার হুকুম হয়েছে, নয় তারিখে মাধ্যমিক স্কুল।

জামী স্কুলে যাচ্ছে না। যাবে না। শরীফ, আমি, রুমী, জামী–চারজনে বসে আলাপ-আলোচনা করে আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম স্কুল খুললেও স্কুলে যাওয়া হবে না। দেশে কিছুই স্বাভাবিকভাবে চলছে না, দেশে এখন যুদ্ধাবস্থা। দেশবাসীর ওপর হানাদার পাকিস্তানি জানোয়ারদের চলছে নির্মম নিষ্পেষণের স্টিমরোলার। এই অবস্থায় কোনো ছাত্রের উচিত নয় বই-খাতা বগলে স্কুলে যাওয়া।

জামী অবশ্য বাড়িতে পড়াশোনা করছে। এবার ও দশম শ্রেণির ছাত্র। রুমী যতদিন আছে, ওকে সাহায্য করবে। তারপর শরীফ আর আমি–যে যতটা পারি।

জামী তার দু-তিনজন বন্ধুর সাথে ঠিক করেছে–ওরা একসঙ্গে বসে আলোচনা করে পড়াশোনা করবে। এটা বেশ ভালো ব্যবস্থা, পড়াও হবে, সময়টাও ভালো কাটবে। অবরুদ্ধ নিষ্ক্রিয়তায় ওরা হাঁফিয়ে উঠবে না।

১৭ই মে : সোমবার ১৯৭১

রেডিও-টিভিতে বিখ্যাত ও পদস্থ ব্যক্তিদের ধরে নিয়ে প্রোগ্রাম করিয়েও 'কর্তাদের' তেমন সুবিধা হচ্ছে না বোধ হয়। তাই এখন বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের ধরে ধরে তাদের দিয়ে খবরে কাগজে বিবৃতি দেওয়ানোর কূটকৌশল শুরু হয়েছে। আজকের কাগজে ৫৫ জন বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীর নাম দিয়ে এক বিবৃতি বেরিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো টিচার, রেডিও-টিভির কোনো কর্মকর্তা ও শিল্পীর নাম বাদ গেছে বলে মনে হচ্ছে না। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সানন্দে এবং সাগ্রহে সই দিলেও বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী যে বেয়নেটের মুখে সই দিতে বাধ্য হয়েছেন, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আর যে বিবৃতি তাদের নামে বেরিয়েছে, সেটা যে তাঁরা অনেকে না দেখেই সই করতে বাধ্য হয়েছে, তাতেও আমার সন্দেহ নেই। আজ সকালের কাগজে বিবৃতিটি প্রথমবারের মতো পড়ে তাঁরা নিশ্চয় স্তম্ভিত হয়ে বসে রইবেন

খানিকক্ষণ। এবং বলবেন, ধরণী দ্বিধা হও! এরকম নির্লজ্জ মিথ্যাভাষণে ভরা বিবৃতি স্বয়ং গোয়েবলসও লিখতে পারতেন কিনা সন্দেহ। এই পূর্ব বাংলার কোন প্রতিভাধর বিবৃতিটি তৈরি করেছেন, জানতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।

২৫শে মে : মঙ্গলবার ১৯৭১

আজ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জয়ন্তী। বেশ শান-শওকতের সঙ্গে পালিত হচ্ছে ঢাকায়। এমনকি ইসলামিক ফাউন্ডেশন পর্যন্ত একটা অনুষ্ঠান করছে।

সন্ধার পর টিভির সামনে বসেছিলাম, জামী সিঁড়ির মাথা থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাকল, 'মা শিগগির এস। নতুন প্রোগ্রাম।' দৌড়ে ওপরে গেলাম, স্বাধীন বাংলা বেতারে বাংলা সংবাদ পাঠ করছে নতুন এক কণ্ঠস্বর। খানিক শোনার পর চেনা চেনা ঠেকল কিন্তু ঠিক চিনে উঠতে পারলাম না। সালেহ আহমদ নামটা আগে কখনো শুনি নি। রুমী বলল, 'নিশ্চয় ছদ্মনাম।'

বললাম, 'হতে পারে। তবে ঢাকারই লোক এ। এই ঢাকাতেই এই গলা শুনেছি। হয় নাটক, নয় আবৃত্তি।' এইসব গবেষণা করতে করতে বাংলা সংবাদ পাঠ শেষ।

আজকের প্রোগ্রামেও বেশ নতুনত্ব। কণ্ঠস্বরও সবই নতুন শুনছি। একজন একটা কথিকা পড়লেন–চরমপত্র। বেশ মজা লাগল শুনতে, শুদ্ধ ভাষায় বলতে বলতে হঠাৎ শেষের দিকে একেবারে খাঁটি ঢাকাইয়া ভাষাতে দুটো লাইন বলে শেষ করলেন।

অদ্ভুত তো। কিন্ত এখানে আলটিমেটামের মতো কিছু তো বোঝা গেল না।

শরীফ বলল, 'ঐ যে বলল না একবার যখন এ দেশের কাদায় পা ডুবিয়েছ, আর রক্ষে নেই। গাজুরিয়া মাইরের চোটে মরে কাদায় মধ্যে শুয়ে থাকতে হবে, এটা আলটিমেটাম।'

'কি জানি।'

জামী জানতে চাইলে, 'গাজুরিয়া মাইর কি জিনিস?'

রুমী বলল, 'জানি না। আমার ঢাকাইয়া বন্ধুর কাউকে জিগ্যেস করে নেব।'

ঐ যে মুক্তিফৌজের গেরিলা তৎপরতার কথা বলল–ঢাকার ছ'জায়গায় গ্রেনেড ফেটেছে, আমরা তো সাত আটদিন আগে এ রকম বোমা ফাটার কথা শুনেছিলাম, কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করি নি। ব্যাপারটা তাহলে সত্যি? আমার সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। ব্যাপারটা তাহলে সত্যি! সত্যি তাহলে ঢাকার আনাচে-কানাচে মুক্তিফৌজের গেরিলা প্রতিঘাতের ছোট স্ফুলিঙ্গ জ্বালাতে শুরু করেছে? এতদিন জানছিলাম বর্ডারঘেঁষা অঞ্চলগুলোতেই গেরিলা তৎপরতা। এখন তাহলে খোদ ঢাকাতেও?

মুক্তিফৌজ! কথাটা এত ভারি যে এই রকম অত্যাচারী সৈন্য দিয়ে ঘেরা অবরুদ্ধ ঢাকা শহরে বসে মুক্তিফৌজ শব্দটা শুনলেও কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়। আবার ঐ অবিশ্বাসের ভেতর থেকে একটা আশা, একটা ভরসার ভাব ধীরে ধীরে মনের কোণে জেগে উঠতে থাকে।

৫ই সেপ্টেম্বর : রবিবার ১৯৭১

একটা কঠিন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে গত দুদিন থেকে শরীফ আর আমি খুব দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছি। রুমীকে কি করে বের করে আনা যায়, তা নিয়ে শরীফের বন্ধুবান্ধব নানারকম চিন্তাভাবনা করছে। এর মধ্যে বাঁকা আর ফকিরের মত হলো : যে কোনো প্রকারে রুমীকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে। বাঁকা আর ফকির মনে করছে– শরীফকে দিয়ে রুমীর প্রাণভিক্ষা চেয়ে একটা মার্সি পিটিশন করিয়ে তদবির করলে রুমী হয়তো ছাড়া পেয়ে যেতেও পারে।

রুমীর শোকে আমি প্রথম চোটে 'তাই করা হোক' বলেছিলাম। কিন্তু শরীফ রাজি হতে পারছে না। যে সামরিক জনতার বিরুদ্ধে রুমী মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে, সেই সরকারের কাছে মার্সি পিটিশন করলে রুমী সেটা মোটেও পছন্দ করবে না এবং রুমী তাহলে আমাদের কোনোদিনও ক্ষমা করতে পারবে না। বাঁকা ও ফকির অনেকভাবে শরীফকে বুঝিয়েছে–ছেলের প্রাণটা আগে। রুমীর মতো এমন অসাধারণ মেধাবী ছেলের প্রাণ বাঁচলে দেশেরও মঙ্গল। কিন্তু শরীফ কিছু মত দিতে পারছে না। খুনী সরকারের কাছে রুমীর প্রাণভিক্ষা চেয়ে দয়াভিক্ষা করা মানেই রুমীর আদর্শকে অপমান করা, রুমীর উঁচু মাথা হেট করা। গত দু'রাত শরীফ ঘুমোয় নি, আমি একবার বলেছি, 'তোমার কথাই ঠিক। ঐ খুনী সরকারের কাছে মার্সি পিটিশন করা যায় না।' আবার খানিক পরে কেঁদে আকুল হয়ে বলেছি, 'না মার্সি পিটিশন কর।' এইভাবে দ্বিধাদ্বন্দ্বে কেটেছে দুদিন দুরাত। শেষ পর্যন্ত শরীফ সিদ্ধান্ত নিয়েছে–না, মার্সি পিটিশন সে করবে না। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে আমিও শরীফের মতকে সমর্থন করেছি। রুমীকে অন্যভাবে বের করে আনার যতরকম চেষ্টা আছে, সব করা হবে; কিন্তু মার্সি পিটিশন করে নয়।

১১ই অক্টোবর : সোমবার ১৯৭১

শরীফ বলল, 'সেই যে মাস খানেক আগে কাগজে পড়েছিলাম ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিয়ুর রহমানের কথা, তার সম্বন্ধে আজ শুনে এলাম।'

'কী শুনে এলে? কোথায় শুনলে?'

'ডাঃ রাব্বির কাছে। রাব্বি–জানোতো, আমাদের সুজার ভাস্তে।'

শরীফের এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু সুজা সাহেব, তাঁর ভাস্তে ডাঃ ফজলে রাব্বি।

শরীফ বলল, 'আজ ফকিরের অফিসে গেছিলাম, ওখানে রাব্বি সঙ্গে দেখা। ওর মুখেই শুনলাম মতিয়ুর রহমানের ফ্যামিলি ২৯ সেপ্টেম্বর করাচি থেকে ঢাকা এসেছে। মতিয়ুর রহমানের শ্বশুর গুলশানের এক বাড়িতে থাকেন। সেইখানে ৩০ তারিখে মতিয়ুরের চল্লিশা হয়েছে। রাব্বি গিয়েছিল চল্লিশায়। মিসেস মতিয়ুর নাকি বাংলা বিভাগের মনিরুজ্জামানের শালী।

'আমাদের স্যার মনিরুজ্জামানের ? তার মানে ডলির বোন? দাঁড়াও, দাঁড়াও–এই বোনকে তো দেখেছি ডলিদের বাসায়–মিলি এর নাম।'

ডলির কথা মনে পড়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ডলি, মনিরুজ্জামান স্যার, ওদের কোনো খোঁজই জানি না। দুটো বাচ্চা নিয়ে কোথায় যে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে–কে জানে। ওপারেও যায় নি, গেলে বেতারে নিশ্চয় গলা শুনতে পেতাম। স্বাধীন বাংলা বেতারে বহু পরিচিতজনের

গলা শুনি, তারা ছদ্মনাম ব্যবহার করে, কিন্তু গলা শুনে চিনতে পারি। প্রথম যেদিন স্বাধীন বাংলা বেতার সালেহ আহমদের কণ্ঠে খবর শুনি, খুব চেনা-চেনা লেগেছিল, দু একদিন পরেই চিনেছিলাম–সে কণ্ঠ হাসান ইমামের। ইংরেজি খবর ও ভাষ্য প্রচার করে যারা, সেই আবু মোহাম্মদ আলী ও আহমেদ চৌধুরী হলো আলী যাকের আর আলমগীর কবির। গায়কদের গলা তো সহজেই চেনা যায়–রথীন্দ্রনাথ রায়, আবদুল জব্বার, অজিত রায়, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, হরলাল রায়। কথিকায় সৈয়দ আলী আহসান, কামরুল হাসান, ফয়েজ আহমদ প্রায় সকলেরই গলা শুনে বুঝতে পারি। নাটকে রাজু আহমেদ, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়–এদের সবার গলাই এক লহমায় বুঝে যাই।

১৬ই ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার ১৯৭১

আজ সকাল নটা পর্যন্ত যে আকাশযুদ্ধ বিরতির কথা ছিল, সেটা বিকেল তিনটে পর্যন্ত বাড়নো হয়েছে। দুপুর থেকে সারা শহরে ভীষণ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা। পাকিস্তানি আর্মি নাকি সারেন্ডার করবে বিকেলে। সকাল থেকে কলিম, হুদা, লুলু যারাই এলো সবার মুখেই এক কথা। দলে দলে লোক জয় বাংলা ধ্বনি তুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে কারফিউ উপেক্ষা করে। পাকিস্তানি সেনারা, বিহারিরা সবাই নাকি পালাচ্ছে। পালাতে পালাতে পথেঘাটে এলোপাথাড়ি গুলি করে বহু বাঙালিকে খুন-জখম করে যাচ্ছে। মঞ্জুর এলেন তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে, গাড়ির ভেতরে বাংলাদেশের পতাকা করে বিছিয়ে। তিনিও ঐ এক কথা বললেন। বাদশা এসে বলল, এলিফ্যান্ট রোডের আজিজ মোটরসের মালিক খান জীপে করে পালাবার সময় বেপরোয়া গুলি চালিয়ে রাস্তার বহু লোক জখম করেছে।

মঞ্জুর যাবার সময় পতাকাটা আমাকে দিয়ে গেলেন। বললেন, 'আজ যদি সারেন্ডার হয়, কাল সকালে এসে পতাকাটা তুলব।'

আজ শরীফের কুলখানি। আমার বাসায় যাঁরা আছেন, তাঁরাই সকাল থেকে দোয়া দরুদ কুল পড়ছেন। সবাইকে বলা হয়েছে বাদ মাগরেব মিলাদে আসতে। এ. কে.খান, সানু, মঞ্জু, খুকু সবাই বিকেল থেকেই এসে কুল পড়ছে।

জেনারেল নিয়াজী নব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে আজ বিকেল তিনটের সময়। যুদ্ধ তাহলে শেষ? তাহলে আর কাদের জন্য সব রসদ জমিয়ে রাখব?

আমি গেস্টরুমের তালা খুলে চাল, চিনি, ঘি, গরম মসলা বের করলাম কুলখানির জর্দা রাঁধবার জন্য। মা, লালু, অন্যান্য বাড়ির গৃহিণীরা সবাই মিলে জর্দা রাঁধতে বসলেন।

রাতের রান্নার জন্যও চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি এখান থেকেই দিলাম। আগামীকাল সকালের নাশতার জন্যও ময়দা, ঘি, সুজি, চিনি, গরম মসলা এখান থেকেই বের করে রাখলাম।

অভিজ্ঞতা বর্ণনা

প্রতিদিনের চলার পথে আমরা নানান ঘটনার সম্মুখীন হই। এসব ঘটনা হতে পারে আনন্দের, হতে পারে দুঃখের বা বিস্ময়ের। এসব থেকে আমরা যা অর্জন করি তা-ই অভিজ্ঞতা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমরা অপরের কাছে প্রকাশ করি। অপরে তা থেকে উপকৃত হতে পারে। অভিজ্ঞতা থেকে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা নেওয়া যায়।

অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত বা যৌথও হতে পারে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো নিজের জীবনের কোনো উল্লেখযোগ্য, চমকপ্রদ বা হৃদয়ে স্পর্শ করার মতো আনন্দ বা দুঃখের অভিজ্ঞতাকে অপরের কাছে উপস্থাপন করা। নিদিষ্ট কোনো পরিস্থিতি বা ঘটনা বর্ণনার মধ্যদিয়েই অভিজ্ঞতা উপস্থাপিত হয়। এ ধরনের উপস্থাপনার মাধ্যমে কেবল অভিজ্ঞতাই প্রকাশ করা হয় না, সে অভিজ্ঞতার গুরুত্ব এবং জীবনে তার প্রভাব সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়।

অভিজ্ঞতা বর্ণনা বিষয়ক নির্দেশনা

১. অভিজ্ঞতা বর্ণনার পূর্বে খুঁটিনাটি এলোমেলো সমস্ত ভাবনা সাজিয়ে নিতে হয়।

২. অভিজ্ঞতা বর্ণনামূলক রচনার কাঠমো অন্যান্য রচনার মতোই হয়। ভূমিকা, গর্ভাংশ ও উপসংহার–প্রধানত এ তিনটি অংশ মিলে একটি অখণ্ড ভাব অভিজ্ঞতা বর্ণনায় উপস্থাপিত হয়।

৩. অভিজ্ঞতা বর্ণনামূলক রচনার ভূমিকা অংশে অভিজ্ঞতার মূল বিষয়ের ইঙ্গিত থাকে। বর্ণনাকারীর জীবনে অভিজ্ঞতার ঘটনা কী প্রভাব ফেলেছে সে বিষয়টিও আভাসিত হতে পারে।

৪. গর্ভাংশ এক বা একাধিক অনুচ্ছেদে রচিত হতে পারে। অভিজ্ঞতার বিবরণ আকর্ষণীয় হয় তখন, যখন প্রাসঙ্গিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির অনুপুঙ্খ চিত্র এমনভাবে অঙ্কিত হয় যে পাঠকের মানসচক্ষে তা চলমান ছবির মতো ভেসে ওঠে, পাঠক যেন পরিবেশের গন্ধ পায়, শব্দ শুনতে পায় বর্ণিত ঘটনার মধ্যদিয়ে।

৫. জীবনে কোনো অভিজ্ঞতা বিশেষ প্রভাব ফেললে উপসংহারে তা উল্লেখ করা যায়। এ বিশেষ অভিজ্ঞতার আলোকে উপসংহার টানা সম্ভব।

৬. অভিজ্ঞতা বর্ণনা ধারাবাহিক হতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে, বর্ণনা যেন সাদামাটা না হয়।

৭. ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনামূলক রচনার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র শৈলী নির্মাণে লেখকের স্বাধীনতা রয়েছে। স্বাধীনতার আলোকে চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় ঘটনা-বর্ণন লেখককে পারদর্শিতা প্রমাণ করে।

একটি পূর্ণিমা রাত

আমার প্রিয় বন্ধু তপু, দীপ্র ও স্বপন। আমাদের মধ্যে তুমুল তর্ক হয়; বিষয়: দিনক্ষণ নির্ধারণ এবং স্থান নির্বাচন। তপু আমাদের কলেজের, শুধু আমাদের কলেজেরই নয়, আমার দেশের সেরা বিতার্কিক। সব কিছুতেই ও যুক্তি খোঁজে। আমি প্রস্তাব করলাম শরতের পূর্ণিমা

দেখবো। তপুর মতে বসন্তের পূর্ণিমা শ্রেষ্ঠ। আমি সেন্ট মার্টিনে পূর্নিমা দেখার প্রস্তাব দিই। তপু কুয়াকাটার পক্ষে যুক্তি দেখায়। দীপ্র সুন্দরবন এলাকায় আর স্বপন জয়দেবপুর ন্যাশনাল পার্কের প্রস্তাব উত্থাপন করে। আর স্বপন বললো বৈশাখের পূর্ণিমাতেই পৃথিবী সুন্দর সবচেয়ে। তারপরও সময় হতে পারে কাল বৈশাখী। তাই স্বপন দরাজ গলায় গেয়ে ওঠে :

আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।

হার মানলাম সবাই। রবীন্দ্রনাথের ওপর কী আর কথা চলে। রবীন্দ্রনাথ বসন্তের জ্যোৎস্নারাতে বনে যাওয়ার কথা বলেছেন। তাই ঠিক। এবার স্থান নির্ধারণের পালা। সিদ্ধান্ত হলো, আসছে বসন্তেই গাজীপুর ন্যাশনাল পার্কে একটি রাত জেগে জোছনার শোভা দেখবো আমরা।

তপুর মামা ঐ পার্কে কর্মরত। তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবার দায়িত্ব নিলেন।

জ্যোৎস্নারাতের সেই স্মৃতি কোনো দিন ভোলা যাবে না। জ্যোৎস্নাদর্শনের যে মধুর স্মৃতি আমর হৃদয়পটে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত আছে, আমার সাধ্য নেই তার বর্ণনা দেওয়ার। একজন রবীন্দ্রনাথ, একজন জীবনানন্দ, একজন বিভূতিভূষণ সেই অপরূপ শোভার অনিন্দ্যসুন্দর অকৃত্রিম মোহনীয় বর্ণনা দিতে পেরেছেন। সে সাধ্য আমার কোথায়?

সন্ধার আকাশে সেদিন বড় চাঁদটি উঠেছিল। দখিনা বাতাস বইছিল মৃদুমন্দ। আমার বসেছিলাম লেকের পাড়ে। ফুটফুটে জোছনায় ভেসে গেছে চারদিক। লেকের জলে প্রতিবিম্বিত হয়েছে চাঁদ। চারপাশের গাছপালাও ছায়া ফেলেছে জলে। এক অপূর্ব রহস্যময় অপার্থিব সেই সৌন্দর্য। রুপোলি চাঁদের স্নিগ্ধ আলো, বিস্তীর্ণ লেকের জলে থিরিথিরি কম্পন, অজানা বনফুলের পাগল-করা সৌরভ, গাছের শাখায় বাতাসের মর্মরধ্বনি, বুনো পাখিদের ডানা ঝাপটানোর শব্দ, অদূরে নিশাচর প্রাণীদের কোলাহল-সব মিলে মোহময় প্রেমময় হৃদয়–হরণীয় অপার্থিব অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছিল।

মাঝরাতে বনের একেবারে গভীরে বসেছিলাম আমরা। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে খণ্ড খণ্ড জ্যোৎস্নাধারা দুধের স্রোতধারার মতো চুইয়ে পড়ছে। আলো-ছায়ার এমন মোহময় রূপ জীবনে আর দেখিনি। কুয়াশার চাদরে ঘেরা বনভূমি।

এই বনভূমি যেন প্রকৃতির কোনো অংশবিশেষ নয়, কোনো অপার্থিব রহস্যময় প্রাণিসত্তা। হাত দিলে যাকে ছোঁয়া যায়, শুঁকে দেখলে পাওয়া যায় শরীরের ঘ্রাণ। বাতাসে গাছের শাখাগুলো দোল খায়, পাতার মৃদু মর্মর ধ্বনি আর ঝিঁঝিঁ পোকার অবিশ্রান্ত সংগীত গুঞ্জন। চোখের সামনে দু হাত মেলে ধরি। আমার করতলে জোছনা আর গাছের ছায়ার লুকোচুরি খেলা। মুষ্টিবদ্ধ করি; হারিয়ে যায় যেন জোছনার অপার্থিব হাসি। আমার মনে ভর করে দর্শন। আমাদের মনুষ্য জন্ম কতো ছোট একটি সময়ের বেড়াজালে আবদ্ধ। এই সংক্ষিপ্ত জীবনে কতো কিছু আমরা পেতে চাই। আসলে আমরা কী পাই? মুষ্টিবদ্ধ হাতে ভেতরকার অন্ধকারের মতোই তা রহস্যময়। কেন যেন আমার বুকের ভেতর কান্না দলা পাকিয়ে ওঠে। ভিজে ওঠে চোখের পাতা।

শেষ রাতে আমরা টিলার ঢাল বেয়ে নেমে গিয়েছিলাম নিচের সমতলে। চারদিকে ধাপে ধাপে

উঠে গেছে টিলা, টিলার গায়ে শাল গজারির নিবিড় অরণ্য। মাঝখানে এক চিলতে সমতলভূমি। কৃষকেরা ধান চাষ করেছিল। ধান উঠেছে আরো আগে। খেতময় পড়ে আছে খড়কুটো। রেশমি কোমল গালিচা যেন পেতে রাখা হয়েছে। আমরা বসেছি খেতটির মাঝখানটিতে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। দূরের বনভূমি যেন কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে থাকা স্তব্ধ পর্বতমালা; যেন মনে হয়, ধূসরের ওপর খেয়ালি বালক মোম রঙ বুলিয়ে দিয়েছে। এক সময় মনে হয় জোছনা যেন এক স্বচ্ছ, স্ফটিক, রুপোলি জলের কোনো অপার্থিব সমুদ্র। আমরা মিশে আছি সেই সমুদ্রের গভীর তলদেশে, চারপাশে নিবিড় বনভূমি যেন একরাশ সুন্দর সামুদ্রিক বৃক্ষের সমারোহ।

চোখ বন্ধ করলে আমি আজো দেখি সেই অপরূপ জোছনার মায়াবী রূপ। কেবলই মনে হয় : সৌন্দর্য দেখার বিষয়, বর্ণনায় প্রকাশ করবার নয়।

একটি বর্ষণমুখর সন্ধ্যা

বাইরে বাতাস বইছে। জানালার কপাট দুটো দেওয়ালে এসে ধাক্কা দেয়। জানালার কাছে এগিয়ে যাই। বৃষ্টির ছাট এসে মুখে লাগে। কী প্রশান্তি। কী স্নিগ্ধ পরশ বৃষ্টির! জানালা বন্ধ করতে কিছুতেই মন চাইছে না। মনে পড়ছে মায়ের নিষেধ। দুপুরে বোনকে নিয়ে মা মামা বাড়ি গেছেন। বাবা থাকেন শহরে। সেখানে তার কর্মস্থল। যাবার সময় মা বারবার বলেন, 'একা বাড়িতে থাকতে পারবি তো? ভয় পাবি। তুইও চল।'

টিনের চালে ঝুমঝুম বৃষ্টি; যেন নূপুরের শব্দ। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই। ঘন ঘোর অন্ধকার। মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎ চমকায়। মুহূর্তের জন্য চারদিক আলোকময় হয়ে ওঠে। আমি যে জানালায় দাঁড়িয়ে আছি, সেটা বাড়ির ভেতরের দিক। উঠোন পেরিয়ে কিছু গাছগাছালি, তারপর পুকুরে পুকুরে ব্যাঙ ডাকছে। শুরু হলো শিলাবৃষ্টি। টিনের চালে অবিশ্রাম টুং টাং শব্দ। শিল কুড়াতে বাইরে যাবো নাকি? ইচ্ছাও করছে, আবার মনে পড়ছে, বৃষ্টিতে ভিজলেই আমার জ্বর হয়। বৃষ্টি আমি এত পছন্দ করি, অথচ বৃষ্টির জল একটুখানি মাথায় পড়লেই জ্বর। হঠাৎ খেয়াল হলো, বৃষ্টির ঝাপটায় আমার মাথা পুরোটাই ভিজে গেছে; গায়ের গেঞ্জি, পরনের প্যান্টও ভিজে সারা।

জানালা বন্ধ করে দিই। হঠাৎ করেই প্রবল বাতাস বইতে শুরু করে। ঝড় এলো বোধ হয়। প্রবল বাতাসের ধাক্কায় জানালার পাল্লা দুটো আবার খুলে যায়। এগিয়ে গিয়ে জানালা বন্ধ করি। বাতাসের ঝাপটায় হ্যারিকেনটা নিভে যায়। এখন কী হবে? মা ম্যাচবক্স কোথায় রেখেছেন, কে জানে! রাতের খাবার খাই নি এখনো। ভেবেছি, ঘুম এলে খেয়ে শুয়ে পড়বো। এখন কী করে খাবো? এক রাত না খেলে কিছু হয় না। যতই মনকে বোঝাই, ততই খিদে বেড়ে যায়। হঠাৎ একটা শব্দ শোনা গেলো। কে যেন দরজায় কড়া নাড়ছে। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। বড় মামার গলা মনে হয়। 'রাতুল, দরজা খোল। ঘুমিয়ে পড়েছিস নাকি?' বুকে শক্তি পেলাম। অন্ধকারে হাতড়ে দরজা খুলে দিই। পাঁচ ব্যাটারির টর্চ জ্বালিয়ে কাকা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। বৃষ্টি থেমে গেছে। বাতাস হালকা হয়ে এসেছে।

বক্তব্য লেখন

কোনো সভা-সমাবেশ, আলোচনা সভা, সেমিনার, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে কোনো বিষয় সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ, সাবলীল ভাষায় শ্রুতিমধুর স্বরে বক্তব্য প্রদান করাকে বক্তব্য বা ভাষণ বলে। মূলত ইংরেজি Talk, Speech, Lecture, Address ইত্যাদি শব্দকে বাংলায় ভাষণ, বক্তৃতা, বিবৃতি নামে অভিহিত করা হয়। ভাষণ হচ্ছে এক ধরনের বাচনিক শিল্প বা বাকশিল্প। চমৎকার করে বক্তৃতা বা ভাষণ প্রদান করা এক ধরনের দক্ষতা। এ দক্ষতা সবার থাকে না। ফলে, ভাষণ বা বক্তৃতা অনেক সময় যেমন আকর্ষণ সৃষ্টি করে, তেমনি আবার কারো কারো বক্তৃতা বিরক্তিরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মানুষের মনের শ্রেষ্ঠবাহন ভাষা। এ ভাষার শৈল্পিক বা উৎকৃষ্ট প্রকাশকৌশলই ভাষণকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করতে গেলে মানুষকে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে ভাষণ বা বক্তৃতা প্রদান করতে হয়। এ বক্তৃতা নিয়মসিদ্ধভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

বক্তব্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ভাষণের উদ্দেশ্য বা মূল লক্ষ্য শ্রোতা বা দর্শককে কোনো বিষয়ে তথ্য প্রদান করা। কোনো ঘটনা বা আদর্শের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে সমর্থন অর্জনের জন্য বক্তা ভাষণ প্রদান করেন। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে, সাহিত্য-সংস্কৃতি ধর্ম, অর্থনীতি ইত্যাদি নানা উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করার রীতি প্রচলিত আছে।

বক্তব্যের ভাষা হতে হয় সরস ও তথ্যসমৃদ্ধ। তা না হলে শ্রোতাদের বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে। সেজন্য ভাষণ প্রদানের সময় অনেক বিষয়ের ওপর লক্ষ্য রাখতে হয়। বক্তা তার উদ্দেশ্য সাধানের জন্য অনেক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। কথার সৌন্দর্য দিয়ে শ্রোতার মনেও হৃদয়াবেগের সঞ্চার করেন। তবে সেটারও স্থান কাল বা ক্ষেত্র নির্বিশেষে পার্থক্য আছে। যেমন দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী যখন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন তখন সেখানে রসালো ভাষা থাকে না। তবে সেই ভাষণে থাকে অনেক তথ্য, তত্ত্ব ও প্রজ্ঞা। বক্তার অন্যতম লক্ষ্য হলো শ্রোতাকে অনুপ্রাণিত করা। বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ জনগণকে বক্তৃতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। আমরা জগৎবিখ্যাত কোনো কোনো বাঘানেতার নাম জানি যাঁরা বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে তাঁর পক্ষে এনেছিলেন। আমেরিকার স্বাধীনতার অগ্রনায়ক ও প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম, লিংকন, ইংল্যান্ডের উইনস্টোন চার্চিল, এডমন্ড বার্ক, জার্মান নেতা এডলফ হিটলার, বাংলাদেশের মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ নেতার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের অমোঘ ঘোষণা। তাঁর ভাষণে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

নানা প্রয়োজনে ভাষণ বা বক্তৃতার প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষকে নানা ফোরামে কথা বলতে হয়। শিক্ষক, কর্মকর্তা, আইনজীবী, আমলা, নেতা সবাইকে শ্রেণিকক্ষ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সভাসমিতি, ক্লাব, পার্টি বা কর্মস্থলের নানা কর্ম উপলক্ষে বক্তৃতা করতে হয়।

বক্তব্যের গুরুত্ব

কথা বলা বা সুন্দর করে নিজের চিন্তা-ভাবনা ব্যক্ত করা বা বাগ্মিতা সকল যুগেই গুণধর্ম হিসেবে বিবেচিত। প্রাচীন কালে বক্তার বাগ্মিতা পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের প্রকাশ বলে বিবেচিত হতো। আধুনিক কালেও তা প্রসংশিত। দার্শনিক-বিজ্ঞানী-রাজনীতিবিদ-সমাজতাত্ত্বিক-ধর্মগুরু–এঁরা সবাই বাগ্মী ছিলেন। দার্শনিকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, বিজ্ঞানীর উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, রাজনীতিবিদের রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজতাত্ত্বিকের তাত্ত্বিক রূপাবয়ব, ধর্মগুরুর ধর্মের স্বরূপ তাঁরা তাদের বক্তৃতা বা ভাষণের মাধ্যমেই প্রচার করেছেন। তাই ভাষণের গুরুত্ব বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

বক্তব্যের উপাদান

ভাষণের মূল উপাদান চারটি। যথা : ১.বক্তা ২. শ্রোতা ৩. বক্তব্যের বিষয় ৪. বক্তব্যের স্থান।

বক্তা-শ্রোতা-বক্তব্য এগুলো পরিপূরক অনুষঙ্গ। বক্তার কাজ বক্তব্য প্রদান করা এবং শ্রোতার কাজ শ্রবণ করা। তবে বক্তার ও শ্রোতার উভয়ের মধ্যেই একটি লক্ষ্য কাজ করে। বক্তা যে উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন শ্রোতা অনুরূপ উদ্দেশ্যে তা শ্রবণ করেন। অর্থাৎ যেখানে একটি বিষয় থাকে সে বিষয়টি বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে এক ধরনের মানসিক যোগাযোগ তৈরি করে। অপরদিকে, ভাষণ প্রদানের ও শ্রবণের জন্য বক্তা শ্রোতার একটি সমাবেশ করানোর স্থান নির্ধারণ করা হয়। সেই স্থানে সকলে নির্দিষ্ট সময়ে সমবেত হয়ে থাকে। তাই ভাষণের সঙ্গে এই চারটি উপাদানের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে।

বক্তব্যের শ্রেণিবিভাগ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ভাষণ নানা পর্যায়ে নানা কারণে দেওয়া হয়ে থাকে। সেইসূত্রে ভাষণকে কোনো নির্দিষ্টভাবে শ্রেণিকরণ সম্ভব বা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। বিষয়গত কারণে ভাষণ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। আবার বক্তার অবস্থানও হতে পারে বিভিন্ন স্থানে। যেমন–মাঠে-ময়দানে, হাটে-বাজারে, স্কুলে-কলেজে, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বেতার, টেলিভিশন, পার্লামেন্ট এমনকি পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত রূপও ভাষণ হতে পারে। তবে ভাষণকে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন:

লিখিত বক্তব্য

অলিখিত বা তাৎক্ষণিক বক্তব্য

লিখিত ভাষণের জন্য বক্তার পূর্ব প্রস্তুতি থাকে। মূলত লিখিত আকারে বাণীকে শ্রোতার সামনে পাঠ করে শোনানো হয়ে থাকে। বক্তা জনসমক্ষে বা বেতার টেলিভিশনে সেই লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনান। অপরদিকে, পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই বক্তা তাৎক্ষণিক ভাবে যে ভাষণ প্রদান করেন তা অলিখিত বা তাৎক্ষণিক ভাষণ। তবে লিখিত ভাষণের একটি সুবিধা হলো এই যে, কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট বা বস্তুনিষ্ঠভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করা যায়। অন্যদিকে, তাৎক্ষণিক ভাষণের ক্ষেত্রে এই সব বিষয়গুলো যথাযথভাবে রক্ষিত নাও হতে পারে। কিন্তু অনেক বক্তার বাগ্মিতার কারণে লিখিত বক্তব্যের চেয়ে তাৎক্ষণিক ভাষণ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। ক্ষেত্রবিশেষে কথার বাহুল্য ঘটলে বিরক্তিও উৎপাদন করে থাকে।

লিখিত ও অলিখিত বক্তব্যকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়:

ক. **নীতি-নির্ধারণী** : অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কোনো ইস্যুতে জনমত গঠনে নানা ফোরামে নীতি-নির্ধারণী ভাষণ উপস্থাপন করা হয়। যেমন: 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হওয়া সঙ্গত না অসঙ্গত'–এ ধরনের বিষয়, যেখানে আলোচকেরা প্রস্তাবনার পক্ষে অথবা বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনে সচেষ্ট হন।

খ. **পেশাগত** : বিভিন্ন পেশাজীবী, বিশেষ করে আইনজীবী, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, হকার তাদের পেশাগত কাজরে অংশ হিসেবে প্রতিদিন যে ভাষণ দেয়, তাই পেশাগত ভাষণ। যেমন: একজন সাহিত্যের অধ্যাপক 'সৈয়দ শামসুল হকের গল্প বলার কৌশল' বিষয়ে একটি শ্রেণিকক্ষে ভাষণ দেন।

গ. **আনুষ্ঠানিক** : কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যুবার্ষিকীতে অথবা কোনো বিশেষ দিন উদ্‌যাপন উপলক্ষে অথবা সমকালীন সমস্যামূলক কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা সভা ডেকে যেসব বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয়, তাকে আনুষ্ঠানিক ভাষণ বলে। 'প্রকাশনা শিল্পের ভবিষ্যৎ' একটি আনুষ্ঠানিক ভাষণ।

ঘ. **বিনোদনমূলক** : বিবাহ অনুষ্ঠানাদি, বনভোজন বা অনুরূপ কোনো আনন্দময় পরিবেশে বিনোদনধর্মী যেসব সরস কথামালার আয়োজন করা হয় তাকে বিনোদনমলূক ভাষণ বলে। যেমন: 'স্ত্রীর মন জয়', 'বিয়ে না লড়াই'–এ রকম বিনোদনমূলক ভাষণের কিছু দৃষ্টান্ত।

বক্তব্যের কাঠামো

কথার বাহুল্য, সময়ের বাহুল্য, তথ্যের দৈন্য ইত্যাদি কারণে একটি ভাষণ অসফল হতে পারে। তাই একটি সার্থক ভাষণের জন্য চারটি অপরিহার্য অংশ থাকা প্রয়োজন। যথা :

ক. সম্বোধন বা সম্ভাষণ করা
খ. বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে ভূমিকা বা সূচনা করা
গ. মূল বক্তব্য
ঘ. উপসংহার বা সারসংক্ষেপ করা এবং ধন্যবাদ প্রদান করা।

নিম্নে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলো:

ক. **সম্বোধন** : বক্তা মঞ্চে ও তার সামনে বসা জনগণকে সম্বোধন করে ভাষণ শুরু করেন। আনুষ্ঠানিক সভা-সমিতিতে এ সম্বোধন বেশ জরুরি। সভাপতি প্রধান অতিথিকে বিশেষ অতিথি এবং শ্রোতাকে সম্বোধন করে সাধারণত বক্তৃতা শুরু করা হয়।

খ. **বিষয়-উপস্থাপন** : শ্রোতাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য বক্তা তাঁর বলবার বিষয়কে শ্রোতার সামনে প্রথমেই তুলে ধরেন।

গ. **মূল বক্তব্য** : ভাষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান অংশ হলো মূল বক্তব্য। এ অংশে বক্তা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তাঁর বক্তব্য বা আলোচনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। ভাষণ মূলত

বিষয়ভিত্তিক হয় বলে বক্তাকে যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হয় সুনির্দিষ্ট ছকে ক্রমপরম্পরায় বক্তব্যকে সুবিন্যস্ত ও সুসংহত করা। বক্তব্যের

ধারাবাহিকতা যেন রক্ষিত হয়, পারম্পর্য যেন ছিন্ন না হয় এবং মূল প্রসঙ্গের যেন বিচ্যুতি না ঘটে সেদিকে বক্তাকে অত্যন্ত সজাগ থাকতে হয়। মূল বক্তব্য যেন সহজেই শ্রোতাদের বোধগম্য হয় এবং মনে দাগ কাটে সেজন্যে তিনি প্রয়োজনমতো বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করেন। তাঁর অভিমতের সপক্ষে তথ্য, প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করেন, প্রতিপক্ষের অগ্রহণযোগ্য যুক্তি খণ্ডন করেন। বক্তেব্যের সমর্থনে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ, উদ্ধৃতি ইত্যাদি ব্যবহারও অনেক সময় অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়। বক্তৃতাকে চমকপ্রদ, আকর্ষণীয় ও হৃদয়গামী করার জন্য বক্তা মূল বক্তব্য আদ্যন্ত একভাবে উপস্থাপন করেন না। কোথাও তিনি ভাবগাম্ভীর্যকে গুরুত্ব দেন, কোথাও শাণিত বাচনে বিরুদ্ধ ধারণাকে ছিন্নভিন্ন করেন, কোথাও তির্যক ব্যঙ্গে সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন, কোথাও নাটকীয় জিজ্ঞাসায় শ্রোতাদের চিন্তাকে উসকে দেন। ফলে বক্তব্যের বিষয় শ্রোতার কাছে ক্লান্তিকর, একঘেয়ে বা গতানুগতিক মনে হয় না। বরং মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোতারা নিবিষ্ট মনে ভাষণ শোনেন। মূল বক্তব্য উপস্থাপনের কুশলতায় বক্তার বিষয়-জ্ঞান যুক্তিবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, বাগ্মিতা ইত্যাদির প্রকাশ ঘটে এবং বক্তৃতা হয়ে ওঠে শিল্পগুণমণ্ডিত।

ঘ. **উপসংহার:** বক্তব্যের সমাপ্তি টানা হয় উপসংহারে। সার্থক উপসংহারের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে:

ক. এমনভাবে বক্তব্য পরিবেশন যেন শ্রোতারা বুঝতে পারেন যে বক্তা উপসংহার টানতে যাচ্ছেন;

খ. বক্তব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় বা সারবস্তুকে সহজবোধ্য অথচ শিল্পকুশলতায় উপস্থাপন;

গ. মূল বক্তব্য অনুবাধনের জন্য কিংবা প্রাসঙ্গিক কোনো বিষয়ে শ্রোতাদের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ, আবেদন বা আহ্বান।

উপসংহার এমন হবে যেন তা চিন্তার দিক থেকে শ্রোতার মনে গভীর প্রভাব ফেলে এবং যথাসম্ভব তার হৃদয় জয় করা সম্ভব হয়। তাই মনে দাগ কাটে কিংবা শ্রোতাদের মন আবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে এমন উক্তি দিয়ে বক্তৃতা শেষ করলে ভালো হয়। তাহলে ভাষণ শেষ হলেও তার রেশ থেকে যায়। সবশেষে আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি টানা হয় আয়োজক ও শ্রোতাদের কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ জানিয়ে।

বক্তব্যের গুণগত বৈশিষ্ট্য

১. **যৌক্তিক বক্তব্য** : ভাষণের বক্তব্য হতে হবে যুক্তিনিষ্ঠ। তা না হলে দর্শক-শ্রোতা বক্তার কথায় আকৃষ্ট হবে না।

২. **সর্বাধুনিক তথ্য দান** : বক্তা তাঁর ভাষণে সর্বাধনিক তথ্য প্রদান করতে পারেন; সর্বশেষ পরিস্থিতির চিত্র উপস্থাপন করতে পারলে সে ভাষণ অর্থবহ হবে।

৩. **পরিসংখ্যান প্রদান :** বক্তা ভাষণে পরিসংখ্যান প্রদান করেন, যা বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে। তবে পরিসংখ্যানটি হতে হবে সত্যনিষ্ঠ, বাস্তবতা ঘনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ।

৪. **ধারাবাহিকতা বজায় :** বক্তাকে তার বক্তব্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। ভাষণের মূল কাঠামো বজায় রাখা হয়েছে কিনা সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৫. **ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ :** বক্তা নিজস্ব জীবনাভিজ্ঞতা থেকে কোনো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলে তা যদি যথোপযুক্ত হয়, তাহলে ভাষণটি দর্শক-শ্রোতা সাগ্রহে গ্রহণ করবে। তবে এক্ষেত্রে বক্তার পরিমিতিবোধ থাকা একান্ত জরুরি।

৬. **বিনীত ও পরিশীলিত ভাষা :** ভাষণ দিতে গিয়ে অনেকেই জ্ঞানদান বা উপদেশ দেওয়া শুরু করেন। অনেকেই এমনভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করেন, যেন তার মতই চূড়ান্ত এবং তার মতের সঙ্গে সবাইকে একমত হতে হবে। ভাষণ সার্থক করতে হলে বক্তাকে নিরেট-কঠিন-একগুঁয়ে বক্তব্য পরিহার করতে হবে। কারো বক্তব্যের সঙ্গে উপস্থিত সবাই একমত না-ও হতে পারে। তাই নিজস্ব মতামত প্রকাশের সময় প্রয়োজন মতো 'আমার মনে হয়', 'আমি মনে করি', 'আপনারা আমার সঙ্গে একমত হবেন কিনা জানি না' ইত্যাদি বাক্যাংশ সংযুক্ত করা যেতে পারে।

৭. **কথকতামূলক ভাষা :** বক্তার ভাষা লিখিত ভাষার মতো শোনালে তা দর্শক-শ্রোতার মনে দাগ কাটতে সক্ষম হয় না। ভাষণকে তাৎপর্যমণ্ডিত ও অর্থবহ করে তুলতে হলে এর ভাষা হতে হবে কথকতাধর্মী। বক্তা যেন তার সহজ ও সাবলীল ভাষায় আন্তরিকভাবে দর্শক-শ্রোতার সঙ্গে ভাব বিনিময় করেছেন–বক্তার ভাষা হবে এমন।

৮. **আবেগ সঞ্চয়:** বক্তার যুক্তিরাশি দর্শক-শ্রোতার মনে যেন দাগ কাটে, এমনভাবে আবেগী ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে। তবে আবেগের পরিমিতি সম্পর্কে বক্তার বোধ থাকতে হবে। আবেগের মাত্রা যেন অতিক্রম না করে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৯. **পুনরাবৃত্তি বর্জন :** অনেকের একই কথা বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলার প্রবণতা রয়েছে। এতে অযথা যেমন কালক্ষেপণ হয় তেমনি বিরক্ত হয় দর্শক-শ্রোতা। তাই বক্তাকে লক্ষ রাখতে হবে, তিনি যেন একই কথার পুনরুক্তি ঘটিয়ে দর্শক-শ্রোতার বিরক্তির কারণ হয়ে না দাঁড়ান।

১০. **বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করা:** বক্তব্য কতটা দীর্ঘ হবে, বক্তৃতার শুরুতেই বক্তার উচিত আয়োজকদের সঙ্গে কথা বলে তা জেনে নেওয়া। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বক্তৃতা শেষ করার ব্যাপারে বক্তাকে সচেতন থাকতে হবে। অনেক বক্তা বক্তব্য শুরু করে আর শেষ কথাটি বলতে চান না। এটি নিঃসন্দেহে ভালো কথা নয়। বক্তাকে এই কথা মনে রাখতে হবে, দীর্ঘ বক্তৃতা সব সময়ই বিরক্তিকর। বক্তার কাছে তাই সময়জ্ঞান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১১. **ব্যক্তিগত আক্রমণজনিত ত্রুটি :** আলোচকবৃন্দের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে

আস্থাশীল ব্যক্তি থাকেন। তাদের বক্তৃতার সময় রাজনৈতিক ভাবাদর্শ প্রকাশ পায়। বক্তৃতায় যেহেতু পূর্ববর্তী বক্তাদের বক্তব্যের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করার সুযোগ রয়েছে, তাই কোনো বক্তার একেবারেই উচিত হবে না অন্য কোনো বক্তাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা। ভিন্নমত পোষণের সময় বক্তার বিনয় ও নম্রতা বজায় রাখা উচিত। পূর্ববর্তী বক্তার কোনো বক্তব্যকে তিনি কেন মানতে পারছেন না, ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ না করে যুক্তির মাধ্যমে তিনি তা বুঝিয়ে দেবেন। তার কণ্ঠস্বরের উচ্চতা ও উত্তাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১২. **দর্শক-শ্রোতার যোগ্যতা অনুযায়ী ভাষা নির্বাচন :** কাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন বক্তাকে তা খেয়াল রাখতে হবে। কেমন ধরনের দর্শক-শ্রোতা উপস্থিত, তা ততটা বিবেচ্য নয়য, তটা বিবেচ্য দর্শক-শ্রোতার শ্রেণিগত স্তর। সুশিক্ষিত-বিদগ্ধ সুধীজনের সামনে বক্তা যে মার্গের ভাষা ব্যবহার করতে পারেন, অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত দরিদ্র জনতার সামনে সে ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করা যায় না। সেক্ষেত্রে ভাষা তুলনামূলক সহজ ও সরল হতে হবে। বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সামনে বক্তব্য উপস্থাপনের সময় বক্তার ভাষা শিশু-কিশোর মন ও মননের জন্য উপযুক্ত সহজ সরল হওয়া উচিত। ভাষা দর্শক-শ্রোতার সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন ও মানানসই হতে হবে।

১৩. **মুদ্রাদোষ পরিহার্য :** সব মানুষেরই কম-বেশি মুদ্রাদোষ থাকে। বক্তৃতা উপস্থাপনের সময় তা পরিহারের জন্য সচেষ্ট ও সচেতন থাকতে হবে।

১৪. **আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গি :** স্পষ্ট এবং শুদ্ধ উচ্চারণে বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে। বক্তার কণ্ঠস্বর হতে হবে উদাত্ত, পরিশীলিত ও শ্রুতিমধুর। বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বক্তাকে কণ্ঠস্বরের ওঠানামা করাতে হয়। এতে বক্তব্যের শ্রুতিতে মাধুর্য সৃষ্টি করে। মাইক্রোফোন থেকে কতটা দূরত্ব বজায় রাখলে বক্তব্য স্পষ্ট শোনা যায়, সে ব্যাপারেও খেয়াল রাখতে হবে। বক্তাকে মাইক্রোফোন ব্যবহারের কলাকৌশলে পারদর্শী হতে হবে।

১৫. **রুচিশীল পোশাক নির্বাচন :** বক্তার পরিশীলিত ও রুচিশীল পোশাক পরিধান অপরিহার্য, যা বক্তাকে মার্জিত, পরিশীলিত ও আকর্ষণীয় করে তোলে। খুব বেশি দামি পোশাক পরিধান করলেই পরিশীলিত রুচি প্রকাশ করে না, আবার কম দামি পোশাক পরিধান করলেই যে অনাধুনিক মনে হবে, তা-ও নয়। রুচিশীলতা কখনো মূল্যে বিচার করা যায় না।

বক্তব্যের নমুনা

১। একুশের চেতনা ও তাৎপর্য বিষয়ে বক্তব্য

শ্রদ্ধেয় সভাপতি এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ। বক্তব্যের শুরুতেই গভীরভাবে স্মরণ করছি মহান একুশের, অমর শহিদদের, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল।

আমাদের জাতীয় জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারি এক বিশেষ দিন। একুশ জড়িয়ে আছে আমাদের

চেতনায়, বিপ্লবে, বিদ্রোহে; একুশ আমাদের সাহস, একুশ মানে মাথা নত না করা। একুশ মানে স্বাধীনতার প্রথম পরশ। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনামলে পাকিস্তানি সরকার বাঙালির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে তাদের পঙ্গু করে দিতে চেয়েছিল। তারা বাঙালিদের নিজস্বতাকে খুন করে তাদের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখতে চেয়েছিল। সেই লক্ষ্যে তারা উর্দুকে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা ঘোষণা করে। কেননা তারা জানত, বাঙালির মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে অন্য ভাষায় কথা বলতে বাধ্য করাই মাধ্যমেই বাঙালি জাতির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করা সম্ভব। কিন্তু বাঙালি জাতি এই অন্যায় সিদ্ধান্ত মেনে নেয় নি। সারা পূর্ববাংলা তখন হয়ে উঠেছিল বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদমুখর। তারই ফলে ১৯৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ছাত্ররা ৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন বেশ কয়েকজন ছাত্র-জনতা। পরবর্তীকালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় এবং একুশে ফেব্রুয়ারিকে ঘোষণা করা হয় ভাষা দিবস হিসেবে।

একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জীবনে এক বিশেষ তাৎপর্যময় ভূমিকা পালন করে। মাতৃভাষার গৌরব রক্ষার্থে রক্তদানের ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। একুশ ফেব্রুয়ারি শুধু আমাদের বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলন নয়। এই আন্দোলনের মধ্যদিয়ে প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়। এই আন্দোলনের ভেতর দিয়ে জন্ম নেয় আমাদের স্বাধিকার চেতনার কোরক। পরবর্তী সময়ের সকল আন্দোলনে প্রেরণা হয়েছে একুশ ফেব্রুয়ারি। হয়েছে সংগ্রামের অঙ্গীকার। একুশে ফেব্রুয়ারির মাধ্যমেই বাঙালি প্রমাণ করেছে দেশের আয়তনে আমরা ছোট হতে পারি, কিন্তু জাতি হিসেবে আমরা ক্ষুদ্র নই। আজ একুশ পেয়েছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি–হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের।

কিন্তু বর্তমানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একুশের তাৎপর্য ক্ষুণ্ন হচ্ছে বলে মনে হয়। বিশেষ করে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজি শিক্ষা একটি বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। একটি বিশেষ শ্রেণি এখন মনে করে যে, ইংরেজি শিক্ষা ছাড়া জীবনে উন্নয়ন সম্ভব নয়। আবার অনেকে ইংরেজি শিক্ষাকে আভিজাতের মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করেন। আমাদের উচ্চশিক্ষার মাধ্যম অনেক ক্ষেত্রে এবং অফিস-আদালতে এখনও ইংরেজি প্রচলিত আছে। অন্যদিকে, আমাদের নতুন প্রজন্ম ইংরেজি সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। ফলে দেশে বাংলা ভাষা তার প্রাপ্য মর্যাদা হারাচ্ছে। ঢাকা শহরসহ বিভিন্ন মফস্বল শহরে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে কিন্ডারগার্টেন স্কুল। ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলো আমাদের কিশোর-কিশোরীদের দেশের মধ্যেই পরবাসী করে তুলছে। তাদের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে বিদেশিয়ানা। আমরা ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে নই, কিন্তু মাতৃভাষার মর্যাদা উপেক্ষা করে নয়। তাই এখন আমাদের এগিয়ে আসতে হবে বাংলা ভাষাকে তার স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনতে। দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন করতে হবে। সেই সঙ্গে আমাদের নতুন প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে নিজের মাতৃভাষার প্রতি করে তুলতে হবে শ্রদ্ধাশীল। আমাদের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে করে তুলতে হবে শিক্ষিত। দেশের সমগ্র জনগণ শিক্ষিত হলে দেশকে উন্নয়নের

পথে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। সম্ভব হবে বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তার স্বমহিমায় সমুন্নত রাখা।

তাই আসুন, একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা সবাই এগিয়ে আসি এবং মাতৃভাষার মর্যাদা সমুন্নত রাখার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি। আমরা যদি নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ভুলে গিয়ে অপরের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আপন করে গ্রহণ করি তাহলে কখনোই জাতীয় জীবনে উন্নয়ন ঘটাতে পারবো না এবং পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা একটি পরজীবী জাতি হিসেবে গণ্য হবে। ধন্যবাদ।

বক্তা	:	রৌশন আলম প্রভাষক, বাংলা দিকপাইত কলেজ, জামালপুর
লক্ষ্য	:	স্থানীয় সুধীজন ও ছাত্রবৃন্দ
তারিখ	:	২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০

২. মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে প্রদত্ত বক্তব্য।

আনন্দমোহন মহাবিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি, মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, উপস্থিত শিক্ষার্থী ও অধ্যাপকবৃন্দ। আমি প্রথমেই মহান মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং শহিদদের আত্মার শান্তি কামনা করি। আমাকে আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আজ ২৬ মার্চ, মহান স্বাধীনতা দিবস, আমাদের জাতীয় জীবনে এই দিনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। ২৫ মার্চ কালরাত্রে বাঙালি জাতিসত্তার উপর যে নির্মম এবং পৈশাচিক অত্যাচার নেমে আসে তার ফলে ২৬ মার্চ ভোর বেলা থেকে শুরু হয় প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধই বৃহত্তর পরিবেশে রূপ নেয় স্বাধীনতা সংগ্রামে। এই স্বাধীনতা সংগ্রাম মুহূর্তের ফসল নয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন; ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন; ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলন; ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচন–ধাপগুলো অতিক্রম করে বাঙালির হাজার বছরের আকাঙ্ক্ষা রূপ পায় একটি সশস্ত্র সংগ্রামের আকারে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হয়েও ক্ষমতায় যেতে পারে নি। পশ্চিমা কুচক্রিরা ষড়যন্ত্রের জাল বুনে বাঙালির স্বাধিকারের পথ অবরুদ্ধ করে দিয়েছিল। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমান উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন: 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।' সেদিনের সে বীজমন্ত্র থেকেই ২৬ মার্চের শুভদিনে স্বাধীনতা রূপ বৃক্ষের অংকুরোদ্গম ঘটে। দীর্ঘ নয় মাস সংগ্রামের পর আমরা বিজয় লাভ করি। এই নয় মাসের ইতিহাস রক্তঝরা বেদনাসিক্ত, করুণ এবং মৃত্যুদীর্ণ। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তার দোসররা এ নয় মাসে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে পৈশাচিক আনন্দে হত্যা করেছে। সেদিনের সে হত্যাযজ্ঞের ইতিহাস সমগ্র বিশ্বের চেতনাকে আজও শিহরিত করে।

আমাদের স্বাধীনতা কারো দয়ার দান নয়। এ আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামে অর্জিত অনেক ত্যাগের ফসল। অতীত স্মরণ শুধু এটা নয়, এ এক রক্তাক্ত ইতিহাস বর্ণনা। এই ইতিহাস বার বার আমাদের স্মরণ করতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য। আমাদের দেশ শুধু ইট-কাঠ-ইস্পাতে গড়লেই চলবে না, গড়তে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অন্তর্গত করে। প্রতিনিয়ত আসছে তরুণ প্রজন্ম। তাদের জানাতে হবে, কত আত্মত্যাগ আর রক্তের বিনিময়ে আমরা এ স্বাধীনতা অর্জন করেছি। দেশপ্রেমমূলক শিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পৃক্ততা করার এখন প্রয়োজন। আমাদের প্রত্যাশা থাকবে রাষ্ট্রনেতারা আমাদের সে পথেই পরিচালনা করবেন। তা করতে পারলেই স্বাধীনতার সুফল ঘরে ঘরে পৌছবে বলে আমার বিশ্বাস। ধন্যবাদ

বক্তা	:	ড. ফজলে রাব্বি চৌধুরী সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
লক্ষ্য	:	আনন্দমোহন মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ
তারিখ	:	২৬শে মার্চ, ২০১৯

৩. নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্পর্কে একটি মঞ্চ ভাষণ।

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, উপস্থিত সুধীজন, আমাদের সালাম গ্রহণ করুন। এ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম।

আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি নিক্ষরতা দূরীকরণে আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য। পৃথিবীতে কোনো মহৎ কাজই একা কারো পক্ষে করা সম্ভবপর নয়। দেশ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করার জন্য সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিককে অক্ষর জ্ঞান দেওয়ার। কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হলে সকলে সহযোগিতা একান্ত দরকার। প্রকৃতপক্ষে এখনো আমাদের দেশে শতকরা ৫০ জন মানুষ নিরক্ষর। এর মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি। এ বিপুল সংখ্যক লোকের অক্ষর জ্ঞান দেওয়া কঠিন কাজ। কিন্তু কাজের কাঠিন্য দেখে ভয় পেলে চলবে না। মানুষকে অক্ষর জ্ঞান দান করে দীপ্যমান করে তুলতে হবে প্রতিটি অঞ্চলকে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে সর্বাত্মক সহযোগিতা যেমন দরকার তেমনি দরকার এই কর্মসূচিকে সফল করে তোলার জন্য। ঐকান্তিক নিষ্ঠা বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার বিষেশ করে মহিলাদের মধ্যে খুবই দুরূহ কাজ। কারণ বয়স্ক লোকেরা মনে করেন এই শিক্ষা তাদের কোনো কাজে আসবে না, অর্থনৈতিক সুবিধা বা সামাজিক মর্যাদাও বাড়বে না। ফলে শিক্ষাকার্য পরিচালনা কর্মী পাওয়া গেলেও শিক্ষা গ্রহণকারী লোক পাওয়া কঠিন। যারা অশিক্ষিত তারা সকলেই প্রায় গরিব। সারদিন শ্রম দিয়ে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তারা মনে করেন যেখানে অর্থনৈতিক সুবিধা নেই সেখানে বাড়তি শ্রম ব্যয় করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। বাস্তবে তাই দেখা যাচ্ছে। নিরক্ষর মুক্ত দেশ গড়ার কার্যক্রম আশাতীত সফলতা লাভ করতে পারছে না। আজ সময় এসেছে মানুষকে বোঝাবার। মানুষ লিখতে এবং পড়তে জানলে অশিক্ষিতের অপমান থেকে তিনি রক্ষা পাবেন। দেশবাসীকে বোঝাতে হবে, যে করেই হোক অক্ষর জ্ঞান লাভ করতেই হবে। আসুন, আজ থেকে আমরা সে ব্রত গ্রহণ করি। সকলকে ধন্যবাদ।

বক্তা	:	ডোনাল্ড গোমেজ প্রধান, সাক্ষরতা সবার জন্য
লক্ষ্য	:	মাঠপর্যায়ের কর্মী
তারিখ	:	২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২০

৪. নবীনবরণ অনুষ্ঠানে নবীনদের পক্ষ থেকে প্রতিভাষণ।

শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ, সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী এবং ছাত্রছাত্রী ভাইবোনেরা।

আজকের এই দিন আমাদের নবীনদের জন্য এক স্মরণীয় দিন। আজ আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেওয়ার জন্য যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে তার আন্তরিকতায় আমরা আপ্লুত, তার উষ্ণতায় আমরা ধন্য। শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকবৃন্দ ও অগ্রজ ভাইবোনেরা আমাদের আজ যে প্রীতিবন্ধনে যুক্ত করলেন তার আবেদন চিরজীবন আমাদের স্মৃতির পাতায় অক্ষয় হয়ে থাকবে।

এতদিন কঠোর নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে আমাদের বিদ্যার্জন করতে হয়েছে। তারপর বিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হয়ে বৃহত্তর শিক্ষা পরিমণ্ডলে প্রবেশ করতে গিয়ে নানা উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগে আমাদের দিন কেটেছে। এই কলেজে ভর্তি হতে পারব কিনা, শেষ পর্যন্ত কোথায় ভর্তি হতে পারব তা নিয়ে আমাদের তো বটেই বাবা-মায়েরও চিন্তার শেষ ছিল না। তারপর ভর্তি হওয়ার পর আর এক চিন্তা–নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের কতটা মানিয়ে নিতে পারব? আমাদের এই দ্বিধা কেটে গেল যখন দেখলাম আমাদেরকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলেন কলেজের অগ্রজ ভাইবোনেরা ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ। আর আজ এই অনবদ্য আয়োজনের মাধ্যমে আমাদের যেভাবে কাছে টেনে নেওয়া হচ্ছে তাতে সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত উদ্বেগ কোথায় মিলিয়ে গেছে। আজ এই মহান বিদ্যাপীঠের পবিত্র অঙ্গনে সকলের সঙ্গে নিজেদেরও আমরা এখন একই পরিবারের সদস্য বলে ভাবতে পেরে খুব ভালো লাগছে। আমরা সাহস পাচ্ছি, ভরসা পাচ্ছি, উৎসাহ পাচ্ছি। আমাদের সঙ্গী হিসেবে আছেন অগ্রজপ্রতিম ভাইবোনেরা, আর আমাদের অভিভাবকতুল্য পথনির্দেশক হয়ে আছেন সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ। সহৃদয় সাহচর্য ও প্রেরণায় আপনারা যে আমাদের ভবিষ্যৎ রচনার সাহস সঞ্চয় করেছেন এ জন্যে আপনাদের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমরা এই কলেজে নতুন। কলেজ জীবনের অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। তবু এটা বুঝতে পারছি যে, জ্ঞানচর্চার এক বৃহত্তর অঙ্গনে আমরা এসে পড়েছি। বদ্ধ গণ্ডি ছেড়ে বেড়িয়ে আসতে পেরে ভালোই লাগছে। আবার এমন মুক্তি আগে পাই নি বলে ভয়ও লাগছে। আমাদের এই পথ পরিক্রমায় অগ্রজদের দৃষ্টান্ত দেখে আমরা পথ চলতে চেষ্টা করব। আমাদের বিশ্বাস, আপনাদের নির্দেশিত পথ আমাদের জ্ঞানার্জনের পথকে করবে সহজতর।

আশা করি, সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের সস্নেহ সাহচর্য ও নির্দেশনায় আমরা সত্যিকারের মানুষ হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার পথে ভালোভাবে অগ্রসর হতে পারব। দোয়া ও আশীর্বাদ করুন যেন আমরা নিজেদেরকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি।

আমাদের অগ্রজ ভাইবোনেরা এই কলেজের ঐতিহ্য রক্ষায় আমাদের ভূমিকা পালনের কথা

বলেছেন। আমাদের দৃঢ় বিশাস, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের নির্দেশনা এবং অগ্রজ ভাইবোনদের সহায়তায় আমরা সঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারব। এ প্রসঙ্গে মনে পড়েছে কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য পঙ্‌ক্তি :

তোমার পতাকা যারে দাও
তারে বহিবারে দাও শকতি।

আমরা আশা করি, আপনাদের সবার সহযোগিতা পেলে এ প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যের গৌরবময় পতাকা আমরা সম্মানের সঙ্গে বহন করতে পারব।

বর্তমানে দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অস্থিরতা ও নৈরাজ্যের শিকার। আমাদের সৌভাগ্য, আমাদের এই বিদ্যানিকেতন সেসব থেকে মুক্ত। তাই আমরা আশাবাদী, এই কলেজের নির্মল পরিবেশ আমাদের উজ্জ্বল জীবন গঠনে সহায়ক হবে। সবশেষে, আমাদের শিক্ষাসাধনা ও জীবন বিনির্মাণে আমরা সবার গঠনমূলক নির্দেশনা ও সহায়তা কামনা করি। আমাদের অজ্ঞতাজনিত কোনো ত্রুটি ঘটলে তা ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখার অনুরোধ জানাই।

আজকের এ অনুষ্ঠানে আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেওয়ার জন্যে আবারও সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আপনাদের সবার জীবন সুন্দর হোক। আমাকে নবীনদের পক্ষ থেকে কিছু কথা বলতে দেওয়ার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি। সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

বক্তা	:	অনিন্দ্য চৌধুরী
		ক্রমিক নং -০১
		একাদশ শ্রেণি
		বিজ্ঞান শাখা
		জুবিলি কলেজ, সুনামগঞ্জ
তারিখ	:	১ লা জুলাই, ২০১৯

৫. নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে অধ্যক্ষের ভাষণ।

সুহৃদ সভাপতি, নববর্ষ উৎসবে সমবেত সুধীবৃন্দ, আমাকে এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে ধন্যবাদ। আমি প্রথমেই সবাইকে বঙ্গাব্দের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই : শুভ নববর্ষ!

আজ মনে পড়ছে আমার জীবনে নববর্ষ উৎসবের নানা অনুষঙ্গ। আমাদের ছেলেবেলায় পয়লা বৈশাখ ছিল হালখাতার দিন। ব্যবসায়ীরা সেদিন সারা বছরের হিসাব-নিকাশ করে আগের বছরের পুরনো খাতা তুলে রেখে নতুন খাতা খুলতেন। মুঘল আমলে রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে হালখাতার এই প্রথা সূচিত হয়। তখন রাজস্বের হিসাব রাখা আরম্ভ হয় চান্দ্র বছর হিজরির বদলে সৌর বছর বঙ্গাব্দে এবং সে বঙ্গাব্দের সূচনা হয় বৈশাখের প্রথম দিন থেকে। বাংলা মাসের নামগুলো লক্ষ্য করলে মনে হয়, অগ্রহায়ণ থেকেই বছর শুরু হবার কথা। রাজস্বের হিসাব যে বৈশাখ থেকে রাখা হতো সেটা সত্য। আর তার ফলে হয়ত সকল ব্যবসা-বাণিজ্যে হালখাতার প্রচলন হয়ে যায়।

ছোটবেলায় অভিভাবকদের হাত ধরে বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে গেছি আর মিষ্টি খেয়েছি, কখনও কখনও সঙ্গে করে নিয়েও এসেছি। নববর্ষের দিনে মাঠে-ময়দানে মেলা বসত। মেলায় পাওয়া যেত মাটির, বেতের, বাঁশের, কাঠের, তালপাতার, শক্ত কাগজের হরেক জিনিস। নানা রকম খাবারও পাওয়া যেতে। নিজে না গেলেও কেউ না কেউ আমার জন্যে মেলা থেকে কিছু কিনে আনতেন। পুতুলের শ্রেণীতে তুলো দিয়ে করা শ্মশ্রুমণ্ডিত ও নারকেলের হুকো হাতে এক বৃদ্ধ পাওয়া যেত–সর্বক্ষণ তার মাথাটা নড়ত। ওতে খুব আমোদ পেতাম। মোট কাগজের মুখোশের আকর্ষণ অল্পেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। শিকে বা নকশা করা সরাও কেউ কেউ নিয়ে আসতেন উপহারস্বরূপ, কিন্তু সবই শিকেয় তুলে রাখা হতো অর্থাৎ ঝোলানো বা টাঙানো হতো না। খাবারের মধ্যে কদমা ছিল আমার খুব পছন্দ, বড় বাতাসাও। হালখাতার উৎসব সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই চালু ছিল। তবে বেশি ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। আমি খাঁটি ইংরেজ খ্রিষ্টানের প্রতিষ্ঠানে এবং মধ্যবিত্ত মুসলমানের দোকানে হালখাতা উৎসব হতে দেখেছি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে অনেকে পয়লা জানুয়ারি থেকে হিসাব রাখতেন। সরকারি অর্থ বছর শুরু হতো এপ্রিলে। এদিকে মহররম যদিও হিজরির প্রথম মাস, তবু তা কারবালার শোক স্মৃতি নিয়ে আসত। নিউইয়ার্স ডে করার মতো সামর্থ্য বেশি মানুষের ছিল না।

এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির পরে ক্রমবর্ধমান বাঙালি চেতনার জাগরণে। ঢাকার মাহবুব আলী ইনস্টিটিউটে বা কার্জন হলে সন্ধ্যাবেলায় গীতবাদ্যের অনুষ্ঠান হতো, কিন্তু তার জন্য সকাল থেকে উদ্‌যোগ নেওয়ার কোনো প্রয়োজন হতো না। তারপর বলধা গার্ডেনে কোনো এক পয়লা বৈশাখে খই মুড়ি খেয়ে গান গেয়ে নববর্ষের আবাহন হলো মুষ্টিমেয়ে মানুষের উপস্থিতিতে। তখন এ নিয়ে অনেকে হাসাহাসি করলেও সরকারের ভ্রুকুঞ্চিত হয়েছিল।

বাংলা নববর্ষের উৎসব পাকিস্তান সরকার পছন্দ করছে না–এ কথা জানাজানি হওয়ার পরে সরকারের সাংস্কৃতিক নীতির প্রতিবাদ করতে এবং নিজেদের বাঙালি সত্তা জাহির করতে চারিদিকে পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপনের ধুম পড়ে গেল। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান রায়ানটের। রমনার বটমূলে নাগরিক মধ্যবিত্তের এই মিলনমেলা বাঙালিত্ব আর অসাম্প্রদায়িকতার সম্মিলনে পরিণত হয়। তারপর দেশব্যাপী নববর্ষের অনুষ্ঠান ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর এই প্রতিবাদের আর আবশ্যকতা রইল না। সরকার নিজেই নববর্ষ পালনে উদ্যোগী হলো। সুতরাং যা ছিল রাজনৈতিক প্রতিবাদের বিষয়বস্তু তা হয়ে উঠলো শুদ্ধ আনন্দের অনুষ্ঠান, মহামিলনের ক্ষেত্র। ক্রমেই এই অনুষ্ঠান বৃহৎ ও বিচিত্র হয়ে উঠেছে, ব্যাপক হয়েছে তো বটেই। এ কথা সত্য যে, বঙ্গাব্দ আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি; কেননা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে বাংলা তারিখের যোগ এখনও স্থাপিত হয়নি। তবু নাগরিক মধ্যবিত্ত 'দারুণ অগ্নিবাণে' তৃষিত হৃদয়ে 'দীর্ঘ দগ্ধ দিন' পার করে দিয়ে যে আনন্দ ও তৃপ্তি পান তা নিখাদ।

মন্দ ভাগ্য হেতু আমাদের বাঙালিত্ব এখনও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। তাই নববর্ষ উৎসব নিয়ে আবার প্রশ্ন উঠলে বিস্ময়ের কিছু থাকে না। তবে এ প্রবীণ বয়সেও আমার বিশ্বাস, বাঙালি

নিজস্ব সংস্কৃতি ধারণ করে এগিয়ে যাবেই, প্রতিহত করবে নানা প্রতিবন্ধকতা। তাই কামনা করছি গান দিয়ে আরম্ভ হোক দিনটা, চলুক কবিতাপাঠ, বর্ণবহুল মিছিল দেখে আনন্দ পাক শিশু-কিশোরেরা। গ্রামের মেলায় যেমন, তেমনি শহরের মেলায় ভিড় করুক নানা রকম লোক। তুচ্ছ বিষয় মনকে প্রফুল্ল করুক। নববর্ষ সার্থক হোক। সবার জীবনে আসুক মঙ্গল ও সাফল্য।

বক্তা	:	মো. সুরুজ্জামান অধ্যক্ষ সেরপুর সরকারি কলেজ, জেলা সেরপুর
লক্ষ্য	:	ছাত্রছাত্রী ও সুধীজন
তারিখ	:	১৪ই এপ্রিল, ২০২০

৬. 'যৌতুক একটি সামাজিক অভিশাপ' বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখার জন্য একটি লিখিত ব্যক্তব্য প্রস্তুত কর।

'যৌতুক একটি সামাজিক অভিশাপ' শীর্ষক আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি, মাননীয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও সুপ্রিয় সুধীবৃন্দ–আপনারা সবাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

নারী-পুরুষ মিশেই এ পৃথিবীর অসাধ্য কাজ সাধন করেছে। অথচ জগতের মাঝে তাদের অবদান কেউ স্বীকার করতে চায় না। বরং তাদের উপর চলে অমানবিক নির্যাতন। কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন:

> বিশ্বের যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
> অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

অতএব, নারীপুরুষের সমান অংশগ্রহণ সর্বত্র প্রয়োজন।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ,
সভ্যতার চরম উন্নতির যুগে বসবাস করেও আমরা এই অমর বাণী ভুলে গেছি এবং বর্বরতাকে হার মানিয়েছি। আমাদের সমাজে নারী নির্যাতনের মাত্রা এতোই বেড়ে চলেছে যে, আজকের তার বিরুদ্ধে সেমিনার করতে হচ্ছে। এই নির্যাতনের একটি মাধ্যম যৌতুক। যৌতুক প্রথার ভয়াবহতা আমাদের সমাজকে ক্ষেত্রবিশেষে পাশবিক করে তুলেছে।

প্রিয় সাথীরা,
আমরা যদি ভাবি, একটু চিন্তা করি–আমরা সকলেই কোনো-না-কোনো মায়ের সন্তান, কারো ভাই, কারো বাবা, আর অন্যদিকে তারা আমাদের কারো না কারো খালা, ফুফু, চাচি, বোন, মা ইত্যাদি। এখন চোখ বন্ধ করে একটু ভাবুন যে, আপনার মাকে কেউ মারছে, বোনকে কেউ নিয়ে যাচ্ছে ধরে, অথবা তার স্বামী তাকে পেটাচ্ছে, এবং তা যৌতুকের জন্য। যৌতুক আসলে পুরুষকে মানসিকভাবে দারিদ্র্য করে দেয়। সে গরিব সেই শুধু যৌতুক চায় না, ধনীরাও চায়। এই মানসিক দারিদ্র্য রোগবিশেষ। এই রোগাক্রান্ত হয়ে আমরা পুরুষজাতি কেন নারী নির্যাতন

করবো? কেন আমরা নারীদেরকে সম্মান করতে পারবো না? আজ নারীর অধিকারকে স্বীকার করতে হবে। তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে হবে।

উপস্থিত সুধীমণ্ডলী,
আইন আছে; তবুও হীন অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে পুরুষরা। কারণ আইনের প্রয়োগ নেই। তবে আইনের চাইতে মানসিকভাবে যৌতুককে প্রত্যাখ্যান করা শিখতে হবে। এ ব্যাপারে কতিপয় সুপার উত্থাপন করে বক্তব্যের ইতি টানবো :

ক. বাল্যবিবাহ রোধ
খ. নারীশিক্ষার প্রসার
গ. স্কুল-কলেজে যৌতুকবিরোধী রচনা পাঠ্যকরণ
ঘ. নারীর শক্তি ও সম্ভাবনাকে শ্রদ্ধা করতে শেখানো।

ধন্যবাদ।

বক্তা	:	সুপ্রিয় চাকমা অ্যাডভোকেট, জজ কোর্ট, জেলা বান্দরবান
লক্ষ্য	:	নির্ধারিত অংশগ্রহণকারী
তারিখ	:	২রা ডিসেম্বর, ২০১৯

প্রতিবেদন বা রিপোর্ট

'প্রতিবেদন' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'বিবরণী'। কিন্তু 'বিবরণী' বললে 'প্রতিবেদন' কথাটির মর্মার্থ বোঝায় না। কারণ, 'প্রতিবেদন' ইতোমধ্যে বিশেষ প্রতীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে, সেখানে সংযুক্ত বিশেষ শৃঙ্খলা। তাই বলা যায়, 'প্রতিবেদন হলো কোনো অনুষ্ঠান, ঘটমান ঘটনা কিংবা নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা পক্ষ সমীপে যথানিয়মে গদ্যে লিখিত বিবরণ।

প্রতিবেদনের ইংরেজি প্রতিশব্দ Report। তবে ইংরেজি রিপোর্টের অর্থের চেয়ে প্রতিবেদন আরো ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। রিপোর্ট অর্থ কোনো ঘটনার হুবহু বর্ণনা। কিন্তু প্রতিবেদনের দ্বারা কোনো ঘটনার অনুসন্ধানী পর্যবেক্ষণমূলক বিবৃতিকে বোঝায়। সুতরাং প্রতিবেদন বলতে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ভিত্তিতে সে বিষয়ের ওপর কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতব্য প্রস্তুতকৃত বিবরণীকে বোঝায়। তথ্য, ঘটনা, সমস্যা সম্পর্কে অবহিতকরণ ও সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত প্রদানও প্রতিবেদনের লক্ষ্য।

প্রতিবেদন রচনাকারীকে বলা হয় প্রতিবেদক। আর প্রতিবেদক যা রচনা করেন তাই প্রতিবেদন। প্রতিবেদন রচনাকারীকে বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত থাকতে হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিবেদকের যথাযথ জ্ঞান না থাকলে প্রতিবেদনের সীমাবদ্ধতা রয়ে যায়।

অধ্যাপক মাইক হ্যাচের মতে, 'প্রতিবেদন হলো একটি সুসংগঠিত তথ্যগত বিবৃতি যা কোনো বক্তব্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ সঠিক বর্ণনাবিশেষ। একে যথেষ্ট সতর্কতা পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা, গবেষণা ও বিচার বিশ্লেষণের পর তৈরি করা হয়।'

বিশেষ দ্রষ্টব্য: দাপ্তরিক বা অফিসিয়াল পত্রে 'জনাব' ব্যবহার করা অনুচিত। জনাব হলো ইংরেজি 'গৎ, পরিভাষা। লেখা উচিত মহোদয়। কারণ, মহোদয় হলো 'Sir'-এর পরিভাষা। মহোদয়-এর স্ত্রীবাচক মহোদয় ভুল নয়। তবে সাম্প্রতিক বিবেচনায় মহোদয়া না লিখে মহোদয় লেখাই শ্রেয়।

প্রতিবেদনের শ্রেণিকরণ

প্রতিবেদন তৈরি হয় নানা ঘটনা, দুর্ঘটনা, অনুষ্ঠান ইত্যাদি ওপর নির্ভর করে। প্রতিবেদক (Report) বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন তৈরি করেন। দুর্ঘটনার তদন্ত করে প্রতিবেদন হতে পারে। অফিসের অনিয়ম নিয়ে প্রতিবেদন হতে পারে। কোনো সভা, আলোচনা, অনুষ্ঠান শেষ তার ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন লেখা হতে পারে। সাধারণত সংবাদপত্রে প্রতিবেদন ছাপা হয়। সেখানে যে ব্যক্তি নিয়মিত প্রতিবেদন তৈরি করেন তাকে নিয়মিত প্রতিবেদক বলা হয়। আবার কোনো ঘটনা উপলক্ষ্যে হঠাৎ করেই কেউ কোনো প্রতিবেদন তৈরি করলে তাকে সাময়িক প্রতিবেদক বলা হয়। কোনো অফিস, কোম্পানি বা যে-কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব অফিসিয়াল প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন।

সার্বিক ভাবে বিবেচনা করে প্রতিবেদনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়:

ক. সংবাদ প্রতিবেদন
খ. ক্ষেত্রসমীক্ষা বা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন
গ. দাপ্তরিক বা অফিসিয়াল প্রতিবেদন
ঘ. সাধারণ প্রতিবেদণ

সংবাদ প্রতিবেদন : সংবাদ সংস্থা বা সংবাদপত্রের নিজস্ব প্রতিবেদক এ ধরনের প্রতিবেদন তৈরি করেন এবং তা তিনি সংবাদপত্রে পাঠান।

ক্ষেত্রসমীক্ষা বা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন : এই ধরনের প্রতিবেদন সাধারণত সমস্যা ও উন্নয়নমূলক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমাজতাত্ত্বিক অর্থনৈতিক গবেষণার প্রতিবেদনগুলো এই শ্রেণিভুক্ত। এই ধরনের প্রতিবেদনে পরিসংখ্যানমূলক বা গাণিতিক তথ্য পরিবেশন করা হয়।

দাপ্তরিক বা অফিসিয়াল প্রতিবেদন : সরকারি, বেসরকারি, আধা সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের প্রতিবেদন তৈরি করে। হিসাব-নিকাশ, উন্নয়ন, দুর্নীতি, বেতন কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে কমিটি গঠিত হয়, সেই কমিটি তাদের প্রতিবেদন তৈরি করে। এক্ষেত্রে অবশ্য সময় বেধে দেওয়া হয়। কমিটির সদস্য সংখ্যা ও নাম ঘোষণা করা হয়। হত্যা, দুর্ঘটনা নিয়ে পুলিশ যে প্রতিবেদন তৈরি করে, সেগুলো তদন্ত প্রতিবেদন বলা হলেও তা আসলে অফিসিয়াল প্রতিবেদন।

সাধারণ প্রতিবেদন : সাধারণ প্রতিবেদনের সীমানা অনেক বিস্তৃত। ব্যবসা-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বাইরে নানাভাবে প্রতিবেদন তৈরি হয়, সেগুলো সাধারণ প্রতিবেদন। স্কুলে বা কলেজের অনুষ্ঠানে উদ্‌যাপন নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি হয়, এগুলো সাধারণ প্রতিবেদন।

প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য

প্রতিবেদনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো কোনো বিষয় সম্যকভাবে বা সবার গোচরভুক্ত করা। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেশের জনগণকে অবহিত এবং রেকর্ড রাখাও এর লক্ষ্য। প্রতিবেদন লেখা হলে বা সংবাদপত্রে ছাপা হলে যারা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন বা বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নন, তারাও ঘটনা ও বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন। এক ধরনের নাগরিক সচেতনতা এর মাধ্যমে তৈরি হয়। প্রতিবেদনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো ঘটনার বা সত্য উদঘাটন বা সত্যের কাছাকাছি পৌঁছে তা লিপিবদ্ধ করা।

প্রতিবেদনের গঠন, লেখন ও উপস্থাপনশৈলী

সব ধরনের প্রতিবেদন একই গঠনশৈলী মান্য করে না। তবে এর কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে। নিচে বিভিন্ন প্রকার প্রতিবেদনের গঠন, লেখন ও উপস্থানশৈলী উল্লেখ করা হলো:

ক. সংবাদ প্রতিবেদন

১. প্রতিবেদন আকর্ষণীয় একটি শিরোনাম (Head Line/Heading) প্রয়োজন। কিন্তু তা হবে সংহত ও আকর্ষণীয়। 'বাংলাদেশ বিমান ক্রিকেট দলকে আবাহনী ক্রীড়াচক্র পরাজিত করেছে'–এই শিরোনামে বিষয়বস্তু ও অর্থ স্পষ্ট। কিন্তু এই শিরোনাম আকর্ষণীয় নয়। যদি লেখা হয়: 'বিমানকে ভূপাতিত করলো আবাহনী' তাহলে সেখানে যেমন অর্থ অক্ষুণ্ন থাকে, তেমনি তা আকর্ষণীয়ও হয়। কারণ ভাবতে হবে, এই প্রতিবেদন ছাপা হবে 'খেলার পাতা'য়। এখানে 'বিমান' অর্থ 'বিমান ক্রিকেট দল'ই বোঝাবে। শিরোনাম লিখতে হবে সাধারণ হাতের লেখা থেকে প্রায় দ্বিগুণ বড় করে।

২. প্রয়োজন হলে প্রাসঙ্গিক উপ-শিরোনাম (Sub-Head Line/Heading) থাকতে পারে। উপ-শিরোনামে প্রতিবেদনের বিষয়ের সার অংশ অসম্পূর্ণ বাক্যে লেখা হয়।

৩. প্রতিবেদনের সূচনাতে 'নিজস্ব প্রতিবেদক' বা 'নিজস্ব প্রতিনিধি' কথা লিখতে হবে। প্রতিবেদনের তারিখ দেওয়া যেতে পারে।

৪. প্রতিবেদকের পরিচয় প্রদান প্রতিবেদনের নিচে করতে হবে। ডাকযোগে প্রেরিত প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে প্রতিবেদনের নিচে প্রতিবেদকের রাবার স্টাম্প লাগিয়ে স্বাক্ষর ও তারিখ প্রদান করলেই চলে। বৈদ্যুতিন ডাক বা বৈ-ডাক বা ই-মেইলে পাঠানো প্রতিবেদনের নিচে প্রতিবেদকের স্বাক্ষর (স্ক্যান করে) না দিলেও চলে। কারণ প্রতিবেদক নিজের ই-মেইল আইডি থেকেই প্রতিবেদন প্রেরণ করে থাকে। তবে এক্ষেত্রে প্রতিবেদক নিজের নাম ও তারিখ প্রদান করবেন।

খ. ক্ষেত্রসমীক্ষা বা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

১) আয়তনে বড় হয়। কারণ বিস্তৃত বিষয় এর পরিধি। যেমন: সুন্দরবনের পরিবেশ বিপর্যয় বা সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ।

২) একটি শিরোনাম মূলে থাকবে। তবে প্রতিবেদনের মধ্যে একাধিক উপ-শিরোনাম থাকতে হবে।

৩) পরিসংখ্যান ব্যবহারের জন্য ছক তৈরি করা যেতে পারে।

৪) স্থানীয়দের বা বিশেষজ্ঞদের মতামত সংযুক্ত হতে পারে।

৫) প্রতিবেদকের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ অবশ্যই থাকতে হবে।

৬) এ ধরনের প্রতিবেদন পৃথক পুস্তিকাকারে বাঁধাই সমেত উপস্থাপন করতে হয় বিধায় কভার পৃষ্ঠায় প্রতিবেদনের শিরোনাম, প্রতিবেদকের নাম-ঠিকানা, উপস্থাপনা-প্রতিষ্ঠানের নাম-ঠিকানা এবং উপস্থাপনের মাস ও বছর (নির্দিষ্ট তারিখের, প্রয়োজন নেই) উল্লেখ করতে হয়। প্রতিবেদকের যদি কোনো নির্দেশক থাকেন, এই পৃষ্ঠায় তাঁরও নাম থাকবে।

৭) মূল প্রতিবেদনের পূর্বে নির্দেশক (যদি থাকেন) এবং প্রতিবেদকের সংক্ষিপ্ত 'পূর্বকথা' সংযুক্ত হতে পারে।

গ. দাপ্তরিক বা অফিসিয়াল প্রতিবেদন

১) যেহেতু এ ধরনের প্রতিবেদন সাধারণত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা নিয়োগদানকারী দ্বারা আদিষ্ট হয়ে লিখিত হয় সেহেতু এ প্রতিবেদনের ওপর একটি ছোট উপস্থাপনপত্র সংযুক্ত করতে হবে। এই পত্রে বরাবর, স্মারকসূত্র, বিষয় লিখতে হবে। পত্রের শেষে থাকবে প্রতিবেদক উপস্থাপকের নাম ও পরিচয়।

২) মূল প্রতিবেদনের একটি শিরোনাম থাকবে। তবে তা একটু বড় লিপি বা হস্তাক্ষরে উপস্থাপিত হবে।

৩) মূল প্রতিবেদনের অভ্যন্তরে কিছু পয়েন্ট উপস্থাপিত হতে পারে। তার উপ-শিরোনামও থাকতে পারে।

৪) প্রয়োজন হলে সাক্ষীর জবানবন্দিও সংযুক্ত হতে পারে।

৫) সুপারিশ সংযুক্ত করতে হবে।

৬) প্রতিবেদনের নিচে প্রতিবেদকের অনুস্বাক্ষর বা কমিটি প্রধানের অনুস্বাক্ষর থাকবে।

ঘ. সাধারণ প্রতিবেদন

১) এটি যেহেতু অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবেদন সেহেত, এর গঠনগত বাধ্যবাধকতা তেমন নেই। তবে শিরোনাম অবশ্যই থাকবে।

২) আয়তন বা অনুচ্ছেদের কোনো বেঁধে দেওয়া সীমা নেই।

৩) সংবাদপত্রে প্রকাশ; জেলা প্রশাসক বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ ইত্যাদি জন্য হলে একটি উপস্থাপনপত্র সংযুক্ত করতে হবে। সেখানে স্মারকসূত্রের প্রয়োজন নেই। বিষয় উল্লেখ করা যেতেপারে। প্রতিবেদকের নাম ও পরিচয় স্পষ্ট করে সে পত্রে জানাতে হবে।

প্রতিবেদন লেখার কৌশল

একটি ভালো প্রতিবেদন রচনার জন্য প্রতিবেদক নিম্নলিখিত কৌশল অবলম্বন করতে পারেন:

১) প্রতিবেদন অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ, তথ্যবহুল ও স্পষ্ট হতে হবে।

২) প্রতিবেদক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠ পর্যায়ে কাজ করবেন।

৩) প্রতিবেদক একাধিক সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সত্য বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পরিবেশন করবেন।

৪) কোনো সমস্যার দৃশ্যপট বা চিত্র ভিত্তিক অথবা স্থিরচিত্র ক্যামেরার সাহায্যে গ্রহণ ও ব্যবহার করবেন।

৫) প্রতিবেদককে প্রত্যক্ষদর্শী হতে হবে।

৬) এছাড়াও তথ্য বা উপাত্ত বর্ণনামূলক বা সাংকেতিক উভয় প্রকার হতে পারে। তবে সাধারণত বর্ণনামূলক প্রতিবেদনের চেয়ে সাংকেতিক বা গাণিতিক পদ্ধতিতে তথ্য উপস্থাপন বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে প্রতিবেদক সংখ্যা সারণী বা পাইচার্ট ইত্যাদি পদ্ধতি বা কৌশল অবলম্বন করতে পারেন।

৭) প্রতিবেদক সেকেন্ডারি তথ্য যত কম গ্রহণ করবেন, প্রতিবেদনের মান ততো ভালো বা বস্তুনিষ্ঠ হবে। এজন্য মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কোনো বিকল্প নেই।

৮. প্রতিবেদনে সিদ্ধান্তে উপনীতে হওয়া এবং উত্তরণের জন্য প্রতিবেদকের সুচিন্তিত সুপারিশমালা উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

প্রতিবেদনের অংশ

একটি আদর্শ প্রতিবেদনের তিনটি অংশ থাকে। যেমন–

ক. প্রারম্ভিক অংশ
খ. মূল অংশ
গ. পরিশিষ্ট অংশ

প্রারম্ভিক বা সূচনা অংশে থাকে প্রতিবেদনের বিষয় সর্ম্পকে ভূমিকা, সূচিপত্র ও আলোচনার সংক্ষিপ্ত পূর্বাভাস। অপরদিকে, প্রতিবেদনের মূল অংশে বা প্রধান অংশে থাকে বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনাসহ সুপারিশ ও উপসংহারমূলক বিবৃতি। পরিশিষ্ট অংশ বা শেষ অংশে থাকে তথ্যসূত্র, গ্রন্থতালিকা, বা তথ্য নির্দেশ।

প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্য

ক. **আগে চাই পরিকল্পনা :** প্রতিবেদন তৈরির আগে প্রতিবেদককে অবশ্যই ভাবতে হবে যে, তিনি কীভাবে প্রতিবেদন লিখবেন। মূল অংশে কী কী তথ্য থাকবে, কোনটার পর কোনটা হবে, দ্রুত ভেবে নিতে হবে।

খ. **সংহত :** প্রতিবেদনে অপ্রয়োজনীয় কথা লেখা উচিত নয়। অর্থাৎ প্রতিবেদন হবে সংহত।

গ. **নিরপেক্ষতা বজায় :** প্রতিবেদন লেখার আগে কারো প্রতি বা কোনো গোষ্ঠীর প্রতি পূর্বনির্ধারিত কোনো ধারণা বা সিদ্ধান্ত যেন না থাকে। নিরপেক্ষতা বাজায় রাখতে হবে। প্রতিবেদককে থাকতে হবে নৈর্ব্যক্তিক ও আবেগমুক্ত।

মনে রাখা দরকার, প্রতিবেদক কোনো নীতিবিদও নন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যও নন, বিচারকও নন। তার কাজ হচ্ছে ব্যক্তি-নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সংবাদ পরিবেশন করা।

ঘ. **পর্যাপ্ত তথ্য :** প্রতিবেদন যেন পর্যাপ্ত তথ্যসমৃদ্ধ হয়, সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। প্রতিবেদক কোথায় গিয়ে কী কী দেখলেন, কী কী শুনলেন, কী কী বুঝলেন, কেন এটি হলো, এ সম্পর্কে তার মূল্যায়ন কী, সুপারিশই বা কী কী–তা সব লিখতে হবে।

ঙ. **বাহুল্য বর্জন :** তথ্য দিয়ে গিয়ে প্রতিবদেন যাতে তথ্যভারে জর্জরিত না হয়ে পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অপ্রয়োজনীয়, অপ্রাসঙ্গিক ও ব্যক্তিগত কথা বাদ দিতে হবে।

চ. **ভাষা হবে সহজ, সরল অথচ শিল্পগুণসমৃদ্ধ :** প্রতিবেদনের ভাষা হবে সহজবোধ্য এবং সরল ও স্পষ্ট। ভাষা যেন দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট, স্ববিরোধী, বহুদিক–জ্ঞাপক না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। বানান, বিরামচিহ্ন ইত্যাদি যেন ব্যাকরণসম্মত হয়। যে কেউ পড়ে সহজেই তা বুঝতে পারে। দুর্বোধ্য বা দ্ব্যর্থবোধক শব্দ প্রতিবেদনে ব্যবহার করা উচিত নয়।

ছ. **নতুন প্রসঙ্গে নতুন পরিচ্ছেদ :** ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অনুচ্ছেদে সাজাতে হবে। এক অনুচ্ছেদে সবকিছু না সাজানোই ভালো। প্রতিবেকের পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশ একাধিক হওয়াটাই স্বাভাবিক।

জ. **উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ :** প্রতিবেদন তৈরি করার সময় প্রতিবেদক তার লক্ষ্যে কখনো যেন ভুলে না যান। অর্থাৎ অসঙ্গতিপূর্ণ প্রতিবেদন কখনোই কাম্য নয়।

প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা

প্রতিবেদন একটি স্থায়ী ও প্রামাণ্য দলিল। এজন্য প্রশাসনিক কার্যক্রম, ব্যবসায়-বাণিজ্য, আইন-আদালত ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিবেদনের বিশেষ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণকেই আগে প্রতিবেদন বলা হতো, কিন্তু আধুনিককালের নানা ধরনের জটিলতার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদনের গুরুত্ব বেড়েছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও এর উপযোগিতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেদন থেকে খুঁটিনাটি তথ্য অবগত হওয়া যায় এবং তার প্রেক্ষিতে কোনো বিষয় সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। কোনো সংগঠনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবেদন অত্যন্ত উপকারী। এর মাধ্যমে কোনো বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ, সংগঠন, নিদের্শনা, ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ, নীতি নির্ধারণ, ফলাফল নিরূপণ, সমন্বয় সাধন ইত্যাদি সহজ হয়। বলিষ্ঠ যোগাযোগ মাধ্যমে হিসেবেও প্রতিবেদন অনন্য ভূমিকা রাখে। বিরোধপূর্ণ এবং জটিল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পতিবেদন অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখে।

নমুনা : সংবাদ প্রতিবেদন

১. শহরে চাঁদাবাজি সংক্রান্ত সংবাদ প্রতিবেদন।

কামালপুরে চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য

নিজস্ব প্রতিবেদক : ৭ জুলাই , ২০১৪

চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীদের হাতে কামালপুরবাসী জিম্মি হয়ে পড়েছে। এদের দাপটে মানুষের প্রতিটি প্রহর কাটে আতঙ্কের মধ্যে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও চাঁদাবাজরা সাম্প্রতিক বাসাবাড়িতে গিয়েও হানা দিচ্ছে। গতকাল সকাল দশটা থেকে এগারটা পর্যন্ত ব্যবসায়ীরা চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশ করে কিছু সময় দোকানপাট বন্ধ রাখে। ভুক্তভোগীদের সূত্রে জানা গেছে, শহর জুড়ে গড়ে উঠেছে চাঁদাবাজদের বিশাল চক্র। নগরের পাড়া-মহল্লার বখাটে তরুণরা জড়িয়ে পড়েছে এদের সঙ্গে। এদের চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে নগরবসী অতিষ্ঠ। প্রাণহারানো আশঙ্কায় চাঁদাবাজদের দাবি মেটাতে মানুষ হিমশিম খাচ্ছে। ব্যবসায়ীরা এদের প্রধান টার্গেট। সন্ত্রাসীরা চাঁদা চেয়ে না পাওয়ায় অগ্রদূত জয়েলার্স নামের একটি দোকানে বোমা নিক্ষেপ করে।

দীর্ঘদিন ধরে চাঁদাবাজদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ব্যবসায়ী নেতারা গতকাল রাতে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক ও উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। সভায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি এবং ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা বিধানের আশ্বাস দেওয়া হয়।

চাঁদাবাজদের শিকার এমন কয়েজন এ প্রতিনিধিকে জানান, চাঁদাবাজরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বাড়িতে গিয়ে অথবা টেলিফোনের মাধ্যমে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করছে। চাহিদা মোতাবেক টাকা দিতে ব্যর্থ হলে তারা জীবননাশের হুমকি দিচ্ছে। এক ব্যবসায়ী তার জীবন রক্ষার জন্য চাঁদাবাজদের গোপনে অর্থ প্রদান করলেও প্রকাশ্যে তা স্বীকার করছে না। চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তথা প্রভাবশালী মহলের ছাত্রছায়ায় থেকে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় এদের দাপট এতই বেড়ে গেছে যে মানুষ

ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। নিরাপত্তার কারণে সাধারণ ভুক্তভোগীরা পুলিশের কাছে মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছেন না।

কয়েক মাস আগে শহরের বেশ ক'জন ব্যবসায়ীকে এরা চিঠি দিয়ে চাঁদা দাবি করে বলে স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়েছিল। ভুক্তভোগীরা চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসী দমনে পুলিশের ভূমিকা সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলেছেন। এই মহলের মতে, সরকার, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও পুলিশ শক্ত অবস্থান নিলে চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস দমন করা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

২. তোমার এলাকার 'বন্যা পরিস্থিতি'র ওপর একটি প্রতিবেদন।

সারাদেশের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি চরম দুর্ভোগে অসহায় মানুষ। বেড়েছে পানিবাহিত রোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক : ২০ জুলাই, ২০১৪

অতিবর্ষণ না হলে বা উজান থেকে ঢল না নামলে সারা দেশের সামগ্রিক বন্যা পরিস্থিতি দু'তিনটি জেলা বাদে আগামীকাল থেকে উন্নতির দিকে যেতে পারে। শনিবার ঢাকা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং সিলেট বাদে আর সব জেলার বন্যা পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি ঘটে। ভরা পূর্ণিমার প্রভাব কেটে যাওয়ার ফলে বন্যার পানি আজ দ্রুত বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত হবে বলে একজন বন্যা বিশেষজ্ঞ জানান। শুক্র ও শনিবার দেশে বর্ষণের পরিমাণও তেমন ছিল না বলে একজন আবহাওয়াবিদ জানান।

বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পরও বেশ কিছু এলাকায় জলাবদ্ধতার ফলে পানি আটকা থাকবে বলে বন্যা বিশেষজ্ঞ জানান। এসব স্থান থেকে পানি নামতে সময় নেবে।

সিলেটের বন্যা পরিস্থিতির সামান্য অবনতির কারণ প্রসঙ্গে বন্যা সতর্কীকরণ কেন্দ্র থেকে জানা যায়, উজান থেকে কুশিয়ারায় পানি ২১ মে. মি. বেড়ে বিপদসীমার ৬১ সে.মি.ওপর দিয়ে বইছে। আজও সুরমা ও কুশিয়ার পানি বাড়তে পারে।

আরিচা ছাড়া যমুনা-ব্রহ্মপুত্রের পানি আর কোথাও বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে না। তবে সিরাজগঞ্জের উজানে ব্রহ্মপুত্রের পানির স্তর কমা থেকে গিয়ে স্থির রয়েছে। ভৈরববাজার থেকে ভাটির দিকে মেঘনার পানির স্তরও অপরিবর্তিত থাকবে।

ঢাকা-মাওয়া-খুলনা ও ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়ক যোগাযোগ এখনও বিচ্ছিন্ন।

মুন্সীগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হলেও জেলা শহরের ৮৭% এখনও পানির নিচে রয়েছে বলে গতকাল নিজস্ব সংবাদদাতা জানান। স্বাস্থ্যমন্ত্রী গজারিয়ার বিভিন্ন দুর্গত অঞ্চলে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যানবাহন চলাচল অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তবে নতুন করে গোমতীর পানি বাড়ায় দাউদকান্দির বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা অবনতি দেখা দিয়েছে বলে সংবাদদাতা জানান।

সরকারি তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়েছে, শনিবার আরও ১৮০ ব্যক্তির ডায়রিয়াসহ পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এ নিয়ে সারাদেশে ডায়রিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৫৫ হাজার ৮৭২ জনে।

নমুনা : ক্ষেত্রসমীক্ষা বা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

১. কলা ও আনারসের ওপর রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও হরমোন প্রয়োগ সম্পর্কে প্রতিবেদন।

শেরপুরে ব্যাপক কলা ও আনারস চাষ : রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও হরমোনের যথেচ্ছ ব্যবহার
শুভ ঘোষ
(অনুসন্ধান দল প্রধান)
পাতাবাহার প্রকৃতি গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে পরিচালিত অনুসন্ধান
মার্চ, ২০১৪

শেরপুর জেলার গারো পাহাড় এলাকায় দোখলা বাজারে আজ প্রায় ১৩ বছর ধরে কীটনাশক ও সারের ব্যবসা করেন মোতালেব হোসেন। তার দোকান 'মোতালেব ট্রেডার্স' এ বাজারের প্রথম সার ও কীটনাশক দোকান বলে দাবি করেন মোতালেব। এখন তিনি কীটনাশক কোম্পানি সিনজেনটার পরিবেশক। এ বাজারে কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের দোকানের সংখ্যা এখন সাতটি। বেশির ভাগ দোকান গড়ে উঠেছে গত ৬-৭ বছরে আগে। "সাত-আট বছর ধইর‍্যা কলা চাষ বাড়তাছে। আনারস তো আছেই। ফসল বড় করোনের লাইগ্যা, পাকানোর লাইগ্যা হরমোন লাগে। তাছাড়া অন্যান্য কীটনাশক তো আছেই। কলা আনারসের আবাদ যত বাড়ছে দোকানও বাড়ছে সে মতো," দোখলা বাজারে সার-কীটনাশকের দোকান বেড়ে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করলেন মোতালেব। জানালেন, প্রতিবছর তিনি প্রায় ১২ লাখ টাকার মালামাল বিক্রি করেন। এর মধ্যে হরমোন এবং ছত্রাকনাশক (টিল্ট নামে পরিচিত, কলার জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়) বিক্রি প্রায় ছয় লাখ টাকার। ঝিনাইগাতি উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ অফিস সূত্রে জানা যায়, ২০১১-১২ অর্থবছরের এ উপজেলায় বোরোর চাষ হয় ১২ হাজার ৫শ হেক্টর জমিতে। আর কলা ও আনারস মিলিয়ে চাষ হয় ১০ হাজার ৮শ হেক্টর জমিতে। আনারস ৭ হাজার ১শ হেক্টর এবং কলা ৩ হাজার ৭শ হেক্টরে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ড. হযরত আলী জানান, ধানের পরে ঝিনাইগাতির দ্বিতীয় ফসল (অথবা ফল) হলো আনারস এবং তৃতীয় স্থানে আছে কলা।

এই দুই ফসল চাষের জন্য ব্যবহৃত কীটনাশক বা হরমোনের বাজার যে রমরমা তা বোঝা গিয়েছিল মোতালেব হোসেনের কথাতেই। উপজেলা কৃষি অফিসের তথ্য, মধুপুরে কীটনাশকের ডিলারের সংখ্যা ১৭৮। তবে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের দেওয়া হিসাবে এ সংখ্যা পাইকারী ও খুচরা মিলিয়ে ২৪৪। টাঙ্গাইল জেলায় এই সংখ্যা সর্বোচ্চ। আনারস-কলার কল্যাণে (?) কীটনাশক ডিলারের সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে আছে ঘাটাইল উপজেলা, ডিলার সংখ্যা ১৭১।

শেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের সূত্রে জানা যায়, ২০১০-১১ সালে জেলার মোট ৭৮০৫ হেক্টর জমিতে আনারস আবাদ হয়। এর মধ্যে ঝিনাইগাতিতেই হয় ৬,৮০০ হেক্টর। এ সময়ে উৎপাদিত কলার পরিমাণ ছিল ২ লাখ ২৩ হাজার ৩২৫ মেট্রিক টন। ঝিনাইগাতিতেই উৎপাদিত হয় ১ লাখ ৯৭ হাজার ২০০ মেট্রিক টন আনারস।

খামারবাড়ি'র খাদ্যশস্য ইউ সূত্রে জানা যায়, ২০১০-১১ সালে দেশের মোট ৭৮,০৫৪.৫ হেক্টর জমিতে কলার চাষ হয়। উৎপাদিত হয় ৩,৫১,০৮২ মেট্রিক টন কলা। এ সময়ে শেরপুরে ৭,৩২৩ হেক্টর জমিতে উৎপাদিত কলার পরিমাণ ছিল ৯০,২৭৬ মেট্রিক টন। অর্থাৎ দেশের ২.৫৭ ভাগ কলা শেরপুরে উৎপাদিত হয়।

শেরপুরে কলা ও আনারস চাষের আদিকথা

"ঝিনাইগাতিতে আনারস চাষের শুরু ১৯৬৬ সালে,"–বললেন ঝিনাইগাতির আনারস চাষের সূতিকাগার ইদিলপুর গ্রামের জন ভেরোন রিছিল চিসিম (৮৬)। ভারতের মেঘালয় থেকে মিশনারিদের মাধ্যমে ৭০০ আনারসের চারা এ অঞ্চলে এসেছিল বলে জানান এই প্রবীণ। এ সময়ে মূলত জায়েন্টকিউ জাতের আনারস চাষ হতো। চাষের সঙ্গে মূলত গারোরাই জড়িত ছিল। রাসায়নিক সার বা কীটনাশকের প্রয়োগ ছিল না। চাষের জন্য জৈব সারের প্রয়োগ হতো।

ইদিলপুরের আরেক আনারস ব্যবসায়ী এবং ইদিলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ. কে. এম. ফজলুল হক (৫৬) জানান, ১৯৭৭-৭৮ সাল থেকে সরকারের পক্ষ থেকে আনারস চাষে ঋণ দেওয়া শুরু হলে চাষের পরিমাণ বাড়তে থাকে। তার মতে, "আনারস হলো পাহাড়ি লালমাটির প্রধান অর্থকরী ফসল।"

ঝিনাইগাতিতে গ্রামগুলোর ঘরবাড়ির পাশে সীমিত কলা চাষ পাকিস্তান আমল থেকেই হতো। কিন্তু এখন যেমন হাজার হাজার একর জুড়ে বাণিজ্যিকভাবে কলা চাষ হচ্ছে আগে তেমন ছিল না বলে জানান বেদুরিয়া গ্রামে জেরোম হাগিদগ। গত শতকের আশির দশকের শেষে ঝিনাইগাতি বন জুড়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিপির) অর্থায়নে শুরু হয় থানা অ্যাফরেস্টেশন অ্যান্ড নার্সারি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (টিএএনডিপি)। প্রকল্পের আওতায় দ্রুত বর্ধনশীল ইউক্যালিপ্টাস এবং আকাশিয়া গাছ লাগিয়ে বন বাগান বা উডলট বাগান সৃষ্টি করা হয়। এ সময় বনের একটা অংশের শালবন নষ্ট করে এই বনবাগান চালু করা হয় বলে স্থানীয় আদিবাসীদের অভিযোগ। কথা ছিল সাত বছরের পর গাছ বড় হলে তা কেটে এসব বনবাগান স্থানীয় যারা অংশগ্রহণকারী আছে তারা লভ্যাংশ পাবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি।

কলা ও আনারস চাষের ক্ষেত্রে পরিবর্তন

'আগে পাকা আনারস কোথাও রাখলে ৩০ গজ দূর থেকে তার ঘ্রাণ পাওয়ার যেত। মধুর মতো মিষ্টি ছিল সেই আনারস। এখন সেই স্বাদ আর নেই আকারে বড় হয়েছে, কিন্তু স্বাদ নষ্ট হয়ে গেছে,'–আনারস চাষের সাথে জড়িত প্রবীণ ভেরন রিছিলের মন্তব্য। তিনি জানান, স্বাধীনতার আগে শুধু জৈব সার দিয়েই তারা আনারস ফলাতেন। কখনো দিতেন স্বল্প পরিমাণে ইউরিয়া। "আনারসের চাষ যত বেড়েছে তার সাথে বেড়েছে কীটনাশক। কয়েকবছর চালু হয়েছে হরমোন। কম সময়ে বড় ফসল পাওয়ার জন্য মানুষ হরমোন প্রয়োগ করছে আনারসে,"–বলেন ভেরন।

ফজলুল হক জানান, আগে কীটনাশকের ব্যবহার ছিল না বললেই চলে। মাটির উর্বরতার জন্য ইউরিয়া এবং টিএসপির'র সংমিশ্রণ ব্যবহার করতেন তারা। "এখন রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও হরমোন প্রয়োগ করার জন্য খরচ বেড়ে গেছে। আর দিন দিন এগুলোর পরিমাণ বাড়ছে। আগে একবার রাসায়নিক সার দিলেই হতো, এখন দিতে হয় তিনবার।" হক

জানান, আশি এবং নব্বইয়ের দশকে একর প্রতি আনারস চাষে খরচ পড়তো ১০ হাজার টাকা। এখন অন্তত ৫০ হাজার টাকা লাগে। আগে ১৫ ইঞ্চি অন্তর চারা লাগানো হতো। এখন সেই ব্যবধানও কমে এসে ১০ থেকে ১২ ইঞ্চিতে। "আসলে সব হচ্ছে চাহিদার কারণে, আর মুনাফার জন্য। বছর দশেক আগে থেকে হরমোনের প্রয়োগ শুরু হওয়ার পর আবাদের সময় কমে এসেছে, ফল বড় হচ্ছে।" আনারস চাষের ক্ষেত্রে কৃষির নতুন নতুন উপকরণ যেমন এসেছে, এই উপকরণগুলোর প্রয়োগ ঘটছে কলাচাষের ক্ষেত্রেও।

"সার, কীটনাশক ও হরমোন মিলিয়ে এখন কলার ক্ষেত্রে অন্তত বিশবার এসব রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োগ হয়," হিসাব দিলেন বড় কলা ক্ষেতের মালিক মধুপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মীর মাসুদ। ক্ষেত প্রস্তুত করার সময় পটাস, জিপসাম, টিএসপি'র পরিমিত প্রয়োগ ঘটে। পাতা গজালে বিটল পোকার আক্রমণ রুখতে দিতে হয় ক্লোরোপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক (পরিচিত ব্র্যান্ড বাসুডিন, কার্বোফরান ইত্যাদি)। কলা চাষের ১১ মাসে এর প্রয়োগ ঘটে ৮ থেকে ১০ বার।

কুয়াশার সময় ছত্রাক আক্রমণ করে পাতায়। এসময় ছত্রাকনাশক টিল্ট প্রয়োজন হয় ১৫ দিন পর পর। টিএসপি, পটাশ ও ইউরিয়ার প্রয়োগও চলে মাঝে মাঝে। কলা একটু বড় হওয়ার পর ফল বৃদ্ধিকারক হরমোন ২ থেকে ৩ বার দিতে হয় ১০ থেকে ১৫ দিন পর পর। এইসব নানা উপকরণ, পানি দেওয়া, নিড়ানি দেওয়া এবং লেবার খরচ মিলিয়ে এখন একর প্রতি কলা চাষে খরচ গুনতে হয় ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা। মীর মাসুদ জানান, খরচ ক্রমশ বাড়ছে। তাই কলা চাষের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে মধুপুরের মানুষ।

হরমোন ও এর ব্যবহার

মানুষের যেমন জন্ম হয়, বৃদ্ধি ঘটে, শারীরিক পরিবর্তন দেখা দেয়, ঠিক তেমনটি ঘটে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে। একটি ফল গাছের কথা যদি ধরি, তার মূল, কাণ্ড বেড়ে পাতা হয়, ফুল হয় এবং ফল হয়। সে ফলও পেকে যায় একসময়। ফল পাকা ঐ গাছের পরিণত হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে, যেমন মানুষের চুল পাকলে হয়। প্রশ্ন হলো, এই পরিবর্তনগুলো কেন হয়? আসলে উদ্ভিদ দেহের ভেতর প্রাণ রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলেই এমন হয়। যেমন আনারস বড় হতে শুরু করলে তার ভেতরে রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হয় যেটি আনারসের খোসার রঙ পাল্টে ফেলে, শাঁস নরম হয়, স্বাদ যায় বদলে। এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী রাসায়নিক দ্রব্যটি হলো ইথরেল বা ২ ক্লোরোইথাইল ফসফসিনক এসিড (২) ChloroethyL phosphone acid)। ফলের ভেতর প্রাকৃতিকভাবে উৎসারিত বা কৃত্রিমভাবে প্রয়োগ করা ইথিলিনের পরিমাণ ০.১-১.০ পিপিএম বাড়লেই মোটামুটিভাবে ফল পাকার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে ক্লোরোফিলের সবুজ অংশ নষ্ট হয় এবং ক্যারোটিনে রূপান্তরিত হয় বা পাকা রং ধারণ করে। ফলের দেহে তৈরি হওয়া এই রাসায়নিক পদার্থ যদি বাইরে থেকে দেওয়া হয় তখন এই পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়। কৃত্রিমভাবে ফল পাকানোর ক্ষেত্রে ইথোফোন (Ethophon) ব্যবহার করা হয়। এটি ফল পাকানোর হরমোন নামে বহুল পরিচিত। হরমোন বা উদ্ভিদবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক Plant Growth Regulator (PGR) নামে কৃষিবিজ্ঞানে পরিচিত। ঝিনাইগাতির রাসায়নিক কীটনাশক ও হরমোন বিক্রেতা বা কৃষকদের দেওয়া নাম হলো 'মেডিসিন'। ইথোফোন এমন রাসায়নিক পদার্থ যা পানির সংস্পর্শে এসে ইথিলিন গ্যাস তৈরি করে।

ইথিলিন (C2H4) ফলের কোষে প্রোটিন এর সাথে মিলিত হয় এবং বিভিন্ন ধরনের ধাতব বিক্রিয়া করে ফল পাকানোর জন্য দায়ী এনজাইমগুলোকে অধিক কার্যকর করে তুলে। কলার উদাহরণ যদি আমরা দেই তাহলে দেখা যায় যে এনজাইমগুলো মূলত চার ধরনের কাজ করে।

১. কলার গায়ের সবুজ ক্লোরোফিল নষ্ট করে দেয়। তাতে হলুদ রং ভেসে উঠে।

২. কলার কোষের দেয়াল নরম করে বা ভেঙে দেয়। তাতে ফল নরম হয়।

৩. কাঁচা অবস্থায় কলার ২০ ভাগ কার্বোহাইড্রেট ও দু'ভাগ চিনি থাকে। পাকলে ঠিক বিপরীতটি ঘটে অর্থাৎ তখন ২০ ভাগ চিনি ও ১ ভাগ কার্বোহাইড্রেট থাকে। তাই পাকা কলা খেতে মিষ্টি। কার্বোহাইড্রেট ভেঙে চিনি (সুক্রোস ও ফ্রুকটোস) তৈরি করতে এনজাইম কাজ করে।

৪. এনজাইম সুগন্ধ তৈরিতেও সাহায্য করে।

ফলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, দ্রুত পাকানো, অসময়ে ফুল আনা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে ইথোফোন ব্যবহার করা হয়। তবে ইথোফোন ছাড়াও অন্যান্য পিজিআর যেমন, মূল বৃদ্ধিকারক (Root initiator) কাণ্ড বৃদ্ধিকারক (Root initiator) ইত্যাদি নানা হরমোন হয়েছে। তবে শুধু বৃদ্ধি বা পাকানোই নয়, বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী (Growth Redactors) হরমোনও রয়েছে। তবে সব ধরনের হরমোনের মধ্যে ইথোফোনের ব্যবহার মধুপুর এলাকায় সবচেয়ে বেশি বলে উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়।

সাধারণত ১০ লিটার পানিতে ২০-২৫ মিলি ইথোফোন ভালোভাবে মিলিয়ে ফলের গা ভিজিয়ে দিতে হয়। ফল গাছে থাকা অবস্থায় হরমোন স্প্রে করা সবচেয়ে ভালো।

বর্তমানে দেশে আলফা-ন্যাফথাইল এসিটিক এসিড, ইপডোল বিউটারিক এসিড, সীউইড এক্সট্যাক্ট, ইথোফেন ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণির হরমোন ৩৪টি বাণিজ্যিক নামে বিক্রি হচ্ছে বলে খামারবাড়ির ফিল্ড সার্ভিস উইং সূত্রে জানা যায়।

এই উইং থেকে সার এবং হরমোন-বিপণনের অনুমোদন দেওয়া হয়। এই হরমোনগুলো ছাড়াও ৪ সিপিএ, জিবারলিক এসিটিক এসিড (জিএ-৩) শ্রেণির পিজিআর সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে যে কোনো প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশন করে তা বিক্রি করতে পারে।

বাংলাদেশে হরমোন এর আগমন গত শতকের নব্বইয়ের দশকের শেষে। সে সময়, কৃষি সম্প্রাসরণ বিভাগ হরমোন ব্যবহারের উদ্যেগী ভূমিকা নেয় বলে জানান উইং-এর সংযুক্ত কর্মকর্তা ড. একেএম শামীম আলম। এর লক্ষ্য ছিল ফলের উৎপাদন বাড়ানো, উৎপাদনের সময় কমিয়ে আনা এবং এর মাধ্যমে কৃষকদের অর্থনেতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতেই এ উদ্যেগ পরিচালিত হয় বলে ড.শামীম জানান।

কীটনাশক ও হরমোন প্রয়োগ: মাঠের চিত্র

ঝিনাইগাতির মোনার বাইদ গ্রামের একটি কলা খেতে কীটনাশক ছিটাচ্ছিলেন আবদুল মান্নান। হাতে-মুখে কোনো দস্তানা নেই, মুখে নেই কাপড়। ফুল শার্ট গোটানো, লুঙ্গি পরে আছেন, সেটি হাটু পর্যন্ত উঠানো। এভাবেই কীটনাশক বা হরমোন ব্যবহার করতে অভ্যস্ত এই দিনমজুর। জানেন এভাবে 'বিষ' ছিটানো শরীরের জন্য ভালো নয়। তারপরও "করোন লাগে, গরীব মানুষ কী করুম। ধনী মানুষ ক্ষ্যাতের পাশে আইসা বইসা থাকে, গরীবেরে লাগায় কষ্টের কামে।"

আরেক গ্রাম গাছাবাড়ির চানমিয়ার দুই একর জমিতে কাজ করেছিলন আবদুল মান্নান। লেখাপড়া জানেন না। মালিক যেভাবে বলে দেয় সে অনুসারে পানির সাথে 'বিষ' মিশিয়ে ক্ষেতে প্রয়োগ করেন। কোন ফসলে কোন সময় কি পরিমাণ 'বিষ' দিতে হবে তা এখন ভালোভাবে জানা হয়ে গেছে মান্নানের। কীটনাশক ও হরমোন প্রয়োগের সময় প্রয়োজনীয় সাবধানতা প্রায় কেউই নেয় না–জানান উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ড. হযরত আলী।

হরমোন ও স্বাস্থ্যঝুঁকি : একটি রাসায়নিক দ্রব্য কতটা বিষাক্ত তা নির্ভর করে ঐ দ্রব্যটির প্রয়োগমাত্রা, প্রয়োগের সময় এবং যার উপর প্রয়োগ করা হচ্ছে তার শারীরিক ওজনের উপর। বিষাক্ততা পরিমাপ করার জন্য আন্তর্জাতিক নির্ণায়ক হলো Lethal Doze 50 বা LD 50 এক কেজি ওজনের কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণিকে (ইঁদুর, গিনিপিক) কোনো রাসায়নিক দ্রব্যের ১ মিলিগ্রাম খাওয়ানো হলে ২ ঘন্টার মধ্যে ঐ প্রাণীর যদি ৫০ ভাগ মৃত্যু ঘটে তবে ১ মিলিগ্রাম হবে প্রাণিটির এলডি ৫০ বা মৃত্যুর ভোজ। কাজেই যেসব রাসায়নিক দ্রব্যের এলডি ৫০ যত বেশি, সেসব রাসায়নিক দ্রব্য ততো কম বিষাক্ত অর্থাৎ নিরাপদ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচ) কৃষি ও শিল্প-কারখানায় ব্যবহার্য এসব রাসায়নিক দ্রব্যকে বিষাক্ততার মাত্রা অনুযায়ী ৫ ভাগে ভাগ করেছে। সব ধরনের বালাইনাশক আছে -১-৩ এর মধ্যে। আর ৪-৫ এর মধ্যে আছে প্লান্ট গ্রোথ রেগুলেটর হরমোন এবং শিল্প কারখানায় ব্যবহার্য রাসায়নিক দ্রব্য। ইথোফোন জাতীয় হরমোনের বিষাক্ততা শ্রেণি ৪। নিচের সারণিতে ডব্লিউএইচ ও প্রদত্ত রাসায়নিক দ্রব্যের বিষাক্ততার শ্রেণি, মাত্রা এবং ২০০৯-২০১০ সালে বালাইনাশক ও ইথোফোন ব্যবহারের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো:

নাম	বিষাক্ততার মাত্রা এলডি ৫০	বিষাক্ততার শ্রেণি ডব্লিইএইচ প্রদত্ত	২০০৯-২০১০ সালে দেশে কৃষি ব্যবহারের পরিমাণ
কার্বোফুরান গ্রুপ	০৮ মিগ্রা/ কেজি	১	১৩.৬৬১ মেট্রিক টন
ডাইমেথয়েন্ট গ্রুপ	৪২৫ মিগ্রা/ কেজি	২	২১
ক্লোরোপাইরিফস গ্রুপ	৩১৬ মিগ্রা/ কেজি	২	৫৩৯
ইথোফোন	৫১১০ মিগ্রা/কেজি	৪	১০

বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কীটনাশক বিভাগের সভাপতি ড. মাহবুবউর রহমান মনে করেন কলা, আনারস কিংবা অন্যান্য ফসল ও ফলে সরকারি অনুমোদন পাওয়া কীটনাশক ও হরমোন সঠিকভাবে, পরিমাণ মতো এবং সময় মেনে প্রয়োগ ও উত্তোলন করলে সেই ফল বা ফসল খেলে শারীরিক ক্ষতির কোনো আশঙ্কা নেই। তবে তাঁর মতে, এসব রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের ঝুঁকি রয়ে গেছে কয়েকটি স্তরে। প্রথম সমস্যা হতে পারে যদি অধিক মাত্রায় রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। যদি বালাইনাশক বা হরমোনের প্রয়োগের উত্তোলন সীমা (Post Harvest Interval-PHI) ঠিক না থাকে। অর্থাৎ কীটনাশক বা হরমোন প্রয়োগের অন্তত ৮-১০ দিন পর ফল খেতে হবে, তার আগে নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের পরিচালক ড. সাগরময় বড়ুয়া মনে করেন, জীববিজ্ঞানে শেষ কথা বলে কিছু নেই। 'অনুমতিপ্রাপ্ত কীটনাশক বা হরমোন ঠিক মাত্রায় নিয়ম মেনে ব্যবহার করলে কিছুই হবে না' কৃষিবিদদের এমন দাবির ব্যাপারে তাই তার মন্তব্য হলো, "ওরা যা বলেছেন তারা সঙ্গে আমি বিরোধিতা করছি না। তবে আমার কথা হলো, এসব রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে হয়তো এমন কিছু হচ্ছে না কিন্তু আজ থেকে ২০ বা ২৫ বছর পর দীর্ঘ মেয়াদে এগুলোর প্রভাব কি হবে–সেটা কে বলবে?" সাগরময় বড়ুয়া মনে করেন, "যা কিছু প্রাকৃতিক স্বাস্থ্যকর। কৃত্রিম যা তা পর্যন্ত ভালো হতে পারে না।"

একটি অনুসন্ধান এবং তার ফলাফল

কলা ও আনারস বা অন্যান্য ফলে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারের বিষয়টি নিয়ে জনমনে একটা ভীতি রয়েছে। এসব ফল খেলে ক্ষতির আশঙ্কা অনেকেই করেন। কিন্তু এ নিয়ে এই সাধারণ ধারণা বা আলাপ-আলোচনা থাকলেও স্বাস্থ্যের উপর এগুলোর আদৌ কোনো নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া আছে কিনা তা নিয়ে কোনো গবেষণা সন্ধান পাই নি। তবে ২০০৩ সালে একটি জাতীয় দৈনিকে 'কলা পাকাইবার অপকৌশল' শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন কৃষি মন্ত্রীর নির্দেশে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের ৩ সদস্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের একটি দল তদন্ত প্রতিবেদন দেয়। ঐ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে সরকার কলার অনুমোদিত হরমোনই ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এতে "মানবদেহের ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।" তবে খালি পায়ে হরমোন স্প্রে করা হচ্ছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় এবং এতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা আছে বলে মন্তব্য করা হয়। হরমোন ব্যবহারও পরিমাণ মতো অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে না বলে ঐ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয় "ইথিলিন জাতীয় হরমোন বা রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা কলা পাকানো অপকৌশল নয়, এটাই প্রকৃত বাণিজ্যিক কৌশল।" দীর্ঘদিন হয়ে গেল এখন আবার সময় এসেছে এ ব্যাপারে বিস্তারিত অনুসন্ধান ও গবেষণার।

নমুনা : দাপ্তরিক বা অফিসিয়াল প্রতিবেদন

১। কলেজ লাইব্রেরির ওপর একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন তৈরি

মার্চ ২২,২০১৪
অধ্যক্ষ
মডেল গার্লস কলেজ
টাঙ্গাইল

সূত্র : আপনার পত্র নং, ২১৩: তারিখ: মার্চ ১,২০১৪

বিষয় : কলেজ লাইব্রেরি সম্পর্কিত প্রতিবেদন

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন, উল্লিখিত সূত্রমতে আপনার নির্দেশক্রমে মডেল গার্লস কলেজ লাইব্রেরির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিচের প্রতিবেদনটি রচিত এবং আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থাপিত হলো।

আপনার বিশ্বস্ত,
স্বপন মাহমুদ
প্রভাষক, বাংলা
মডেল গার্লস কলেজ
টাঙ্গাইল

মডেল গার্লস কলেজ লাইব্রেরি সম্পর্কিত প্রতিবেদন

লাইব্রেরি জ্ঞানের ধারক। যে কোনো কলেজে তাই একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হয়। মডেল গার্লস কলেজ টাঙ্গাইল শহরের একটি নামকরা কলেজ। এই কলেজেরও একটি লাইব্রেরি আছে। ১৯৭৪ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠার পরের বছর এই লাইব্রেরি স্থাপিত হয়।

সমস্যাবলি

ক) কলেজের পরিসর ও অবকাঠামো বৃদ্ধির তুলনায় লাইব্রেরি সমৃদ্ধি লাভ করে নি।

খ) কলেজের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নি।

গ) চাহিদার তুলনায় বই অপ্রতুল। নতুন বই কেনা হয় না বললেই চলে।

ঘ) লাইব্রেরিতে কোনো লাইব্রেরিয়ান ও ক্যাটালগার নিয়োগ দেওয়া হয় নি। একজন শিক্ষককে দায়িত্ব দিয়ে লাইব্রেরিটি পরিচালনা করা হচ্ছে। তিনি প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারেন না।

ঙ) শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরিতে বসে পড়ার সুযোগ সীমিত।

চ) বই ধার নেওয়ার সুযোগ নেই। ফলে এর সর্বোচ্চ সুফল থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে।

ছ) প্রতি বছর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে লাইব্রেরি ফি বাবদ প্রায় এক লক্ষ টাকা উত্তোলন করা হয়। কিন্তু কোনো কমিটি নেই বলে সে টাকায় বই বা বুক-সেলফ কেনা হয় নি।

জ) রেফারেন্স বইয়ের সংখ্যা খুবই সীমিত। যা আছে তা দিয়ে কোনো ভাবেই কাজ চালানো যায় না। আর এগুলোর অবস্থাও নাজুক। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত সৌজন্য সংখ্যা যথেচ্ছভাবে স্থান পেয়েছে লাইব্রেরিতে।

ঝ) শিক্ষকদের বই ধার দেওয়ার ব্যাপারে কোনো নিয়ম মেনে চলা হয় না। তাই কিছু বই শিক্ষকদের কাছে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে রয়েছে।

প্রয়োজনীয় সুপারিশ

ক) লাইব্রেরির জন্য একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

খ) কমিটি গঠন করে প্রতি বছর বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত টাকা দিয়ে বই কেনা প্রয়োজন।

গ) লাইব্রেরিতে বই সংরক্ষণের জন্য আধুনিক ক্যাটালগিং সিস্টেম ব্যবহার করতে হবে।

ঘ) কার্ড সিস্টেম চালু করে বই বাসায় নিয়ে পড়ার সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

ঙ) অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা দরকার। লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ার সুব্যবস্থা গ্রহণ করা অতীব জরুরি।

চ) পর্যাপ্ত রেফারেন্স বই কেনা এবং সৌজন্য সংখ্যা থেকে বাছাই করা বই লাইব্রেরিতে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ছ) লাইব্রেরির সার্বিক মানোন্নয়নের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি গঠন করা দরকার।

(প্রতিবেদকের অনুস্বাক্ষর)

২. কল-কারখানায় গোলযোগ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন রচনা।

সচিবালয়

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১০ জুন, ২০১৪।

মাননীয় মন্ত্রী

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সূত্র : মহোদয়ের পত্র-স্মারক নং-২০১ (ক) ১৭; তারিখ-৬ জুন , ২০১৪

বিষয় : ভাই ভাই গ্লাস ফ্যাক্টরিতে শ্রমিক সংঘর্ষ

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন, উল্লিখিত সূত্র ও বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিমোক্ত প্রতিবেদনটি উপস্থাপিত হলো :

প্রতিবেদক

আপনার বিশ্বস্ত

আরিফ মোহাম্মদ

সিনিয়র সহকারী সচিব

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়

ঢাকা।

১. বিগত ৫ জুন, ২০১৪ তারিখ সকাল ১১টা ২০ মিনিট ঘটনাটির সূত্রপাত ঘটে।

২. সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিরোধ থেকে ঘটনাটি সৃষ্টি হয়েছে।

৩. রহিম শেখ এবং এলাহী বক্স একই মহল্লায় থাকে। এক খণ্ড জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তাদের মধ্যে মামলা-মকদ্দমা ও রেষারেষি চলে আসছিল। তারই জের হিসেবে তারা ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকদেরকে দুই দলে বিভক্ত করে ফেলে এবং এ কারণেই ঘটনাটি ঘটে।

৪. ভাই ভাই গ্লাস ফ্যাক্টরি শ্রমিক নেতা মানিক ওরফে ফালুকে রহিম শেখ টাকা দিয়ে বশ করে এবং এলাহী বক্স আরেক শ্রমিক নেতা তোরাব আলীকে হাত করে। এভাবে দুপক্ষের মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়।

৫. অন্যান্য দিনের মতো ফ্যাক্টরিতে স্বাভাবিক ভাবেই চলছিল, তবে সেদিন শ্রমিকদের

উপস্থিতি ছিল কম। হঠাৎ এলাহী বক্সের ভাড়া করা শ্রমিক নেতা তোরাব আলী দলবল নিয়ে এসে অকথ্য ভাষায় রহিম শেখকে গালাগাল শুরু করে। তখন রহিম শেখের লোকেরাও ফালুর নেতৃত্বে প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। উভয় পক্ষের হাতেই লাঠিসোটা ছিল। এতে ছয়জন মারাত্মকভাবে আহত হয়। এদের চারজন এখনও হাসপাতালে আছে। শ্রমিক নেতা ফালু নিজেও মারাত্মক আহত অবস্থায় মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তার বাচাঁর সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

৬. কারখানর নিরাপত্তা কর্মীরা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনত সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। অবশেষে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে এবং অনেক বিলম্বে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

৭. এই ঘটনার জের হিসেবে ফ্যাক্টরি তিনদিন বন্ধ ছিল। পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক নয়; থমথমে ভাব বিরাজ করছে, উভয় পক্ষই উভয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। আবারও একটা গোলমাল হওয়ায় আশঙ্কা আছে।

৮. ফ্যাক্টরির কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। রহিম শেখ ও তোরাব আলীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। তবে এর জের হিসেবে উভয় পক্ষ থেকেই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে হুমকি প্রদর্শন করা হচ্ছে। কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎকারে জানা যায় তাঁরা জীবনের নিরাপত্তার অভাববোধ করছেন।

৯. ফ্যাক্টরির মালিক তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে অতিরিক্ত কোনো তথ্য জানা যায় নি। তিনি শীঘ্রই দেশে ফিরবেন বলে জানিয়েছেন।

১০. জনস্বার্থে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করার জন্য বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত।

(প্রতিবেদকের স্বাক্ষর)

(প্রয়োজনে সিল)

নমুনা: সাধারণ প্রতিবেদন

১. ভাঙনের কবল থেকে কোনো এলাকাকে রক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ।

মার্চ ১৮, ২০১৪

জেলা প্রশাসক

মানিকগঞ্জ

মহোদয়,

নিমোক্ত প্রতিবেদনের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে আশু পদক্ষেপ প্রত্যাশা করছি।

বিনীত

আপনার বিশ্বস্ত,

আশরাফুর রহমান

সংগঠক, জনহিতৈষী সমিতি

মানিকগঞ্জ

ভাঙনের কবল থেকে শিবালয়কে বাচাঁন

ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলা মানিকগঞ্জ। অল্প কিছুকাল আগেও মানিকগঞ্জ ঢাকার অধীনে ছিল। শিবালয় মানিকগঞ্জের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা। মানিকগঞ্জ জেলা হবার পর থেকে এ অঞ্চলে জনসমাগম বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষ করে সরকারি অফিস-আদালত স্থাপিত হবার কারণে গ্রাম থেকে মানুষ শহরে চলে আসতে থাকে। ঢাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকেও অনেকে এখানে বসতি স্থাপন করে। শিবালয় মানিকগঞ্জ সদরের পার্শ্ববর্তী উপজেলা হবার জন্য এখানেও জনসংখ্যার চাপ পড়ে। ইতোমধ্যে শিবালয়ের জনসংখ্যা মানিকগঞ্জের অন্যান্য উপজেলার চেয়ে বেশি হয়ে গেছে। তবে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আধুনিক স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, মাদ্রাসাসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। মানুষ অত্যন্ত সুখ ও আনন্দে এখানে জীবনযাপন করছিল। কিন্তু প্রকৃতির বিরূপতা দেখা দিয়েছে সম্প্রতিকালে। শিবালয়ের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া যমুনার শাখা নদী গতি পরিবর্তন করায় গত দুবছর ধরে শিবালয়ে ভাঙন দেখা দিয়েছে। ইতোমধ্যে কয়েক শ' হেক্টর কৃষিজমি নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। গত বছর ফোরকানিয়া মাদ্রাসার মাঠটিও নদীগর্ভে লীন হয়। সুনীলপাড়ার কিছু অংশ গত বছর নদীর ভাঙনের কবলে পড়েছে। পাঁছ বছর আগে জেলা পরিষদের অর্থায়নে একটি বাধ নির্মিত হলেও নদীর গতিমুখ পরিবর্তনের জন্য এখন তা মোটেও কাজে আসছে না। ভাঙনের যে দ্রুততা তা রোধ করা না গেলে আগামী দুবছরের মধ্যে শিবালয় মূল শহরে সেই আগ্রাসনের আঘাত এসে লাগবে। এতে অনেক পুরাতন প্রতিষ্ঠান ও ঐতিহ্যবাহী বসতি অঞ্চল তথা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে।

ভাঙনের বর্তমান রূপ ও এর প্রতিক্রিয়ার সামান্যই আপনার সমীপে উপস্থাপন করে জেলার অভিভাবক হিসেবে এ ব্যাপারে আপনার আশু ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

অনুশীলনী

১। 'যানজট' সমস্যার ওপর একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
২। খাদ্যে ভেজাল ও এর প্রতিক্রিয়া বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখ।
৩। শিশুশ্রম বন্ধের আবশ্যকতা তুলে ধরে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
৪। যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ ও প্রতিকার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
৫। 'দুর্নীতি ও তার প্রতিকার' বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
৬। একটি সড়ক দুর্ঘটনার বর্ণনা দিয়ে প্রতিবেদন রচনা কর।
৭। ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র কর সংঘটিত অপ্রীতিকর ঘটনা সম্পর্কে কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ছাত্র-প্রতিনিধি হিসেবে একটি বর্ণনা দিয়ে প্রতিবেদন লেখ।
৮। তোমার দেখা একটি বইমেলা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
৯। বর্তমানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি সম্পর্কে বা বর্তমান বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
১০। কলেজ রোডের দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরে একটি প্রতিবেদন লেখ।

বৈ-ডাক বা (ই-মেইল) এবং ক্ষুদে বার্তা বা এসএমএস

কম্পিউটার সহায়ক আনলাইন পত্র-যোগাযোগের উপায় বা ব্যবস্থাকে বৈদ্যুতিন চিঠি বা ই-মেইল (e-mail) বলে। e-mail কে বাংলায় 'বৈ-ডাক' বলে অভিহিত করা যায়। ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবসায়িক যোগাযোগসহ সব ধরনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে আধুনিক যুগে ই-মেইল বা বৈ-ডাক ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও ব্যবহৃত। কম্পিউটার প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে সাধারণ বার্তা, পত্র, প্রতিবেদন, তথ্য-উপাত্ত, সারণি, চিত্র ইত্যাদি বৈদ্যুতিনভাবে এক কম্পিউটার বা মুঠোফোন থেকে অন্য কম্পিউটার বা মুঠোফোনে এখন মুহূর্তেই পাঠানো যায়। বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে এ উপায়ে নিমিষেই চিঠি পাঠানো সম্ভব। প্রথমে এটি শুধু ইংরেজিতে সম্ভব হলেও এখন পৃথিবীর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভাষার মতো বাংলাতেও সম্ভবপর। এ অধ্যায়ে বাংলা ভাষায় e-mail বা বৈ-ডাক নিয়ে আলোচনা করা হবে।

বৈদ্যুতিন চিঠি লেখার নির্দেশনা

১. বৈদ্যুতিন চিঠির কাঠামোতে বিষয় নির্দেশের একটি ঘর পূরণ করতে হয়। এটি দেখেই প্রাপক সিদ্ধান্ত নেন, বার্তাটি তিনি পড়বেন কিনা। তাই এ ঘরটি পূরণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর গুরুত্ব অনুসারে তিনি ঠিক করেন তা উপেক্ষা করবেন, মুছে ফেলবেন, না ফাইলে সংরক্ষণ করবেন। এজন্য বিষয় শিরোনামে বার্তার মূল বক্তব্য গুরুত্বের সঙ্গে লিখতে হয়।

২. বার্তার প্রথমে বিষয়বস্তু বা উদ্দেশ্য তুলে ধরতে হয়। এরপর প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশ করতে হয়। তবে দীর্ঘকায় আলোচনা না করাই ভালো।

৩. বৈদ্যুতিন চিঠি সংহত ও সংক্ষিপ্ত হবে। সাধারণত ছোট চার/পাঁচ অনুচ্ছেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা ভালো। চিঠির কলেবর দীর্ঘ হলে প্রাপক বিরক্ত হয়ে প্রতিটি শব্দ মনোযোগ দিয়ে নাও পড়তে পারেন। ফলে তার চোখ এড়িয়ে যেতে পারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক তথ্য পরিহার করতে হবে। চিঠি যদি চার বা পাঁচ অনুচ্ছেদের চেয়ে বড় হয়, তাহলে আলাদা সংযোজন attachment হিসেবে পাঠানো উচিত। এক বা একাধিক 'সংযোজন' পাঠানো যায়। সে ক্ষেত্রে মূল চিঠি হবে একেবারে সংক্ষিপ্ত এবং তাতে সংযোজিত চিঠির উল্লেখ থাকতে হবে।

৪. চিঠিতে অনেকগুলো সূত্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সেগুলো ক্রমিক নম্বর বা অন্য কোনো চিহ্নের দ্বারা নির্দেশিত করতে হয়।

৫. চিঠি লেখা শেষ হলে ভালো করে দেখা উচিত যেন কোনো বানান বা বাক্যগঠনগত ত্রুটি না থাকে। এজন্য পেশাদারিত্ব রক্ষা করে সম্পাদনা করা প্রয়োজন।

৬. একই চিঠি অনেক সময় একাধিক প্রাপকের কাছে পাঠানোর প্রয়োজন পড়ে। এ ক্ষেত্রে CC কিংবা bcc ঘরে প্রাপকের ঠিকানা ব্যবহার করতে হয়। কার্বন কপিকে CC বলে। বাইন্ড কার্বন কপিকে bcc বলে।

৭. বৈ-ডাক ঠিকানা সবসময় ইংরেজি ছোট হাতের লিপি বা Small Letter-এ লিখতে হবে। এর কোনো লিপি Capital Letter হবে না।

বৈদ্যুতিন চিঠির নমুনা

১. সঞ্চয় হিসাব জানতে চেয়ে ব্যাংক ম্যানেজারকে বৈদ্যুতিন চিঠি

প্রেরক : mykcr@gmail.com
প্রাপক : bbank@yahoo.com
তারিখ : ২৭ মে, ২০১৪
বিষয় : সঞ্চয় হিসাবে স্থিতি সম্পর্কে অবহিতকরণ
ম্যানেজার
ব্রাক ব্যাংক
আসাদগেট শাখা
ঢাকা
বিষয় : সঞ্চয় হিসাবের স্থিতি সর্ম্পকে অবহিতকরণ
মহোদয়
আপনার ব্যাংক-শাখায় আমার এস বি একাউন্ট (০০০০৪৫৮৯৬৮৯৮২১) রয়েছে।
আমাকে বর্ণিত হিসাবের সর্বশেষ স্থিতি সম্পর্কে জানানোর অনুরোধ করা হলো।
ধন্যবাদসহ
কেশব পাল
৩০/৫ তেজকুনি পাড়া
ফার্মগেট
ঢাকা।
বৈ-ডাক : mykcr@gmail.com
মুঠোফোন : ০১৭৯৫-৮৯৪৩৪৪

২. বইয়ের তালিকা চেয়ে প্রকাশককে বৈদ্যুতিন চিঠি।

প্রেরক : tajbrkg2000@yahoo.com
প্রাপক : agni@gmail.com
তারিখ : ২৫ এপ্রিল, ২০১৪
বিষয় : শামসুর রাহমানের গ্রন্থ-তালিকা।
ম্যানেজার,
অগ্নি পাবলিকেশন
ঢাকা।
মহোদয়,
আমাদের গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে শামসুর রাহমানের গ্রন্থ ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আপনাদের প্রকাশনী থেকে শামসুর রাহমানের বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে জানি। সেই তালিকা ও মূল্য অবিলম্বে সরবরাহ করলে আমরা প্রয়োজনীয় ক্রয়-নির্দেশ পাঠাতে পারি।
ধন্যবাদসহ
রাজিন আহমেদ

গ্রন্থাগারিক
রোকেয়া গ্রন্থাগার
সুনীলনগর, সেরপুর
বৈ-ডাক : tajbrkg2000@yahoo.com
মুঠোফোন : ০১৭৯৫-৬৬৯৮৭৫
বিশেষ দ্রষ্টব্য : দাপ্তরিক পত্রের আরম্ভে মহোদয় লেখা সমীচীন। জনাব হলো 'Mr'। 'Sir'-এর যথার্থ পরিভাষা
'মহোদয়
অনুশীলনী

১। বৈদ্যুতিন পত্র লেখ:
বিদেশি বন্ধুর কাছে, হোটেল কক্ষ রিজার্ভ, ট্রেনের টিকেট বুকিং

ক্ষুদে বার্তা বা এসএমএস

কোনো উপলক্ষে পত্র লেখার বদলে আনন বই (facebook) অথবা মুঠোফোনে (mobile) ক্ষুদে বার্তা (sms) প্রেরণ বর্তমানে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এ পদ্ধতিতে যে-কোনো মুহূর্তে পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় মুহূর্তের মধ্যে বার্তা। প্রেরণ করা সম্ভব। তাছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পণ্য প্রচার ও তথ্য জানানোসহ বিদুৎ, পানি ও গ্যাস ইত্যাদি সংস্থার পাওনা বিল পরিশোধের তাগাদা দেওয়ার ক্ষেত্রেও ক্ষুদে বার্তার ব্যবহার দিন দিন যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি গুরুত্ব বাড়ছে। উচ্চ শিক্ষার ফল জানা, প্রতিষ্ঠানে দরখাস্ত প্রেরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এ ধরনের বার্তা প্রেরণ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

ক্ষুদে বার্তা লিখনের নির্দেশনা

১. ক্ষুদে বার্তা হবে সহজ, সরল, সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট ও স্বচ্ছ।

২. ক্ষুদে বার্তা খুব সীমিত শব্দ সংখ্যার মধ্যে লিখতে হয়। তাই এতে প্রচুর পরিমাণ তথ্য প্রদানের সুযোগ থাকে না। একান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানই এখানে মুখ্য।

৩. ক্ষুদে বার্তা এমনভাবে তৈরি করতে হয় যেন প্রাপক বার্তা পাঠের আগেই প্রেরক সম্পর্কে জানতে পারেন।

৪. ক্ষুদে বার্তা এমন হওয়া উচিত যাতে প্রাপক বার্তা পেয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

৫. যদি ক্ষুদে বার্তা জরুরি হয় তাহলে শুরুতেই এমন কথা থাকতে হবে যাতে প্রাপকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

৬. ব্যবসা বা বিপণন সংক্রান্ত ক্ষুদে বার্তা হলে বার্তার শুরুতে 'বিশেষ সুযোগ,' 'অবিশ্বাস্য মূল্যহ্রাস' ইত্যাদি জাতীয় আকর্ষণমূলক কথা ব্যবহার করা ভালো।

৭. যে কোনো ক্ষুদে বার্তা কাউকে পাঠানোর পূর্বে পরীক্ষামূলকভাবে নিজের মুঠোফোনে পাঠিয়ে দেখে নেয়া ভালো। কারণ, ফরম্যাট ভেঙে গেল কিনা, বার্তা যথাযথ ও নির্ভুল হয়েছে কিনা এতে তা দেখার সুযোগ থাকে এবং প্রয়োজনে সম্পাদনা করাও সম্ভব হয়।

৮. কোম্পানি বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান মোবাইল ফোন কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করে বিশেষভাবে ক্ষুদে বার্তা পাঠাতে পারেন। এতে নম্বরের স্থলে আগেই কোম্পানির নাম প্রকাশিত হয়।

ক্ষুদে বার্তার মূল অংশের নমুনা

১. **নববর্ষের শুভেচ্ছা**

মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জড়া
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।
শুভ নববর্ষ ২০১৪।

২. **ইদের শুভেচ্ছা**

ইদ সবার জীবনে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি ও সাম্য নিয়ে আসুক।
ইদ মোবারক।

৩. **বিক্রয় সংবাদ**

ফার্মগেটে ২৫০০ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রি হবে
যোগাযোগ :০১৭৩৫৫৫৫৬৬৬

অনুশীলন

১. ক্ষুদে বার্তা লেখ

বন্ধুকে জন্মদিনে আমন্ত্রণ, কক্ষ-সহচর বা রুমমেটকে হোস্টেলে ফেরার কথা জানানো, পুরস্কার পাওয়ার অভিনন্দন।

মুখলেখ বা ফেসবুক

এ যুগের অত্যন্ত শক্তিশালী সামাজিক যোগাযোগ মাধমে হলো মুখলেখ বা ফেসবুক। যদিও এটা একটি কোম্পানি, তবু এই কোম্পানি সাধারণ ব্যবসায় শিক্ষার বিবেচনা করা কঠিন। সারা বিশ্বের প্রতিযোগী অনেক কোম্পানিকে প্রায় শতভাগ পেছনে ফেলে মুখলেখন আজ জগৎজোড়া হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশে জনপ্রিয়তম সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মুখলেখ বা ফেসবুক আজ সমাদৃত। 'ফেসবুক' কোম্পানির প্রধান প্রতিযোগী চায়নার 'কিউজোন' বা 'রেনরেন'; দক্ষিণ কোরিয়ার 'সাইওয়ার্ল্ড'; রাশিয়া, বেলারুস কাজাকস্তান, কিরগিস্থান, মালডোবা, ইউক্রেন, উজবেকিস্থানের 'ভিকে'; ইরানের 'ক্লাব'; ভিয়েতনামে 'জিং'; জাপানের 'মিক্সি'। কিন্তু এটাও ঠিক, 'ফেসবুক' সারা বিশ্ব গ্রাস করে ক্রমাগ্রসরমান। যেমন, ব্রাজিলে 'অরকুট' ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে বন্ধ হয়ে গেছে; 'ভিকে' ঠিকঠাক চলছে না, 'ক্লাব' তো খুবই সীমিত, জাপানিরাও 'ফেসবুক'-এ নিমজ্জিত 'মিক্সি' রেখে। তাই' 'ফেসবুক' কোম্পানি হলেও এটি ধারণাগতভাবে সাধারণ কমার্সের কোম্পানি নয়। এটি সর্বজনীন একটি প্রতীতিতে পরিণত হয়েছে এবং তা কোম্পানির উর্ধ্বকমা থেকে মুক্তি পেয়ে হয়েছে ফেসবুক, এরই বাংলা পরিভাষা হলো মুখলেখ। আর বছর দশেক বাদে না! জানি কী হয়– এই মুখলেখ বা ফেসবুকে মানুষ যে কোনো ফটো দিতে পারে, ভিডিও সংযুক্ত করতে পারে, আর লিখতে পারে যা খুশি তাই। এখানে সে অর্থে সম্পাদক সে নিজেই। তাই মুখলেখন-এর ধারককে বা ফেসবুক হোল্ডারকে অনেক বেশি সচেতন থাকতে হয়। সে কী লিখবে, কোন ফটো বা ভিডিও দেবে সবই আগে ভাবতে হয় কারণ, তার অনবধানতায় ব্যক্তিগত বা সামাজিক কোনো বিপর্যয়ও ঘটতে পারে।

ফেসবুক (Facebook) ফেবু হিসেবে সংক্ষেপে পরিচিতি। তবে এর বাংলা পরিভাষা: 'মুখলেখ'; উচ্চারণ : মুখোলেখ'। যেখানে নিজের ও অন্যের মুখ ও ছবির স্থির ও চলরূপ প্রদান করা যায় আর লেখা যায় যা খুশি তাই–সেটিই 'মুখলেখ'। এটি বিশ্ব-সামাজিক আন্তঃযোগাযোগ ব্যবস্থার এটি ওয়েবসাইট, যা ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি ৪ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিতে নির্খরচায় সদস্য হওয়া যায়। ইন্টারনেটের সাধারণ খরচ ছাড়া আর এখানে বাড়তি অর্থ গুনতে হয় না। এর মালিক হলো ফেসবুক ইনক। ব্যবহারকারীগণ বন্ধু-সংযোজন, বার্তা প্রেরণ, ভিডিও প্রদান এবং তাদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি হালনাগাদ করতে পারেন, সেই সাথে একজন ব্যবহারকারী বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্কেও যুক্ত হতে পারেন। ইংরেজি Facebook কোনো নতুন শব্দ নয়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যকার উত্তম জানাশোনাকে উপলক্ষ্য করে প্রশাসন কর্তৃক যে বই প্রদান করা হয় তার নাম Facebook। প্রদত্ত এই বইয়ের নাম থেকে ওয়েবসাইটটির নামকরণ করা হয়েছে। মার্ক জাকারবার্গ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নকালীন তাঁর কক্ষসহচর ও কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়ের ছাত্র এডওয়ার্ডো সেভারিন, ডাস্টিন মস্কোভিত্স ও ক্রিস হিউজেসের যৌথ প্রচেষ্টায় মুখলেখ বা ফেসবুক নির্মাণ করেন। ওয়েবসাইটটির সদস্য প্রাথমিকভাবে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু পরে সেটা বোস্টন শহরের অন্যান্য কলেজ, আইভি লিগ এবং স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। আরো পরে এটা সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, হাইস্কুল এবং ১৩ বছর বা ততোধিক বয়স্কদের জন্য উন্মুক্ত করা

হয়। সারা বিশ্বে বর্তমানে এই ওয়েবসাইটটি ব্যবহার করছেন ৩০০ মিলিয়ন কার্যকরী সদস্য। এ সংখ্যা অগণিত হওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

একক ব্যবহারকারী প্ল্যাতার ফরমেটটি ২০১১ সালের শেষের দিকে পুনর্গঠন করা হয় এবং যা পরবর্তীকালে প্রোফাইল অথবা ব্যক্তিগত টাইমলাইন হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছে। ব্যবহারকারী রা তাদের প্রোফাইল ছবি, চিত্র, ব্যক্তিগত আগ্রহ, যোগাযোগ ঠিকানা, জীবনের স্মরণীয় ঘটনা ও অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য সহকারে তৈরি করতে পারে। ব্যবহারকারীরা একে অন্যের সাথে উন্মুক্ত এবং গোপনীয়ভাবে যোগাযোগ করতে পারেন বার্তা ও চ্যাটের সাহায্যে। বন্ধু তালিকায় না থাকার পরও শুধু 'অনুসারী' হয়ে কোনো পোস্টে মন্তব্য করা যায়। ৬ই সেপ্টেম্বর ২০০৬ সাথে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ 'খবর' জানান দেন। খবরের বিষয়টি প্রতিটি ব্যবহারকারীর হোমপৃষ্ঠায় স্বাভাবিকভাবেই আসে এবং বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে, যেমন প্রোফাইলে কোনো পরিবর্তন, আগত কোনো ইভেন্ট বা বন্ধুদের জন্মদিনের খবর ইত্যাদি। ২০০৬ সালের আগস্টের ২২ তারিখ মুখলেখ বা ফেসবুক নেট চালু করা হয়, যা মূলত একটি ব্লগিং বৈশিষ্ট্যের ধারক। এটিতে ট্যাগ এবং ছবি যোগ করা যায়। ২০০৮ সালের ৭ই এপ্রিলের সপ্তাহে কমেট ভিত্তিক তাৎক্ষণিক বার্তা আদানপ্রদান ঋ্যাপ্লিকেশ চালু করে যা চ্যাট নামে পরিচিত বিভিন্ন নেটওয়ার্কে। এটি ব্যবহারকারীর বন্ধুদের সাথে যোগাযোগের সুযোগ দেয় আর এটির ডেস্কটপ ভিত্তিক তাৎক্ষণিক বার্তার অ্যাপ্লিকেশনের সাথে মিল রয়েছে। মুখলেখ বা ফেসবুকের একটি নতুন বার্তার পথ, যার নাম প্রজেক্ট টাইটান; চালু করা হয় ১৫ই নভেম্বর ২০১০ সালে। এই নতুন ব্যবস্থার ফলে ব্যবহারকারীরা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে মুখলেখ বা ফেসবুক দিয়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে (যার মধ্যে আছে বিশেষ বৈ-ডাক বা ই-মেইল ব্যবস্থা, লেখ্য বার্তা অথবা ফেসবুক ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপ দিয়ে)। যে পদ্ধতিই হোক না কেন্ তা ইনবক্সে একটি একক সূত্র বা থ্রেড হয়ে জমা হয়। অন্যান্য মুখলেখ বা ফেসবুক বৈশিষ্ট্যের মতো ব্যবহারকারী এখানেও কার থেকে বার্তা গ্রহণ করবে তা ঠিক করে দিতে পারে তা–হতে পারে শুধু বন্ধু বন্ধুর, বন্ধু অথবা যে কেউ। বৈ-ডাক বা ই-মেইল সেবাটি ২০১৪ সালে কম ব্যবহারের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। মুখলেন বা ফেসবুক ওয়েবসাইট ছাড়াও বার্তাগুলো মোবাইল অ্যাপ থেকে ব্যবহার করা যায়। এর জন্য মুখলেখ বা ফেসবুকের একান্ত একটি অ্যাপ রয়েছে যা মুখলেখ বা ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার নামে পরিচিত। এ ছাড়া মুখলেখ বা ফেসবুক ভয়েস কল, ভিডিও কল, ভিডিও দেখা, অনুসরণ ইত্যাদির কাজ হয়। মুখলেখ বা ফেসবুক ব্যবহারের ইতি-নেতি প্রভাব পড়ছে বিশ্বব্যাপী। তবু মুখলেখ বা ফেবু ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যাপকভাবে। এখন বাংলা ভাষাতেও মুখলেখন বা ফেসবুক ব্যবহার করা সম্ভবপর। তাই, অনেকেই বাংলাতেই তাদের মুখলেখ বা ফেসবুকের লেখাগুলো লিখে থাকে। এ ব্যাপারে ব্যক্তির সচেতনতা খুবই জরুরি। কারণ, পত্রিকায় একজন সম্পাদক থাকেন, যিনি পত্রিকায় লেখা প্রকাশের তা প্রকাশযোগ্য কিনা তা দেখেন, টেলিভিশনে একজন প্রযোজক বা পরিচালক থাকেন, যিনি কোনো ছবি টেলিভিশনে দর্শনযোগ্য কিনা তা বিবেচনা করেন। এখানে সর্বেসর্বা মুখলেখকারীই বা ফেসবুক যার নামে খোলা তিনিই। তাই দায়িত্ব অনেক বেশি। মুখলেখ বা ফেসবুক ব্যবহার করার সময় যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে।

আবেগের **নিয়ন্ত্রণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন**

- রাজনৈতিক ও ধর্মীয় লেখার বিষয়ে পাঠ (post) প্রদান বা মন্তব্য (comment) করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পরিমাণে বিবেচনাবোধ জাগ্রত রাখা ও শালীন ভাষা ব্যবহার করা দরকার। এই পাঠ বা মন্তব্যে যেন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোনোভাবে মনে আঘাত না পান অথবা রাষ্ট্রবিরোধী না হয়, তা সর্বাগ্রে বিবেচনায় রেখে লেখা।
- পাঠ বা মন্তব্য লেখার সময় ভাষার যথেচ্ছচার যেন না হয়। মনে রাখা জরুরি, মুখলেখন বা ফেসবুকের লেখা বন্ধুদের মাধ্যমে মুহূর্তেই বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। আর এর মধ্য দিয়ে মুখলেখনকারীর ব্যক্তিত্ব যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি তার পড়ালেখার পরিধিও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।
- মুখলেখ বা ফেসবুকে কোনো সংক্ষিপ্ত সংবাদ হলেও অর্থ পরিষ্কার করে প্রদান করা প্রয়োজন। অসম্পূর্ণ বা অর্থহীন কিছু লিখলে তা স্থূল কৌতুকের সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশক হবে না।
- মুখলেখ বা ফেসবুকে দীর্ঘ পাঠ বা post প্রদান করা যায়। কোনো সাহিত্যিক রচনা, যেমন: কবিতা, গল্প, ধারাবাহিক উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনি ইত্যাদি লেখা যেতে পারে। এ ধরনের রচনা-পাঠ দেবার আগে মুখলেখনকারীকে ভাষা ও রুচিগত দিকটি খেয়াল রাখতে হবে।

নিচে কয়েকটি আদর্শ মুখলেখ-পাঠের নমুনা প্রদান করা হলো :
কবি ও সাংবাদিক আনিস আহমেদের মুখলেখে দেওয়া তাঁর একটি কবিতা :

বাংলা খুঁজি
আনিস আহমেদ
আজকাল এই বিদেশ বিভুঁইয়ে বিভ্রান্তিতে ভুগি আমি
হঠাৎই যেন শুনতে পাই দেদার বাংলা বলে যাচ্ছে কেউ
পাতাল রেলের ভিড়ের ভেতর শুনতে পাই বাংলা কথা
বাসের পেছনের আসন থেকে ভেসে আসে মায়ের ভাষা
চমকে থমকে গিয়ে তাকিয়ে দেখি, বাঙালিতো কেবল আমিই
বাকিরাতো কেউই ঠিক আমার মতো নয়, এ কী কেবলই কল্পবিলাস !

মাগুর মাছ ভেবে যে 'ক্যাট ফিশ' আনি বাজারের থলে ভর্তি করে
কিংবা পমফ্রেটের ভেতরে খুঁজি রূপ-চাঁদার অমৃত আস্বাদ
সযত্নে যে লালন করি টবে লাগানো বেলি ফুলের চারা
হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াই যে অঘ্রাণেও পাকা কাঁঠালের ঘ্রাণ
লাউয়ের লতায় যে ভ'রে ওঠে আমার বিদেশ বাড়ির এই আঙ্গিনা
এর সবটুকুতেই তো খুঁজে বেড়াই লাল সবুজের সমারোহ।

পুরোনো 'কান্ট্রি সং'-এ খুঁজি ভাটিয়ালির সুর, সবটাই কী ভ্রান্তিবিলাস
নাকি স্বদেশের নকশি কাঁথায় খানিক স্বপ্ন দেখার অপূর্ণ সে আশ।

১৫ই মার্চ ২০১৮, স্যারিল্যান্ড

সাংবাদিক আনোয়ার কবিরের মুখলেখন-এর একটি পাঠ :

কোচিং ও গাইড বইয়ের মাধ্যমে এখন যারা মেধাবী হচ্ছেন তাদের দিনের অধিকাংশ চলে যায় কোচিং ও প্রাইভেট পড়তে। দেশ, জাতি, বিনোদন, খেলাধুলো, সাহিত্য, সিনেমা সকল কিছু থেকে দূরে থাকে তারা। এক ধরনের বন্ধ্যাত্বে মেধাবী হওয়ার অসুস্থ প্রতিযোগিতায় মেতেছে বাবা মা থেকে শিক্ষার্থীরা। সত্যিকারের মেধাবী সে, যে নিয়ন্ত্রিতভাবে নয় স্বাভাবিকভাবে সৃজনশীলতার চর্চা করবে। দেশ, জাতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিনোদনকে ধারণ করবে। দিন দিন আমরা, প্রকৃত মেধার চর্চা থেকে হাজার মাইল দূরত্বে চলে যাচ্ছি।

অধ্যাপক আইনুন নাহারের মুখলেখনের একটি শোকপাঠ :

বাইশ বছরের আগে শফিপুরে তালিমের বাড়িতে গিয়েছিলাম তার বিয়েতে, সতীর্থ বন্ধুদের সাথে আজ আবার সেখানে গেলাম, একই বন্ধুদের সাথেই, কিন্তু এবার প্রেক্ষাপট একেবারে ভিন্ন। "জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে, বন্ধু হে আমার রয়েছে দাড়াঁয়ে..।" ভাল থেকো তালিম।

অধ্যাপক পবিত্র সরকারের মুখলেখ থেকে উদ্ধৃত কিছু মন্তব্য:

১. সবাইকে বাংলা নতুন বছরের স্নেহ, প্রীতি, শুভেচ্ছা জানাই। জ্যেষ্ঠ ও প্রণম্যদের প্রণাম। নতুন বছরে আর একটিও আসিফা না ঘটুক, একজনও দলিত না খুন হোক, গণতন্ত্র মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াক। মানুষ মানুষ হোক।

২. আগামী ৮ই এপ্রিল ২০১৮, রোববার, বেলা ৩টের সময় ধর্মতলা মেট্রো থেকে রবীন্দ্র সদন পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক হিংসা আর অসহিষ্ণুতা বিরোধী এক মহামিছিল হবে। দলমতনির্বিশেষে যাঁরা সাম্প্রদায়িকতাকে আমাদের জাতীয়তা আর মানবতার সঙ্গে সংগতিহীন মনে করেন, তাঁরা সবাই এই মিছিলে আসুন।

পত্রাদি লেখন

যোগাযোগের জন্য আমরা একে অপরের কাছে যা লিখে পাঠাই তাই পত্র। ব্যক্তিগত, সামাজিক, দাপ্তরিক, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে নানাপ্রকার পত্র লিখতে হয়। প্রতিটি পত্র লেখার কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম-রীতি রয়েছে। অর্থাৎ ভিন্ন লিখনরীতি রয়েছে। চিঠিপত্রের ধরন অনুসারে রচনাকৌশল ও প্রকাশভঙ্গি পাল্টে যায়। বৈ-ডাক ও মোবাইলে ক্ষুদে বার্তার কারণে আজকাল ব্যক্তিগত চিঠি লেখা কমে গেলেও দাপ্তরিক ও সামাজিক প্রয়োজনে চিঠিপত্রের প্রয়োজন কমেনি। চিঠিপত্রকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন:

ক. ব্যক্তিগত পত্র
খ. নিমন্ত্রণপত্র বা আমন্ত্রণপত্র
গ. ব্যবসা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত পত্র
ঘ. ছুটি ও অন্যান্য আবেদনপত্র
ঙ. চাকরির আবেদনপত্র
চ. স্মারকলিপি ও মানপত্র
ছ. জনপ্রিয় বিষয় সম্পর্কে সংবাদপত্রে চিঠি।

লক্ষণীয়, চিঠিপত্রের সঠিক আঙ্গিক ও রীতিপদ্ধতি মেনে চলা বাঞ্ছনীয়। বিষয় বক্তব্য স্পষ্ট করে বলা দরকার এবং চিঠির ভাষা অবশ্যই শুদ্ধ হতে হবে। ব্যক্তিগত চিঠির ভাষার নিজস্ব শৈলী থাকলে ভালো হয়। নিচে বিভিন্ন প্রকার চিঠিপত্রের নমুনা উপস্থাপন করা হলো :

	ডাকটিকেট
প্রেরক রূপম চৌধুরী ৮/৯ কমিশনার গলি সদর রোড খুলনা।	প্রাপক হায়দার আলি ৮/৯ মনিপুরিপাড়া ফার্মগেট ঢাকা।

ক. ব্যক্তিগত পত্র

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, সৌজন্যে, কুশল বিনিময়ে ও চিঠির উত্তর দেবার জন্য ব্যক্তিগত চিঠি লেখা হয়। সাধারণত আপনজন, বন্ধুবান্ধবদের কাছেই ব্যক্তিগত চিঠি লেখা হয়ে থাকে। মা, বাবা, ভাই, বোন, সহপাঠী, বন্ধুদের কাছে চিঠি লেখার সময় কিছু নির্দিষ্ট বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয়। চিঠির মোটামুটি পাঁচটি অংশ থাকে। (১) শিরোনাম (২) সম্ভাষণ (৩) মূল অংশ (৪) সমাপ্তি-শুভেচ্ছা (৫) নাম স্বাক্ষর।

শিরোনামে প্রাপকের ডাকযোগের ঠিকানা লিখতে হয়। যেমন :

খালিদ রওশন আলম
গ্রাম : মনোহরপুর
ডাকঘর : সুভদ্রা
জেলা : রাজশাহী
কোড : ৬২০৫

তবু কেউ ইচ্ছে করলে মেয়েবন্ধুদের আলাদাভাবে সম্ভাষণ করতে পারেন। যেমন : সুচরিতাসু, সুহৃদয়াসু, প্রিয়তমা। বয়ঃকনিষ্ঠ কেউ ইচ্ছে করলে মেয়েবন্ধুদের আলাদাভাবে সম্ভাষণ করতে পারেন। যেমন: সুচরিতাসু, সুহৃদয়াসু, প্রিয়তমা। বয়ঃকনিষ্ঠ ছেলেকে কল্যাণীয়, কল্যাণীয়েষু, স্নেহাস্পদেষু, প্রীতিভাজনেষু ইত্যাদি। মেয়েদের জন্য কল্যাণীয়া, স্নেহভাজনীয়া, কল্যাণীয়াসু ইত্যাদি। কুশল বিনিময়ের পর মূল বক্তব্য লেখা হয়। এটাই চিঠির মূল অংশ। ব্যক্তিগত চিঠি চমৎকার ভাব দিয়ে হৃদয়গাহী করে লেখা যায়। বিখ্যাত লেখকদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কয়েকটি অনুচ্ছেদে (২/৩টির বেশি নয়) চিঠি শেষ করা উচিত।

সমাপ্তিতে লেখক নিজের নামের আগে সম্পর্ক অনুযায়ী গুণবাচক শব্দ ব্যবহার করেন। সেটাই বাঙালির রীতি। পুরুষ পত্র লেখক শ্রদ্ধাভাজন প্রাপকের উদ্দেশ্যে সাধারণত লেখেন-স্নেহধন্য, বিনীত, প্রীতিধন্য, গুণমুগ্ধ ইত্যাদি। পত্রলেখিকার জন্য স্নেহধন্যা, বিনীতা, প্রীতিধন্যা, প্রীতিস্নিগ্ধা অনুযায়ী ইত্যাদি বিশেষণ দেওয়া যায়। অচেনা সম্মানীয় প্রাপকের উদ্দেশ্যে বলা হয়–নিবেদক, বিনীত, তদীয় ইত্যাদি। পত্রলেখিকার জন্য নিবেদিকা, বিনীতা ইত্যাদি বিশেষণ দেওয়া যায়।

বন্ধুদের উদ্দেশ্যে প্রীতিধন্য, তোমারই, আপনারই, গুণমুগ্ধ ইত্যাদি লেখা হয়। পত্রলেখিকার জন্য প্রীতিধন্যা, তোমারই, আপনারই, প্রীতিমুগ্ধা ইত্যাদি।

বয়সে ছোট প্রাপকের উদ্দেশ্যে লেখা হয় আশীর্বাদক, শুভাকাঙ্ক্ষী, শুভার্থী, শুভানুধ্যায়ী ইত্যাদি।

চিঠিপত্রের খামে ঠিকানা লেখারও নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। সাধারণত খামের ডানদিকে প্রাপকের ঠিকানা লেখা হয় এবং তার ওপরে ডাকটিকেট লাগানো হয়। বামপাশে লেখা হয় প্রাপকের ঠিকানা। একটি নমুনা লক্ষ করুন :

বাংলাদেশ ডাকবিভাগ কর্তৃক সরবরাহকৃত হলুদ রঙের খামে সম্মুখ পৃষ্ঠায় প্রাপক ও পশ্চাৎপৃষ্ঠায় প্রেরকের ঠিকানা লেখার স্থান নির্দিষ্ট আছে।

বক্তিগত চিঠির ভবিষৎ

প্রযুক্তি আজ উৎকর্ষের পথে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হস্তলিখিত পত্র এগোতে পারছে না। তাই ব্যক্তিগত পত্র লেখার প্রচলন উদ্বেগজনক হারে কমে যাচ্ছে। ব্যক্তিগত পত্রের স্থানে জায়গা করে নিচ্ছে মুঠোফোনের ক্ষুদেবার্তা-এসএমএস, এমএমএস এবং ইন্টারনেট-চালিত বৈ-ডাক, ফেসবুক ইত্যাদি। তারপরও ব্যক্তিগত হস্তলিখিত পত্রের একটি পৃথক আবেদন আছে। রবীন্দ্রনাথের হাতে লেখা পত্রগুলো বা নজরুলের চিঠিগুলোতে শুধু তাঁদের লেখার পরিবর্তনই বোঝা যায় তা নয়, সেখানে প্রতিফলিত হয় ব্যক্তির আনন্দ-আবেগ, সুখ-দুঃখের জলছবি। এই ধরনের পত্রের ধারা যথাসম্ভব টিকিয়ে রাখা প্রয়োজন।

ব্যক্তিগত চিঠির নমুনা

তোমার লেখা ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনা দিয়ে প্রবাসী বন্ধুর কাছে একটি রচনা কর।

হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
২৪শে জুলাই, ২০১৪

প্রিয় কেয়া

দেশ থেকে বিদেশের মাঠিতে পা দিয়ে আমাকে পর পর দুটো পত্র দিয়েছিলে। কিন্তু তারপর নীরবতা তোমার। তাই অনেক দিন হলো তোমার কোনো খবর জানি না। আশা করি ভালো আছ। আমি কলেজ থেকে সোনারগাঁ বনভোজন করতে গিয়েছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঈশা খাঁর রাজধানী সোনারগাঁ দেখা। বাংলার গৌরব ঈশা খাঁর অমর কীর্তি সোনারগাঁ। এর প্রাচীন স্থাপত্য, প্রাকৃতিক শোভা নয়ন জুড়ানো ভাবমূর্তি যা বাস্তবে না দেখলে কখনো বোঝানো যাবে না। এখানের লোকশিল্প যাদুঘর দেখার ইচ্ছা ছিল অনেক দিনের। সে ইচ্ছা পূরণ হলো এখন। সকাল দশটায় আমরা সোনারগাঁ পৌঁছালাম। ছায়া ঢাকা, পাখি ডাকা শান্তির নীড় যেনো এক স্নিগ্ধ শহর। রাস্তার পাশে ভগ্নপ্রায় দ্বিতল ভবন। সামনেই একটা পুকুর। পুকুরের পাশে রয়েছে লিচু গাছের সারি। ঘাটের পাশেই ঘোড়ার পিঠে রয়েছে বীরযোদ্ধা। ভয় পেয়েছো! না, ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। এতো পাথরে গড়া। সে পুকুরেই আছে স্বচ্ছ জল। হয়তো একদিন চাঁদনী রাতে প্রকৃতি প্রেমিক-প্রেমিকা এসে বসতো এ ঘাটে। একটু এগিয়ে যেতে রয়েছে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের প্রচেষ্টায় স্থাপিত বাংলার লোকশিল্প ও কারুশিল্প যাদুঘর। এখান থেকে শুরু ঈশা খাঁর রাজধানী। রাস্তার দু পাশে রয়েছে প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন দালান-কোঠা।

সপ্তদশ শতকে সোনারগাঁ ছিল জলবেষ্টিত, আজও বর্তমান মূল শহরের পিছন দিয়ে ক্ষীণ স্রোতধারার নদী বর্তমান। তা ছাড়া রয়েছে ইতিহাস খ্যাত গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের মাজার।

উত্থান-পতনের ধারায় হারিয়ে যাবে এ ঐতিহ্য। কিন্তু মানব হৃদয়ে চিরদিন থাকবে অমলিন। তাই তুমিও সময় পেলে দেখে যাবে এ বাংলার ঐতিহ্যবাহী বিবর্ণ দালন-কোঠা, ইতিহাসের নিদর্শন। নিদর্শনসমূহ দেখার এক সময় খাওয়ার তাগিদ এলো। খেয়ে দেয়ে আবার বাসে ফিরে এলাম। শেষ হলো আমাদের ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন ও বনভোজন।
আমি ভালো আছি, তোমার বাড়ির সকলকে সালাম ও স্নেহ দিবে।
আমার শুভেচ্ছা তোমার জন্য।

ইতি
তোমার বন্ধু
পার্থ।

By Airmail	Postage
From	To
Chima Areng Partha	Israt Jahan Keya
Sushang Durgapur	28,Link Road
P.O Haluyaghat	BlockB
Dist. Mymensing	Athens
Bangladesh	Greece

খ. নিমন্ত্রণপত্র বা আমন্ত্রণপত্র

সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সাদর আমন্ত্রণ বা অনুরোধজ্ঞাপক পত্রই নিমন্ত্রণপত্র বা আমন্ত্রণপত্র। অনুষ্ঠানে ভোজের ব্যবস্থাদি না থাকলে এ ধরনের অনুরোধপত্রকে নিমন্ত্রণপত্র না বলে আমন্ত্রণপত্র বলাই সঙ্গত।

নিমন্ত্রণপত্রের নানা উপলক্ষ থাকতে পারে :

১. **পারিবারিক নিমন্ত্রণপত্র :** জন্মদিন, বিবাহ, মৃত্যুবার্ষিকী, সুন্নতে খাতনা ইত্যাদি উপলক্ষে।

২. **বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র :** রবীন্দ্র-জয়ন্তী, নজরুল-জয়ন্তী, রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী ইত্যাদি উপলক্ষে।

৩. **জাতীয় দিবাসদি পালনের আমন্ত্রণ :** স্বাধীনতা দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি দিবস, মে দিবস, বিজয় দিবস, পহেলা বৈশাখ ইত্যাদি উপলক্ষে।

৪. **শিক্ষা-সংস্কৃতি-ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র :** সাংস্কৃতিক সপ্তাহ, শিক্ষা সপ্তাহ, বিজ্ঞানী প্রদর্শনী, বইমেলা, বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ইত্যাদি উপলক্ষে।

৫. **বিবিধ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র :** কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে শোকসভা, কোনো প্রতিষ্ঠানে রজত, সুবর্ণ বা হীরক জয়ন্তী, সমাবর্তন, পুনর্মিলনী, লোক উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠান উপলক্ষে।

নিমন্ত্রণপত্রের আঙ্গিকগত কাঠামো

বিভিন্ন ধরনের নিমন্ত্রণপত্র বা আমন্ত্রণপত্রের কাঠামো স্বতন্ত্র এবং যুগের চাহিদা মতো ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। একুশ শতকের প্রথম দশকে প্রচলিত আমন্ত্রণপত্রের আঙ্গিক কাঠামো নিম্নরূপ :

১. **শিরোনাম :** শুরুতেই উপরে, মাঝখানে পত্রের শিরোনাম দেওয়া হয়। সাধারণ নিমন্ত্রণপত্র ছাপানো হয়। তাই শিরোনাম একটু বড়, ভিন্ন ফন্টে ও ভিন্ন রঙের কালিতে লেখা হয়। অনেক সময় শিরোনাম বোল্ড করা হয়। পত্র-শিরোনাম আকর্ষণীয়, সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। যেমন :

বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : ২০১৪

২. **নিমন্ত্রণদাতা বা আমন্ত্রণদাতা :** নিমন্ত্রণপত্রের নিমন্ত্রণদাতা হয়ে থাকেন কোনো ব্যক্তিবিশেষ। যেমন–কারো বিয়ে উলক্ষে নিমন্ত্রণপত্রের নিমন্ত্রণদাতা হবেন বর বা কনের বাবা-মা; কিন্তু আমন্ত্রণপত্রের আমন্ত্রণদাতার ব্যক্তি পরিচয় ছাড়াও থাকে একটি পদবাচক প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়। যেমন : কলেজে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রের লেখক হন ওই কলেজের ছাত্র-সংসদের সাংস্কৃতিক সম্পাদক, কলেজে ছাত্রসংসদ না থাকলে আমন্ত্রণদাতা হন ওই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন উপলক্ষে গঠিত কমিটির আহবায়ক, সংগঠনের ক্ষেত্রে আমন্ত্রণদাতা হন যৌথভাবে ওই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

৩. **সম্ভাষণ :** আমন্ত্রণপত্রের প্রাপককে সম্ভাষণ করা হয় বর্তমানে 'সুধী' শব্দটির মাধ্যমে। অবশ্য সর্বাধিক ব্যবহৃত 'জনাব' শব্দের বহুল প্রচলন রয়েছে।

৪. **মূল পত্রাংশ :** নিমন্ত্রণপত্রের মূল অংশে তথ্যরাজির সমাবেশ থাকে। যেমন : অনুষ্ঠানটি

কী উপলক্ষে, অনুষ্ঠানটি কবে হবে, কোথায় হবে, কখন হবে, উদ্বোধক কে, সভাপতি কে, প্রধান অতিথি বা বিশেষ অতিথি হয়ে কে আসবেন, আলোচকবৃন্দের নাম–এসবের উল্লেখ করা হয়।

৫. **নাম স্বাক্ষর :** আমন্ত্রণকারী তার নাম লিখে থাকেন। পোশাকি নাম এবং নামের পুরো অংশ এখানে লিখতে হয়।

৬. **ঠিকানা:** নিমন্ত্রণকারীর পদবাচক পরিচয় উল্লেখ করতে হয়। যেমন :

অমিয় গোলদার
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
সরকারী গৌরনদী কলেজ
গৌরনদী
বরিশাল

৭. **অনুষ্ঠানসূচি :** অনুষ্ঠানসূচিতে অনুষ্ঠানমালার নাম ও তা অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ ও সময় উল্লেখ করা হয়। অনুষ্ঠানসূচিতে উল্লেখ করা সময়ের হেরফের হতেই পারে, তবে তা যেন না হয়, সে ব্যাপারে আয়োজককে সচেতন থাকতে হয়।

আমন্ত্রণপত্র বা নিমন্ত্রণপত্রের নমুনা

রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি আমন্ত্রণপত্র রচনা কর।

সরকারি চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম
২০শে বৈশাখ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ

সুধী,

আগামী ২৫শে বৈশাখ, ১৪২০, বঙ্গাব্দ বিকেল ৪.০০টায় সরকারি চট্টগ্রাম কলেজ মিলনায়তনে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন, বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক হরিশঙ্কর জলদাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. রায়হান কবির।

অনুষ্ঠানের আপনাদের উপস্থিতি প্রার্থনা করি।

নিবেদক–
অপূর্ব রায়
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
সরকারি চট্টগাম কলেজ
চট্টগ্রাম।

অনুষ্ঠানসূচি

৪: ০০ সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ
৪: ০৫ সাংস্কৃতিক সম্পাদকের স্বাগত বক্তব্য

৪: ১০ আলোচনা : 'আমি তোমাদেরই লোক'
৫: ০০ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে'
৬. ০০ প্রধান অতিথির বক্তৃব্য
৬: ২০ সভাপতির বক্তব্য

গ. ব্যবসা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত পত্র

অধুনা ব্যবসায় কোন নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ব্যবসায়ের পরিধি দেশ-দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। ফলে ব্যবসায় কার্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ আবশ্যক। পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ সহজ ও স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ। তাছাড়া এর মাধমে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে তথ্যের আদান-প্রদান, সম্পর্ক স্থাপন ও লেনদেনসহ ব্যবসায়িক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে।

সহজভাবে বলতে গেলে ব্যবসায় সংক্রান্ত লিখিত পত্রকে ব্যবসায়িক পত্র বলে। আরও একটু স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, এটি মূলত ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পত্রের আদান-প্রদানকে বোঝায়। এর সাধ্যমে ব্যবসায়িক লেদেনের সূত্রপাত, সম্প্রসারণ ও নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। অধ্যাপক জে. এইচ. হেনসনের মতে : ব্যবসায় সম্বন্ধীয় কোনো বিষয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে পারস্পরিকভাবে যে পত্র বিনিময় হয় তাকে ব্যবসায়িক পত্র বলে।

অর্থাৎ ব্যবসায়িক পত্র–

ক. ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়ে লিখিত হয়।
খ. দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আদান-প্রদান করা হয়।
গ. এর মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেনের সূচনা, সম্প্রসারণ ও নিষ্পত্তিতে সাহায্য করে।

ব্যবসায়/বাণিজ্যিক পত্রের কাঠামো বা বিভিন্ন অংশের নমুনা

১. শিরোনাম
মেসার্স আজাদ এন্ড সন্স
(কাপড় আমদানিকারক ও সরবরাহকারী)
২৬০ ইসলামপুর, ঢাকা। টেলিফোন : ৭৩৫০৯৫৭
২. তারিখ ২৭শে জুন, ২০১৪
৩. প্রাপকের ঠিকানা মেসার্স বশির ব্রাদার্স
সাহেব বাজার
রাজশাহী
৪. বিষয় শিরোনাম বিষয় : বিভিন্ন প্রকার কাপড় ক্রয়ের প্রস্তাব
৫. সম্বোধন মহোদয়/জনাব/প্রিয় জনাব/স্যার/মহাশয়/ভদ্র মহোদয়গণ,
.....
.....
.....

৭ বিদায় অভিবাদন
৮. প্রেরকের স্বাক্ষর
আপনার বিশ্বস্ত
.....
এম আজাদ
৯. সংযুক্তি (১) বিভিন্ন প্রকার কাপড়ের মূল্য তালিকা

ব্যবসায়িক পত্রের কাঠামো

ব্যবসায়িক পত্রের গঠন অন্যান্য পত্রের চেয়ে স্বতন্ত্র। এরূপ পত্র রচনায় কতকগুলো বিশেষ রীতি-নীতি মানতে হয়। রীতি-নীতি পত্রের বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়ন করে এবং পত্রকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলে। তাই ব্যবসায়িক পত্র রচনায় সুনির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ করতে হয়। নিচে ব্যবসায়িক পত্রের নমুনা রূপ ও বিভিন্ন অংশগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো:

ব্যবসায়িক পত্রের অংশের বর্ণনা

১. **শিরোনাম :** ব্যবসায়িক পত্রের উপরিভাগে প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন প্রভৃতি লিপিবদ্ধ থাকে। এ অংশকে পত্রের শিরোনাম বলে। সাধারণত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্যাডে উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাপানো থাকে।

২. **তারিখ :** ব্যবসায়ের পত্রে তারিখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিরোনামের নিচে ডান পাশে বা বাম পাশে তারিখ দেওয়া হয়।

৩. **প্রাপকের ঠিকানা :** পত্রের বাম পাশে তারিখের নিচে প্রাপকের নাম ও ঠিকানা লেখা হয়। কোনো ব্যক্তির বাংলা নামের পূর্বে লিঙ্গ ভেদে জনাব/বেগম; শ্রীযুক্ত/শ্রীযুক্তা এবং ইংরেজি নামের আগে Mr বা Ms./Mrs. প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়।

৪. **বিষয় শিরোনাম :** বিষয় শিরোনাম পত্রের মূল বক্তব্যের সার সংক্ষেপে। এ অংশ দ্বারা প্রাপক একনজরে পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা নিতে পারে।

৫. **সম্বোধন :** বিষয় শিরোনামের নিচে বা অভিবাদনসূচক শব্দ বা শব্দাবলি ব্যবহার করা হয়। মূল বক্তব্য আরম্ভের প্রাক্কালে অভিবাদন জ্ঞাপন করা শিষ্টাচার। নানা প্রকার অভিবাদনের প্রচলন রয়েছে, যেসব–মহোদয়, জনাব, মহাশয়, মহাত্মন, সুধী ইত্যাদি।

৬. **মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু :** বিষয়বস্তু বা মূল বক্তব্য পত্রের প্রাণস্বরূপ। বিষয়বস্তু সম্বোধনের নিচে বাম পাশে মার্জিন থেকে শুরু করতে হয়। পত্রের বিষয়বস্তুকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়। প্রথম অংশ বিষয়বস্তুর সূচনা উপস্থাপন করা যেতে পারে। দ্বিতীয় অংশে পত্রের মূল বক্তব্য বিষয় সহজ সরল ও সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়। তৃতীয় ও শেষ প্যারায় প্রেরক পত্রের মূল বক্তব্যের জের টানে এবং প্রাপক কী কী ব্যবস্থা নিতে পারে তার ইঙ্গিত প্রদান করে। অতঃপর ধন্যবাদান্তে পত্রটি শেষ করে।

৭. **বিদায় অভিবাদন :** মূল বক্তব্য লেখার পর বিদায় অভিবাদন লেখার নিয়ম রয়েছে। পত্রের বিদায় ভাষণ প্রারম্ভিক সম্বোধনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আপনার বিশ্বস্ত, বিনীত, আপনার অনুগত ইত্যাদি বিদায় অভিবাদনের উদাহরণ।

৮. **প্রেরকের স্বাক্ষর :** বিদায় অভিবাদনের নিচের পত্র লেখকের তার স্বাক্ষর প্রদান করতে হয়। পত্রের বৈধতার জন্য লেখকের স্বাক্ষর অত্যাবশ্যক। স্বাক্ষরবিহীন পত্রের কোনো মূল্য দেওয়া হয় না এবং এর আইনগত বৈধতা নেই।

৯. **সংযুক্তি :** ব্যবসায়িক পত্রের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত কোনো প্রকার প্রামাণ্য দলিল সংযোজন করা হলে তা সংযুক্তি হিসেবে পত্রের সর্বনিম্ন উল্লেখ করা হয়।

ব্যবসায়িক পত্রের প্রকারভেদ

লেনদেন ধরন, বিষয়বস্তু, চাহিদা ইত্যাদির ভিত্তিতে ব্যবসায় পত্র বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। নিচে কয়েকটি ব্যবসায় পত্রের নাম উল্লেখ করা হলো :

১. চাকরির আবেদন, সাক্ষাৎকার, নিয়োগ ও যোগাযোগপত্র
২. সুপারিশ ও পরিচয়পত্র
৩. প্রচারপত্র
৪. তথ্যানুসন্ধান পত্র
৫. যোগ্যতা অনুসন্ধান পত্র
৬. বিক্রয় প্রস্তাব, দর উল্লেখ ও ফরমায়েশ পত্র
৭. অভিযোগ, দাবি ও মীমাংসা পত্র
৮. তাগাদা ও পাওনা আদায় পত্র
৯. আমদানি ও রপ্তানি বিষয়ক পত্র
১০. ব্যাংকিং ও বিমা পত্র।

বাণিজ্যিক পত্রের নমুনা

কোনো পুস্তক প্রকাশকের কাছে ভি.পি. ডাকযোগে পুস্তক সরবরাহের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লেখ।

আমলা পাড়া জামালপুর
২৬শে জুলাই, ২০১৪
ব্যবস্থাপক
চিরায়ত বই ঘর
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা
বিষয় : ভি পি পি ডাকযোগে বই প্রেরণ প্রসঙ্গে
মহোদয়,
শুভেচ্ছা নেবেন।
নিচের তালিকাভুক্ত বইগুলো আমাদের কলেজ গ্রন্থাগারের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু স্থানীয় বাজারে বইগুলো পাওয়া যাচ্ছে না। আপনাদের প্রকাশিত এসব বই যদি যথাসম্ভব বেশি কমিশন প্রদান করে ভি পি পি ডাকযোগে আমার/কলেজের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন, তাহলে উপকৃত হবো। এই সঙ্গে অগ্রিম বাবদ ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা মনি-অর্ডার করে পাঠালাম। বই গ্রহণ করার সময় বাকি টাকা পরিশোধ করা হবে।

আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি।
ধন্যবাদান্তে
পূর্ণচন্দ্র ত্রিপুরা
গ্রন্থাগারিক
রাঙামাটি আদর্শ কলেজ
রাঙামাটি
বইয়ের তালিকা :

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
১.	মৈমনসিংহ গীতিকা	দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত
২.	বাঙ্গালা ব্যাকরণ	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
৩.	মধ্যযুগের গীতিকবিতা	মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত
৪.	সংস্কৃতি ভাবনা	আহমদ শরীফ
৫.	মুঠোফোনের কাব্য	নির্মলেন্দু গুণ
৬.	জোছনা ও জননীর গল্প	হুমায়ূন আহমেদ
৭.	নিরালোক দিব্যরথ	শামসুর রাহমান
৮.	উপন্যাস সমগ্র	শামসুর রাহমান
৯.	পূর্ব-পশ্চিম (২য় খণ্ড)	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
১০.	প্রথম আলো (২য় খণ্ড)	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
১১.	কালবেলা	সমরেশ মজুমদার
১২.	কালপুরুষ	সমরেশ মজুমদার
১৩.	উত্তরাধিকার	সমরেশ মজুমদার
১৪.	খোয়াবনামা	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
১৫.	শাম্ব	সমরেশ বসু
১৬.	গঙ্গা	সমরেশ বসু
১৭.	মা	ম্যাক্সিক গোর্কি
১৮.	আমার বন্ধু রাশেদ	মুহম্মদ জাফর ইকবাল
১৯.	ব্যবহারিক বাংলা অভিধান	বাংলা একাডেমি প্রকাশিত
২০.	বাঁধ ভেঙ্গে দাও	সুনীল বরণ দে

খ. ছুটি ও অন্যান্য আবেদনপত্র

ব্যক্তি যখন কোনো প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো দাবি-দাওয়া, অনুমতি বা কোনো সমস্যা নিরসনে দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি লেখেন, তখন তাকে আবেদনপত্র বলে। শিক্ষা সফরে যাওয়ার জন্য, বিনা বেতনে পড়ার জন্য অধ্যক্ষের কাছে লেখা চিঠি যেমন আবেদনপত্র, তেমনি এলাকার সন্ত্রাস নির্মূলে স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে লেখা চিঠি আবেদনপত্র হিসেবে বিবেচিত, অনুরূপভাবে পৌরসভার চেয়ারম্যান বা সিটি

কর্পোরেশনের মেয়রের কাছে এলাকার সমস্যার কথা জানিয়ে রচিত চিঠিও আবেদনপত্র হিসেবেই গ্রহণযোগ্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এ ধরনের পত্রে সম্বোধনে 'জনাব' লেখা অনুচিত। কারণ 'জনাব' হলো Mr.। লিখতে হবে 'মহোদয়'। বাংলা ভাষায় 'মহোদয়'ই ইংরেজিতে Sir.

আবেদনপত্রের আঙ্গিক গঠন

সাধারণত আবেদনপত্রে ৭টি অংশ থাকে। ধারাবাহিকভাবে নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো:

১. **স্থান ও তারিখ :** সবার উপরে স্থান ও তারিখ লিখতে হবে। যেমন :
শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার
২৭শে জুলাই, ২০১৪।

২. **পত্র-প্রাপকের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় :** যার কাছে আবেদন করা হচ্ছে, তার প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় এ পর্যায়ে তুলে ধরতে হবে। যেমন :
অধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ
মিরপুর, ঢাকা।

৩. **বিষয় :** আবেদনপত্রটি যে বিষয়ক, তা অতি সংক্ষেপে লিখতে হবে, যেন শিরোনাম দেখেই পত্র-প্রাপক পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা করতে পারেন। যেমন :
বিষয় : বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ প্রার্থনা।

৪. **সম্ভাষণ :** বর্তমানে সাধারণত 'মহোদয়' ব্যবহৃত হয়। 'জনাব' ব্যবহার করা উচিত নয়।

৫. **মূল পত্রাংশ :** দুটি অনুচ্ছেদে অল্পকথায় পুরো বক্তব্য প্রকাশ করতে হবে। প্রথম অনুচ্ছেদে মূল বক্তব্য বা সমস্যার প্রকৃতি তুলে ধরা হয় এবং দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে পত্র-লেখক তার অনুরোধ ব্যক্ত করেন। ভাষা হবে সহজ, সরল, শুদ্ধ ও পরিমিত।

৬. **বিদায় সম্ভাষণ :** বিদায় সম্ভাষণ হিসেবে পত্র-প্রাপকের কাছে সম্পর্কের ধরন অনুসারে আজকাল 'নিবেদক', 'বিনীত', 'আপনার অনুগত ছাত্র', 'আপনার বিশ্বস্ত' লেখা হয়।

৭. **নাম স্বাক্ষর :** এ পর্বে আবেদনকারী তার পূর্ণ নাম ও পরিচয়জ্ঞাপন করবে। আবেদনকারী যদি ছাত্র/ছাত্রী হয়, তাহলে তার নামের পাশাপাশি রোল, সেকশন, বর্ষ ইত্যাদি লিখতে হয়। যেমন :
সালাম রহমান
দ্বিতীয় বর্ষ
শাখা : বিজ্ঞান
সেকশন : সি
রোল : ৫২৪
নটরডেম কলেজ, ঢাকা

আবেদনপত্রের নমুনা

১. শিক্ষা সফরে যাবার অনুমতি ও আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়ে বিভাগীয় প্রধানের কাছে একটি আবেদনপত্র লেখ।

মিরপুর, ঢাকা
২ ডিসেম্বর, ২০১৪
সভাপতি
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
বিষয় : শিক্ষা সফরে যাবার অনুমতি ও আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন
মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন, প্রতিবারই আমাদের বিভাগের ৭ম সেমিস্টারে শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়। আমরা ময়নামতি ও শালবন বিহারে শিক্ষা সফরে যেতে ইচ্ছুক। ব্যয় নির্বাহের জন্য আমরা মাথাপিছু এক হাজার টাকা চাঁদা নির্ধারণ করেছি। এর চেয়ে বেশি চাঁদা দান আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। মাথাপিছু এক হাজার করে চাঁদা আদায় করা হলে মোট যে পরিমাণ অর্থ আদায় হবে, তা দিয়ে শিক্ষা সফরের সমুদয় ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব নয়। অন্তত আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা আমাদের প্রয়োজন। এই পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনি যদি আমাদের প্রদান করেন, তাহলে কেবল আমাদের পক্ষে শিক্ষা সফরে যাওয়া সম্ভব হবে।

অতএব, এমন পরিস্থিতিতে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধান করার কাজে দুজন পুরুষ শিক্ষক এবং দুইজন নারী শিক্ষক মনোনয়নের জন্য আপনার প্রতি আবেদন করছি।

আপনার অনুগত
৭ম সেমিস্টারের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সংযুক্তি

ক. শিক্ষাসফরে যেতে আগ্রহী ৩৮ জন ছাত্রছাত্রীর স্বাক্ষর।
খ. বাজেট পরিকল্পনার খসড়া।
গ. পছন্দের চারজন পুরুষ ও চারজন নারী শিক্ষকের নামের তালিকা।

৩. চাকরির আবেদনপত্র

বিজ্ঞাপিত কোনো পদে নিয়োগ প্রত্যাশা করে নিয়োগ-কর্তার কাছে চাকরি-প্রত্যাশী ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংবলিত চিঠিকে চাকরির দরখাস্ত বলা হয়।

চাকরির দরখাস্তের আঙ্গিক শর্তসমূহ

১. **স্থান ও তারিখ :** চাকরি প্রার্থী কোথা থেকে, কত তারিখে দরখাস্ত লিখেছে তা থাকতে হবে শুরুতে উপরে, বাম পাশে। যেমন :

নতুন বাজার, কুষ্টিয়া
২০শে জুন, ২০১৪

২. **প্রাপকের পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় :** নিয়োগ-কর্তার পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়, সেই সঙ্গে সংক্ষিপ্ত ঠিকানা (পূর্ণ ঠিকানা থাকবে খামের ওপরে) লিখতে হবে। যেমন :

প্রধান শিক্ষক
উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা
ঢাকা

৩. **বিষয় :** যে পদে আবেদন করা হয় তা উল্লেখ করে চাকরির দরখাস্ত বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে। যেমন :

বিষয় : প্রভাষক (বাংলা) পদে চাকরির দরখাস্ত।

৪. **সম্বোধন :** 'মহোদয়' লিখতে হবে। 'জনাব 'লেখা অনুচিত। কারণ, জনাব দিয়ে Mister বোঝায় আর মহোদয় দিয়ে Sir বোঝায়।

৫. **বিনয় প্রকাশ :** প্রতিপাদ্য বর্ণনার আগে শুরুতে বিনয় প্রকাশ করে 'সবিনয় নিবেদন', অথবা 'বিনয়ের সঙ্গে জানাচ্ছি যে', কিংবা 'যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে বিনয়ের সঙ্গে জানাচ্ছি যে' ইত্যাদি যে-কোনো একটি বাক্যাংশ অথবা অনুরূপ ভাব-প্রকাশক বাক্যাংশ দিয়ে দরখাস্ত শুরু করতে হয়।

৬. **সূত্র উল্লেখ:** বিনয় প্রকাশের পরপরই সূত্র উল্লেখ করতে হয়। আবেদনকারীকে উল্লেখ করতে হয় সে কী সূত্রে এই তথ্য জ্ঞাত হয়েছে যে, এই প্রতিষ্ঠানে লোক নিয়োগ করা হবে । যেমন :

গত ২০শে জুলাই, ২০১৪ খ্রি. 'দৈনিক মহাকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি থেকে অবগত হলাম, আপনার অধীনে 'সহকারী শিক্ষক' পদে নিয়োগ প্রদান করা হবে।

৭. **আবশ্যিক তথ্যরাশি :** আবেদনকারীর যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত প্রদান করতে হবে। এর ভেতর রয়েছে :

১. আবেদনকারীর পূর্ণ নাম, ২. আবেদনকারীর পিতার নাম, ৩. আবেদনকারীর মাতার নাম, ৪. স্থায়ী ঠিকানা, ৫. বর্তমান ঠিকানা, ৬. জাতীয়তা, ৭. ধর্ম, ৮. বৈবাহিক অবস্থা, ৯. জন্মতারিখ, ১০. শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ : অর্জিত ডিগ্রিসমূহের নাম, এসব ডিগ্রি অর্জনের সাল, যে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জিত হয়েছে সে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম, প্রাপ্ত বিভাগ/ শ্রেণি/জিপিএ/সিজিপিএ সবই ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করতে হবে।

৮. **অভিজ্ঞতা :** কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে কোথা থেকে, কোন পদে, কত দিনের অভিজ্ঞতা আছে, তা উল্লেখ করতে হবে।

৯. **সংযুক্তি :** আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্যসমূহের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে এবং আনুষঙ্গিক পত্র হিসেবে যেসব কাগজ সংযুক্ত করা হয়েছে, তা ক্রমানুসারে উল্লেখ করতে হবে। সাধারণত এসব প্রামাণ্য কাগজপত্র নিম্নক্রমানুসারে সংযোগ করাই বিধিসম্মত :

ক. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদসমূহের এক কপি করে সত্যায়িত অনুলিপি, খ. নাগরিকত্বের সনদপত্র : এক কপি, গ. চরিত্রগত সনদপত্র: এক কপি, ঘ. সম্প্রতি তোলা চার কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, ঙ. বর্তমানে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের অনুমতিপত্র (কর্মরত থাকলে), চ. বর্তমানে কর্মরত প্রতিষ্ঠান-প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত অভিজ্ঞতার সনদপত্র (অভিজ্ঞতা থাকলে), ছ. পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট/ ট্রেজারি চালান/ পোস্টাল অর্ডার (যেটি দেওয়া হয়েছে, তার নাম) নম্বর।

১০. **খামের ওপর পদের নাম উল্লেখ :** খামের ওপরে প্রেরকের (আবেদনকারী) নাম, প্রাপক (নিয়োগ-কর্তা) ও ঠিকানা লেখা ছাড়াও ওপরে বড় করে পদের নাম উল্লেখ করতে হবে। যেমন :

বাংলা বিষয়ের প্রভাষক পদের জন্য আবেদন		ডাকটিকেট
প্রেরক	প্রাপক	
প্রদীপ গোমেজ	অধ্যক্ষ	
২/৬ তেজকুনিপাড়া	আদর্শ কলেজ	
তেজগাঁও	নয়ারহাট, সাভার	
ঢাকা ১২১৫।	ঢাকা ১৩৪২।	

চাকরির দরখাস্তের নমুনা

১৪. কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'সহকারী শিক্ষক' পদে নিয়োগের জন্য একটি আবেদনপত্র।

২০১, হাজী মুহম্মদ মুহসিন হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
২৮শে জুলাই, ২০১৪।

প্রধান শিক্ষক
আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ
মতিঝিল, ঢাকা।
বিষয় : 'সহকারী শিক্ষক' পদে চাকরির জন্য আবেদন

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন, গত ২৫শে জুলাই, ২০১৪ খ্রি, 'দৈনিক প্রভাতবেলা' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যম জানতে পেরেছি, আপনার স্কুলে 'সহকারী শিক্ষক' পদে কয়েকজন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। উক্ত পদে একজন আগ্রহী প্রার্থী হিসেবে আমার সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত আপনার সমীপে উপস্থাপন করা হলো।

অতএব, আপনার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করে, আমাকে আপনার স্কুলে 'সহকারী শিক্ষক' পদে নিয়োগ দান করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জ্ঞাপন করছি।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর :
(আসলাম খান)

সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত

নাম	: আসলাম খান
পিতার নাম	: সোবহান খান
মাতার নাম	: আফিফা খাতুন
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম : জহরের কান্দি, ডাকঘর : রামশীল, উপজেলা: মদন, জেলা : নেত্রকোনা
বর্তমান ঠিকানা	: ২০১, হাজী মুহম্মদ মুহসিন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
জাতীয়তা	: বাংলাদেশি
ধর্ম	: ইসলাম
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
জন্মতারিখ	: ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ খ্রি.

শিক্ষাগত যোগ্যতা

পরীক্ষার নাম	পাশের সাল	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়	জিপিএ/সিজিপিএ
এস.এস.সি.	২০০৪	যশোর বোর্ড	৫.০০
এইচ.এস.সি.	২০০৬	যশোর বোর্ড	৫.০০
বি.এ.অনার্স (ইংরেজি)	২০১০	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৩.৭৫
এম.এ. (ইংরেজি)	২০১১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৩.৭৫
বি.এড.	২০১২	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	৩.৬০
এম.এড.	২০১৩	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	৩.৮০

অভিজ্ঞতা : ৫ই জানুয়ারি, ২০১৩ খ্রি. থেকে একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা পরিচালিত মাধ্যমিক স্কুলে 'সহকারী শিক্ষক' হিসেবে কর্মরত আছি।

স্বাক্ষর :

(আসলাম খান)

সংযুক্তি :

ক. সকল পরীক্ষা পাসের সনদপত্রসমূহের সত্যায়িত অনুলিপি : ১ কপি করে
খ. নাগরিকত্বের সনদপত্র : ১ কপি
গ. চরিত্রগত সনদ পত্র : ১ কপি

ঘ. সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রঙিন ছবি : ৪ কপি
ঙ. বর্তমানে কর্মরত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান থেকে প্রাপ্ত অনুমতিপত্র
চ. বর্তমানে কর্মরত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত অভিজ্ঞতার সনদপত্র
ছ. পে-অর্ডার নম্বরে জে ০৯০৪৩

চ. স্মারকলিপির ও মানপত্র

স্মারকলিপি

বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তির শুভাগমন উপলক্ষে স্মারকলিপি পাঠ করে শোনানোর পর তাঁকে প্রদান করা হয়। মানপত্রের সঙ্গে স্মারকলিপির পার্থক্য এই, মানপত্রে দাবি-দাওয়া থাকে না, স্মারকলিপিতে থাকে। কোনো ক্ষমতাধর ব্যক্তির আগমনে ওই ব্যক্তির সম্মাননা প্রদান করে তাঁর কাছে উত্থাপিত দাবি-সংবলিত যে অভিজ্ঞানপত্র প্রদান করা হয়, তাকে স্মারকলিপি বলে। মানপত্রে সংবর্ধেয় ব্যক্তিকে উদ্দিষ্ট করে প্রশংসাবাণীই লক্ষ্য, স্মারকলিপিতে সংবর্ধেয় ব্যক্তির গুণকীর্তন উপলক্ষ মাত্র, মূল লক্ষ্য দাবি-দাওয়া উত্থাপন করে সমষ্টিগত কার্যোদ্ধার করা।

স্মারকলিপির আঙ্গিক

স্মারকলিপি সাধারণত ৪টি অংশে বিভক্ত। যেমন : শিরোনাম, মূল অংশ, তারিখ এবং স্মারকলিপি প্রদানকারী সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নাম।

১. **শিরোনাম :** কোথা থেকে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সমীপে স্মারলিপি প্রদান করা হচ্ছে, তার পরিচয়জ্ঞাপক অংশটিই শিরোনাম হিসেবে বিবেচ্য। তুলনামূলকভাবে একটু বড় ফন্টে শিরোনাম লিখতে হয়। স্মারকলিপির শিরোনাম সচরাচর দীর্ঘ হয়, তাই একাধিক লাইনে বিন্যস্ত করাই যুক্তিসঙ্গত। যেমন :

কিশোগঞ্জ গুরুদয়াল সরকারি কলেজের সমস্যাবলি সমাধানকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সমীপে স্মারকলিপি

২. **মূল অংশ :** স্মারকলিপির মূল অংশে দুটি ভিন্ন বিষয়ের সমন্বয় করা হয়। প্রথমে একাধিক অনুচ্ছেদে স্মারকলিপির উদ্দিষ্ট ব্যক্তির গুণকীর্তন করা হয়। আবেগমথিত, অলংকারসমৃদ্ধ ভাষায় বরেণ্য ব্যক্তির জীবনাদর্শ, কর্মময় জীবনের পরিধি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে তাঁর ভূমিকা ও অবদান সপ্রশংস ভাষায় বর্ণিত হয়। এর পরে বিশিষ্ট ব্যক্তির সমীপে যুক্তিসম্মত দাবিসমূহ বিনীত ও মার্জিত ভাষায় উপস্থাপন করা যায়। দাবিনির্ভর অংশটি ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যাক্রমে (১, ২, ৩, ...) লেখা যায়, আবার এক বা একাধিক অনুচ্ছেদেও লেখা যায়।

৩. **তারিখ :** স্মারকলিপির শেষে বাম পাশে তারিখ উল্লেখ করা হয়।

৪. **স্মারকলিপি প্রদানকারী সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নাম :** স্মারকলিপির শেষে ডান পাশে স্মারকলিপি প্রদানকারী সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করতে হয়। যেমন :

বিনীত
আপনার গুণমুগ্ধ

ছাত্রছাত্রী
রামপাল কলেজ
বাগেরহাট।

স্মারকলিপির নমুনা

১. কলেজের সমস্যাবলি সমাধানকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সমীপে স্মারকলিপি।

রংপুর কারমাইকেল কলেজের সমস্যাবলি সমাধানকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সমীপে স্মারকলিপি

হে শিক্ষাচার্য,
উত্তর জনপদে শিক্ষা বিস্তারের জন্য নানা পদক্ষেপ নেবার জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাই। বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, দুর্নীতি প্রতিরোধ, বেসরকারি শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান ইত্যাদি পদক্ষেপ আপনি নিয়েছেন। সর্বমহলে এ উদ্যোগে প্রশংসিত হয়েছে। এজন্য আপনাকে আবারো অভিনন্দন।

হে শিক্ষানুরাগী,
উত্তরাঞ্চলের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কারমাইকেল কলেজ, দীর্ঘদিন ধরে এ অঞ্চলে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে চলেছে। এ বিদ্যাপীঠে একাদশ–দ্বাদশ থেকে বি.এ. পাস, অনার্স ও এম.এ. পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। শিক্ষার আলোকবর্তিকা নিয়ে কলেজ এগিয়ে গেলেও এ সরকারি কলেজে অজস্র রয়েছে, যা জরুরি ভিত্তিতে সমাধান করা দরকার। আপনার সমীপে আমাদের দাবিগুলো উল্লেখ করা হলো :

১. প্রতিটি বিভাগে নতুন শিক্ষক;
২. বিজ্ঞান ও কলা অনুষদের জন্য পৃথক ভবন নির্মাণ;
৩. লাইব্রেরিতে অতিরিক্ত নতুন গ্রন্থ;
৪. বিজ্ঞান ল্যাবরেটরিতে আরো যন্ত্রপাতি সরবরাহ;
৫. ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অন্তত ৩টি হল নির্মাণ; এবং
৬. একটি জিমনেসিয়াম প্রতিষ্ঠা।

আশা করি সরকারের শিক্ষা উন্নয়ন বিভাগের সাহায্যে আমাদের কলেজের এ সমস্যাগুলো সমাধানে আপনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন। আপনার জীবন কর্মময় হোক, সফল হোক। আপনার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

বিনীত
আপনার গুণমুগ্ধ
রংপুর কারমাইকেল কলেজের
ছাত্রছাত্রী
২২ জুন, ২০১৪

মানপত্র
পত্রকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–দাপ্তরিক পত্র ও ব্যক্তিগত পত্র। কিন্তু মানপত্র দাপ্তরিক বা ব্যক্তিগত পত্রের পর্যায়ে পড়ে না। মানপত্রকে সামাজিক পত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

যখন কোনো ব্যক্তিকে কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে বা আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা অথবা বিদায় সংবর্ধনা প্রদানের জন্য অভিনন্দন–শ্রদ্ধাজ্ঞাপনপূর্বক পত্র প্রদান করা হয় তাকে মানপত্র, সংবর্ধনা পত্র বা সংবর্ধনা স্মারক বলে। মানপত্রকে শ্রদ্ধাঞ্জলি, অভিনন্দনপত্র নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মানপত্রকে চিঠির পর্যায়ে ফেলা যায় না। চিঠি সাধারণত ডাকযোগে বা লোক মারফৎ পাঠানো হয়। কিন্তু মানপত্র প্রাপকের উপস্থিতিতে পাঠ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনপূর্বক আড়ম্বরপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে অর্পণ করা হয়। আবার, মানপত্র কোনো ব্যক্তি সংবর্ধিত ব্যক্তিকে প্রদান করে না। সাধারণত কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার পক্ষ থেকে বরণ বা বিদায় উপলক্ষে প্রদান করা হয়ে থাকে।

সংস্থার বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একজনকে মানপত্র লেখার দায়িত্ব দেওয়া হলেও মানপত্র রচনার পর তা সকলে মিলে সংশোধন, সংযোজন বা পরিমার্জন করে সুন্দর হস্তাক্ষরে বা আধুনিক কম্পিউটারে কম্পোজ করে, অলংকৃত করে সুদৃশ্য ফ্রেমে লেমেনেশনসহ বাঁধাই করে একটি নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মানপত্র পাঠ করা হয়, পরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

উপরে উল্লিখিত হয়েছে দুই ধরনের উদ্দেশ্যে মানপত্র রচিত হয়। এ কারণে মানপত্রকে আমরা দুটি শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি। যথা : (১) বরণ সংবর্ধনাসূচক মানপত্র, ও (২) বিদায়ী সংবর্ধনাসূচক মানপত্র।

১. **বরণ সংবর্ধনাসূচক মানপত্র :** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কার্য উপলক্ষে সম্পৃক্ত নবাগত কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করার জন্য সংবর্ধনাসূলক মানপত্র রচনা করা হয়। এ ধরনের মানপত্রে সংবর্ধিত ব্যক্তিকে স্বাগত জানানো হয়। তাঁর কর্মকৃতি, দক্ষতা, সততা, নিষ্ঠা ও মানবিক গুণাবলির অভূতপূর্ব প্রশংসা করা হয়। গুণী ব্যক্তির বিশেষ কৃতিত্ব বা ভূমিকার জন্য শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোই এ ধরনের মানপত্রের উদ্দেশ্য। এ মানপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ফুল দিয়ে বরণ করা ও কিছু সৌজন্য উপহার দেওয়ার প্রচলন রয়েছে।

২. **বিদায় সংবর্ধনামূলক মানপত্র :** কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কাজ শেষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যখন অন্যত্র বদলি বা অবসর গ্রহণ করেন তখন সেই প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এ ধরনের মানপত্র রচিত হয়। বিদায় সংবর্ধনা মানপত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তাঁর কর্মকৃতি, ব্যক্তিত্ব ও অবদানের জন্য ভূয়শী প্রশংসাসহ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ কথা সত্য, অনেক ক্ষেত্রে কৃত্রিম করে হলেও প্রশংসাসূচক অতিরঞ্জন এ ধরনের মানপত্রে লক্ষ করা যায়।

মানপত্র সুদৃশ্য কাগজে মলাটসহ বাঁধিয়ে বিদায়ী ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয় এবং কিছু সৌজন্য উপহার দেওয়া হয়। এ ধরনের বিদায় অনুষ্ঠান, বিশেষ করে অবসরজনিত বিদায়ে জায়নামাজ, পবিত্র কোরআন শরিফ বা বিশ্বখ্যাত ক্ল্যাসিকেল সাহিত্যকর্ম, মনীষীর জীবনী, কলম, ঘড়ি, ছাতা, উত্তরীয় উপহার দেওয়া হয়।

মানপত্রের আঙ্গিক

মানপত্রের সাধারণত চারটি অংশ থাকে। যেমন :

১. শিরোনাম, ২. মূল অংশ, ৩. তারিখ, এবং ৪. সম্মাননা প্রদানকারী সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নাম।

১. **শিরোনাম :** কোথা থেকে, কাকে, কী উপলক্ষে সম্মাননা জানানো হচ্ছে, তার পরিচয়জ্ঞাপক অংশকে শিরোনাম বলে। শিরোনাম তুলনামূলকভাবে একটু বড় ফন্টে লেখা বাঞ্ছনীয়। মানপত্রের শিরোনাম সাধারণত দীর্ঘ হয়ে থাকে বলে তা একাধিক লাইনে বিন্যস্ত করাই বিধেয়। যেমন :

বিদ্যাসাগর স্কুল অ্যান্ড কলেজের বাংলা বিষয়ের অধ্যাপক ড. সেলিমা আক্তারের বিদায় উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি

অথবা,

ঢাকা কলেজে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের আগমন উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য

২. **মূল অংশ :** মানপত্র একাধিক অনুচ্ছেদ থাকে। প্রতিটি অনুচ্ছেদের শুরুতে থাকে এক একটি আবেগমথিত সম্বোধন। যেমন : 'হে কর্মী পুরুষ', 'হে শিক্ষাব্রতী', 'হে বরেণ্য অতিথি', 'হে কর্মবীর' ইত্যাদি। প্রতিটি অনুচ্ছেদে ভিন্ন ভিন্ন গুণজ্ঞাপক অবদানের কথা বলা হয়। সম্বোধনে সাধারণত সর্বনামের সাধারণ রূপ (তুমি, তোমরা) ব্যবহৃত হয়। আন্তরিকতা প্রকাশের জন্যই এ-রকম 'তুমি' করে সম্বোধনের প্রথা অতীত কাল থেকে প্রচলিত, এবং এখনো চলমান।

৩. **তারিখ:** মানপত্রের শেষে বাম পাশে তারিখ উল্লেখ করতে হয়।

৪. **সম্মাননা প্রদানকারী সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নাম:** মানপত্রের শেষে বাম পাশে সম্মাননা প্রদানকারী সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করতে হয়। তবে তার আগে 'গুণমুগ্ধ', 'প্রীতিমুগ্ধ' ইত্যাদি লেখা শ্রেয়। যেমন :

গুণমুগ্ধ
শিক্ষার্থীবৃন্দ
নটরডেম কলেজ, ঢাকা।

লক্ষ রাখতে হবে, তারিখ এবং সম্মাননা প্রদানকারী সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নাম যেন এক মার্জিনে হয়।

মানপত্রের নমুনা

১. শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে সংবর্ধনা পত্র।

রাজশাহী কলেজের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের বিদায় উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে মহান শিক্ষক,

ঐতিহ্যবাহী এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক মহান দায়িত্বে নিয়ে আপনি এসেছিলেন প্রায় একযুগ আগে। তারপর বিগত দিনগুলোতে অকুণ্ঠ ত্যাগ, কঠোর শ্রম ও সাধনায় এ কলেজের ঐতিহ্যকে আরও গৌরবোজ্জ্বল, আরও সমুন্নত করেছেন। আজ অসংখ্য কর্মদিনের স্মৃতিচিহ্নিত এ উজ্জ্বল অঙ্গন ছেড়ে আপনি বিদায় নিচ্ছেন–এ আমাদের কাছে গভীর বেদনাবহ, খুবই মর্মস্পর্শী। আজ বিদায় বেলায় আপনাকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা।

হে কর্মবীর,

সুদীর্ঘ কর্মজীবনে নিষ্ঠা ও দক্ষতায় আমাদের মতো অসংখ্য ছাত্রকে আপনি ব্রতী করেছেন আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের এক মহৎ সাধনায়। উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন কঠিন শ্রমে, মহান কর্তব্য চেতনায়। সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুগ জীবনচর্চার দীক্ষা দিয়েছেন। নিরবচ্ছিন্ন আন্তরিকতার যে অবদান আপনি এখানে রেখে গেছেন তা তুলনারহিত।

হে শিক্ষানুরাগী,

আপনার কাছ থেকে আমরা পেয়েছি আলোচিত মানুষ হবার শিক্ষা। আমাদের সকল কাজে ও সমস্যা সমাধানে আপনার কাছ থেকে আমরা সর্বদা সঠিক, বিচক্ষণ ও বাস্তব দিক-নির্দেশনা পেয়েছি। কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য পেয়েছি অন্তরের দৃঢ় শক্তি। তাই আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় আপনি থাকবেন চির সমুজ্জ্বল হয়ে।

হে মহান,

আমাদের অস্থির আবেগকে আপনি প্রশ্রয় দেন নি। বরং আমাদের অসংযত আবেগোচ্ছ্বাসকে সংহত করায় প্রয়াসী হয়েছেন। স্নেহ, মমতা ও সাহচর্যে আপনি ছিলেন আমাদের সত্যিকারের সুহৃদ। আমাদের সৌভাগ্য এমন মহান ও উদার ব্যক্তিত্বের সাহচর্য আমরা পেয়েছি আমাদের জীবন সূচনালগ্নে। এ জন্যে আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। বিদায় মুহূর্তে আমাদের তারুণ্যপ্রসূত অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। অনাগত দিনগুলোর জন্য প্রার্থনা করি আপনার শুভাশিস।

হে বিদায়ী শিক্ষাবিদ,

আপনার প্রেরণা হয়ে থাক আমাদের চলার পাথেয়। আজ আনুষ্ঠানিক বিদায় মুহূর্তে আমাদের কামনা আপনি দীর্ঘজীবী হোন। সে জীবন হোক কর্মসফল, আনন্দঘন ও শান্তিময়।

আপনার গুণমুগ্ধ
ছাত্রছাত্রী
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী
৬ আগস্ট, রাজশাহী।

ছ. জনপ্রিয় বিষয় সম্পর্কে সংবাদপত্রে চিঠি
জনমত গঠনমূলক চিঠি

সংবাদপত্রের 'চিঠিপত্র' কলামে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে স্থানীয় সমস্যার স্বরূপ তুলে ধরে তার প্রতি যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস নতুন কোনো বিষয় নয়; কিন্তু সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনমত গঠন করার প্রয়াস অভিনব। বর্তমানে পত্রিকা জনতার মানসগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনমত গঠনমূলক চিঠিগুলো সচরাচর সমসাময়িক সমস্যাগুলোর ওপরে লেখা হয়। এসব চিঠিতে যেসব সমস্যার স্বরূপ তুলে ধরা হয়, তেমনি সমস্যার কারণসমূহ নির্দেশ করে অতঃপর সমস্যার সমাধানকল্পে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়, সে ব্যাপারে পত্র-লেখকের বিশেষজ্ঞ সুপারিশমালা প্রযুক্ত হয়।

সংবাদপত্রে জনমত গঠনমূলক পত্রটি আসলে দুটো চিঠি : প্রথম অংশে থাকে সম্পাদককে লেখা চিঠি প্রকাশের জন্য অনুরোধপত্র, দ্বিতীয় অংশটি হলো মূল চিঠি–যা পত্রিকায় ছাপানোর জন্য পাঠানো হয়।

ক. **সম্পাদককে লেখা পত্রাংশ :** সম্পাদককে সম্বোধন করে লেখা সংক্ষিপ্ত এ চিঠির গঠন নিম্নরূপ :

১. **পত্র-লেখকের ঠিকানা ও তারিখ :** পত্রলেখকের সংক্ষিপ্ত ঠিকানা (পূর্ণ ঠিকানা থাকবে পরে) ও তারিখ উল্লেখ করতে হবে। যেমন :

ফার্মগেট, ঢাকা
২৯শে আগস্ট, ২০১৪।

২. **সম্পাদকের ঠিকানা :** পত্রিকার সম্পাদকের যথার্থ ঠিকানা পূর্ণরূপে লিখতে হবে। যেমন;

সম্পাদক
দৈনিক মহাকাল
৯৯ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

৩. **বিষয় উল্লেখ :** চিঠির বিষয় হবে সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্পষ্ট। যেমন :

বিষয় : চিঠিপত্র বিভাগে চিঠি প্রকাশের অনুরোধ।

৪. **অনুরোধপত্র :** চিঠি প্রকাশের জন্য সম্পাদককে একটি সংক্ষিপ্ত অনুরোধপত্র লিখতে হবে।

৫. **পত্র-লেখকের পূর্ণ ঠিকানা :** প্রথম চিঠিটির শেষে পত্র-লেখকের পূর্ণ ঠিকানা দিতে হবে। যেমন :

স্বপন মাহাতো
গ্রাম ও ডাকঘর–সাহেবের হাট
জেলা–লালমনিরহাট।

খ. মূল চিঠি
মূল চিঠিটির গঠন নিম্নরূপ

১. **শিরোনাম :** চিঠির একটি আকর্ষণীয় শিরোনাম দিতে হয়। যেমন : চট্টগ্রামে রণক্ষেত্র।

২. **প্রেক্ষাপট বর্ণনা :** পত্র-লেখক যে বিষয়ে মতামত প্রদান করবেন, তার প্রেক্ষপট সংক্ষেপে বর্ণনা করবেন। সমাজ থেকে তিনি যদি দুর্নীতি তুলে দেওয়ার পক্ষে জনমত গঠন করতে চান, তাহলে দুর্নীতির দূষণজনিত কারণ তাকে তুলে ধরতে হবে।

৩. **সুপারিশমালা উপস্থাপন :** এ অংশটি জনমতগঠনমূলক চিঠির মূল অংশ। এ অংশে সংখ্যাক্রম অনুসারে (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮,) পত্র-লেখক মত তুলে ধরবেন। তিনি যদি যানজট সমাধানকল্পে জনমত গঠন করে চিঠি লিখতে চান, তাহলে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করলে যানজট সমস্যার সমাধান হবে, এ পর্যায়ে তাকে সুপারিশ আকারে তা তুলে ধরতে হবে। সুপারিশমালায় বেশি প্রস্তাবনা থাকলে উত্তম, তবে অন্তত পাঁচটি প্রস্তাবনা কমপক্ষে থাকা ভালো।

৪. **আশাবাদী বক্তব্য :** সুপারিশমালার শেষে পত্র-লেখকের আশাবাদী মনোভাব প্রকাশ করা বিধেয়। যেমন : তিনি বলতে পারেন, "উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো যদি গৃহীত হয়, তাহলে যানজট মুক্ত শহর গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে আশাবাদী।"

৫. **পত্র-লেখকের পূর্ণ ঠিকানা :** চিঠির শেষে পত্র-লেখকের পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করতে হয়। একটি চিঠির ভেতর যেহেতু দুটো চিঠি রয়েছে, তাই সম্পাদককে লেখা চিঠিতে পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করার পরেও আবার পূর্ণ ঠিকানা লিখতে হয়। কারণ, এ অংশটি পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠির ঠিকানা দলিলের মতো প্রমাণ হিসেবে নথিবদ্ধ থাকবে।

সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনমত গঠনমূলক কিছু নমুনা চিঠি
ডাকঘর স্থাপনের আবেদন জানিয়ে সংবাদপত্রে চিঠি।

ডোবামারি, ঝিনাইদহ
২০শে জুন, ২০১৪।
সম্পাদক
দৈনিক কালবেলা
১ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা ১২০৩।
বিষয় : চিঠিপত্র বিভাগে চিঠি প্রকাশের জন্য অনুরোধ
মহোদয়,

সশ্রদ্ধ অভিবাদন নেবেন। আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে প্রকাশের জন্য 'ডাকঘর চাই' শীর্ষক চিঠিটি এ সাথে প্রেরণ করছি।

এলাকাবাসীর বৃহত্তর স্বার্থে চিঠিটি প্রকাশের ব্যবস্থা করলে আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করব।

বিনীত
তানভীর হোসেন
ডোবামারি, ঝিনাইদহ।

ডাকঘর চাই

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার অন্তর্গত ডোবামারি গ্রামটি জেলার ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। জনবহুল এ গ্রামের তিন দিকে রয়েছে আরও ৪টি গ্রাম। সব মিলিয়ে লোকসংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। এর মধ্যে শুধু ডোবামারি গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। গ্রামগুলোতে মোট আটটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ বিদ্যালয়, একটি কোম্পানি সদরসহ দুটি বিডিআর ক্যাম্প, চল্লিশটির মতো এন.জি.ও. পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, অনেকগুলো এন.জি.ও. শাখা অফিস, বীমা অফিসসহ বিভিন্ন বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের কার্যালয় রয়েছে। সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত আছেন কয়েক শ কর্মকর্তা-কর্মচারী। এলাকার অনেক লোক দেশের বিভিন্ন এলাকায় ও বিদেশে চাকরি ও ব্যবসা করছেন। এখানকার অনেক ছাত্র-ছাত্রী দেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে।

দুঃখের বিষয়, এ অঞ্চলে কোনো ডাকঘর না থাকায় ডাক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এলাকাবাসী খুবই অসুবিধার মধ্যে রয়েছেন। এ গ্রামগুলো থেকে বিশেষ করে ডোবামারি থেকে নিকটবর্তী ডাকঘরের দূরত্ব প্রায় ১০ কিলোমিটার। ফলে চিঠিপত্র, মনি-অর্ডার ইত্যাদি পাঠাতে হলে ১০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়। অন্যদিকে, ডাকঘর থেকে গ্রামে চিঠিপত্র পাঠানোর জন্যে কোনো পিওন নেই বলে পরিচিত লোকজনের মাধ্যমে প্রাপকের হাতে চিঠি পৌঁছাতে দেরি হয়। পরিচিত লোক না পেলে চিঠি ডাকঘরেই পড়ে থাকে। অনেক সময় লোক মারফত পাঠানো চিঠি প্রাপকের হাতে পৌঁছেও না। আর মানি-অর্ডার পৌঁছাতে বেশ দেরি হয়।

এ প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথা ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আবেদন, ডোবামারি গ্রামে একটি ডাকঘর স্থাপন করে এ এলাকার জনগণের যোগাযোগ সুবিধা নিশ্চিত করুন।

এলাকাবাসীর পক্ষে
তানভীর হোসেন
ডোবামারি, ঝিনাইদহ

দাবিমূলক চিঠি

সংবাদপত্রের চিঠিপত্রের কলামে এলাকাবাসীর পক্ষে স্থানীয় সমস্যা তুলে ধরা এবং তার প্রতি যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার রীতি আকস্মিক বা নতুন বিষয় নয়। এটি বহু পুরনো ধারা। অনেক সময়েই এ ধরনের চিঠি প্রকাশের মাধ্যমে দ্রুত সমস্যার সমাধানও হয়ে থাকে। গণতন্ত্রের সুফল কিংবা আইনের সুশাসন আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবু অনেক অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনায় আমরা জর্জরিত । স্থানীয় প্রশাসন ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা ব্যস্ত থাকেন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে। তাদের আপন দায়িত্ব অবহেলা করতেও দেখা যায়। তাদের কর্ণকুহরে পৌঁছায় না জনতার হাহাকার ও ক্রন্দনরোল। ঠিক এমন মুহূর্তে এ-রকম চিঠি পত্রিকায় প্রকাশিত হলে কখনো তাদের টনক নড়ে। সামাজিক জীবনে এসব চিঠির অবদান তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সংবাদপত্রে দাবিমূলক পত্র একই সঙ্গে গ্রথিত দুটি চিঠি। এ চিঠির প্রথম অংশে থাকে সম্পাদককে লেখা চিঠি প্রকাশের জন্য অনুরোধপত্র, দ্বিতীয় অংশটি মূল চিঠি, যা পত্রিকায় ছাপানোর জন্য প্রেরণ করা হয়।

ক. **সম্পাদককে লেখা পত্রাংশ :** সম্পাদককে সম্বোধন করে লেখা সংক্ষিপ্ত এ চিঠির গঠন নিম্নরূপ ;

১. **পত্র-লেখক/ লেখকদের ঠিকানা ও তারিখ :** যিনি বা যারা চিঠি লেখেন, তার বা তাদের সংক্ষিপ্ত ঠিকানা (পূর্ণ ঠিকানা পরে থাকবে) ও তারিখ উল্লেখ করতে হবে। যেমন :

হোতাপাড়া, গাজিপুর
২রা সেপ্টেম্বর, ২০১৪।

২. **সম্পাদকের ঠিকানা :** যে পত্রিকার সম্পাদকের কাছে পত্র পাঠানো হয়, তার যথার্থ ও পূর্ণ ঠিকানা লিখতে হয়। যেমন :

সম্পাদক
দৈনিক সংবাদ
৩৬ পুরানা পল্টন
ঢাকা ১০০০।

৩. **বিষয় উল্লেখ :** কী বিষয় নিয়ে চিঠিটি লিখিত হয় এবং এর উদ্দেশ্য কী, তা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হয়। যেমন :

বিষয় : চিঠিপত্র বিভাগে চিঠি প্রকাশের অনুরোধ।

৪. **অনুরোধপত্র :** চিঠি প্রকাশের জন্য সম্পাদককে একটি সংক্ষিপ্ত অনুরোধপত্র লিখতে হয়। যেমন :

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় চিঠিপত্রের কলামে জনগুরুত্বসম্পন্ন চিঠি প্রকাশ করলে বাধিত হব।

৫. **পত্র-লেখক/লেখকদের পূর্ণ ঠিকানা :** প্রথম চিঠিটির শেষে থাকবে পত্র-লেখক/লেখকদের পূর্ণ ঠিকানা। যেমন :

সুশান্ত সেন
গ্রাম : রাজাপুর
ডাকঘর : মুক্তাগাছা
ময়মনসিংহ।

অনেক ক্ষেত্রে পত্র-লেখক/লেখকেরা তাদের নাম প্রকাশ করতে ভয় পান বা অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, সেক্ষেত্রে তারা ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। তবে সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠিতে পত্র-লেখকদের আসল নাম ও ঠিকানা লিখতে হয়। সম্পাদককে অনুরোধ করা হলে তিনি পত্রিকায় 'নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক' জুড়ে দেন, তাকে অনুরোধ করা হলে সম্পাদক প্রয়োজনে ছদ্মনাম ব্যবহার করেন।

খ. মূল চিঠি

মূল চিঠিটির গঠন নিম্নরূপ

১. **পত্র শিরোনাম :** প্রথমেই চিঠিটির একটি আকর্ষণীয় শিরোনাম দিতে হয়। যেমন:

শেরপুর-জামালপুর রাস্তার বেহাল দশা : এভাবে আর কতদিন ?

২. **সমস্যার স্বরূপ অঙ্কন :** মূল সমস্যা কী, কেন তার সমাধান প্রয়োজন–পত্র-লেখককে তার বিবরণ দিতে হবে।

৩. **একালাবাসীর অধিকার :** সমস্যার আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসা যে একান্ত প্রয়োজন, এবং এ বিষয়ে সরকারের ঘোষিত সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা আছে যা পত্রিকা বা রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে ভুক্তভোগীরা অবগত হয়েছে, তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই সেবা যে এলাকাবাসীর অধিকার, তা প্রমাণের মাধ্যমে দাবি দৃঢ়তর হয়।

৪. **জনপ্রতিনিধিদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা :** অনেক বার তাগিদ দেওয়ার পরেও স্থানীয় প্রশাসন বা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যে সমস্যাটির সুরাহা করতে সচেষ্ট হন নি, তা উল্লেখ করতে হয়।

৫. **আত্মপক্ষ সমর্থন ও আশাবাদ ব্যক্ত :** কোনোক্রমেই যখন আর কাজ হয় না, তখন নিতান্ত বাধ্য হয়েই যে পত্র-লেখক বা লেখকেরা পত্রিকার শরণাপন্ন হয়েছেন, মোটেই এটা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া নয়, তা উল্লেখ করে এই আশাবাদ ব্যক্ত করতে হবে, যাতে পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সমস্যাটির দ্রুত সমাধান করেন।

৬. **নাম ও ঠিকানা :** সমস্যার স্বরূপ অঙ্কনের প্রাক্কালে এলাকার বিশদ পরিচয় তুলে ধরতে হয়। যেমন :

আমরা নালিতাবাড়ি উপজেলার রামশীল ইউনিয়নের খাগবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা।

পত্র-লেখক/লেখকদের পূর্ণ ঠিকানা সম্পাদকের কাছে লেখা পত্রাংশে থাকার পরেও এ পর্যায়ে আবার লিখতে হয়।

ঠিকানা প্রদানের বিবিধ নমুনা :

ক. মো. আবু জাফর ও রাহেলা আক্তার
গ্রাম : সুবর্ণরেখা
ডাকঘর : কোদালধোয়া
উপজেলা : নালিতাবাড়ি
জেলা : শেরপুর।

খ. এলাকাবাসীর পক্ষে
মো. আবু জাফর ও রাহেলা আক্তার

গ. নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গ্রাম : সুবর্ণরেখা
ডাকঘর : কোদালধোয়া
উপজেলা : নালিতাবাড়ি
জেলা : শেরপুর।

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য কিছু দাবিমূলক চিঠির নমুনা

তোমার এলাকার ক্রমবর্ধমান ছিনতাইয়ের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি পত্র লেখ।

চম্পক নগর, রাঙামাটি
১৫ই জুলাই, ২০১৪।
সম্পাদক
দৈনিক অভিমত
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

বিষয় : **চিঠিপত্র কলামে চিঠি প্রকাশের অনুরোধ।**

জনাব,
'ছিনতাইকারী থেকে মুক্তি চাই' শিরোনামযুক্ত আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে জনস্বার্থে প্রকাশ করলে বাধিত থাকব।

ধন্যবাদসহ
হযরত আলি
লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর।

ছিনতাইকারী থেকে মুক্তি চাই

লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলার চম্পক নগর এলাকার বাসিন্দারা এখন কতিপয় ছিনতাইকারীর হাতে জিম্মি। তাদের জীবন এখন অনেকাংশে দুর্বিষহ। একদিকে স্থানীয় গুটি কয়েক তথাকথিত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ছত্রচ্ছায়ায় লালিত মাস্তানদের নিত্যনতুন আবদার, অন্যদিকে ছিনতাইকারীদের নিত্য হুঙ্কার-এর মধ্যে পিষ্ট এলাকার সাধারণ মানুষের জীবন। প্রতিদিনই কেনো-না-কোনো ব্যক্তি ছিনতাইয়ের শিকার হচ্ছে। ছিনতাইকারীদের কবলে পড়ে সর্বস্ব হারানো ব্যক্তিটি দৈহিকভাবেও নির্যাতিত হচ্ছে। কখনও কখনও নারীর সম্ভ্রমও লুণ্ঠিত হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসনকে এ ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে অবহিত করা সত্ত্বেও তাদের কাছ থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এটা তাদের অক্ষরতা নাকি নীরব সম্মতি তাও বোঝা ভার। সে যাই হোক, আমরা সবাই বাঁচতে চাই। কোনো আতঙ্কে না থেকে চাই নির্বিঘ্নে জীবনযাপন করতে। আর এ কারণেই উক্ত এলাকার নিরীহ জনতা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কৃপা প্রত্যাশা করছে। আশা করি, অচিরেই যথাযথ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করে এলাকাবাসীকে ছিনতাইকারীদের নগ্ন থাবা থেকে মুক্তি দেবেন।

এলাকাবাসীর পক্ষে
হযরত আলী
লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর।

সংলাপ রচনা

মৌখিক কথোপকথন বা বাক্যালাপকে সংলাপ (dialogue)বলে। ভাব-বিনিময় বা মতের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সংলাপ প্রয়োজন হয়। সংলাপ ব্যক্তি-চরিত্রকে প্রকাশ করে এবং কাহিনিকে গতিমান করে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়। শিক্ষাক্রমে যে সংলাপ রচনা করতে হয় তা প্রকৃতপক্ষে সংলাপের লিখিত রূপ। এতে দুই বা ততোধিক চরিত্রের কথোপকথন রচনা করতে হয়। এ ধরনের সংলাপ রচনার উদ্দেশ্য কোনো ধারণা বা অভিমত প্রকাশ করা। সংলাপ রচনার দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্য সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে চিন্তা-ভাবনাকে প্রকাশ করতে শেখা। সাধারণ কথাবার্তায় ব্যবহৃত ভাষা ব্যাকরণসম্মত না হলেও চলে। কিন্তু এ ধরনের সংলাপ রচনায় ভাষাকে ব্যাকরণসম্মত হতে হয়।

সংলাপ রচনার মাধ্যমে কোনো বিয়য় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক তুলে ধরা হয়। এর মাধ্যমে কোনো বিষয়ে মতভিন্নতা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়, এবং দুপক্ষের যুক্তি উপস্থাপন ও যুক্তি খণ্ডন করার দক্ষতা তৈরি হয়। অনেকের মতে, সংলাপ রচনা খুব সহজ বিষয়। কারণ প্রতিদিনই আমরা কথাবার্তা বলি। কিন্তু কথা বলা আর সংলাপ রচনা এক কথা নয়। সংলাপ রচনা, বিশেষ করে বাস্তবধর্মী সংলাপ রচনা সবার জন্য সহজ নয়। সৃজনশীল রচনার ক্ষেত্রে সংলাপ রচনা যথেষ্ট কুশলতার কাজ। এজন্য সতর্ক পরিকল্পনা থাকা অত্যাবশ্যক।

ব্যক্তিধর্মী সংলাপে বিষয়কে তুলে ধরা এবং সৃজনশীল সাহিত্যধর্মী সংলাপে কাহিনিকে এগিয়ে নেওয়া ও চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে উপযুক্ত সংলাপ বিশেষ ভূমিকা রাখে। ভবিষ্যতে যারা বিজ্ঞাপন কাজে যুক্ত হবে, গল্প-উপন্যাস লিখবে তাদের জন্য সংলাপ রচনার অভ্যাস বিশেষ কাজে লাগবে।

সংলাপ রচনার কলাকৌশল

সবার জন্য সংলাপ রচনা সহজ বিষয় নয়। সেজন্য অনুশীলন প্রয়োজন। প্রয়োজন কিছু কলাকৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা। সেক্ষেত্রে নিচের পদক্ষেপগুলো সহায়ক হতে পারে।

ক. সংলাপ ভালো হয় যদি তা স্বাভাবিকতার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়। সংলাপ রচনা অভ্যাস করার পূর্বে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে অন্যদের কথোপকথন শুনতে হবে। এতে মানুষ কীভাবে কথা বলে সে সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়।

খ. সংলাপ রচনার পূর্বে বিষয়টি ভালোভাবে ভেবে ও বুঝে নেওয়া অত্যাবশ্যক। তারপর উপযুক্ত চরিত্র কল্পনা করে নিয়ে স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ভেবে ঠিক করে নেওয়া ভালো।

গ. বক্তব্যধর্মী সংলাপে নীরস বিষয় আলোচিত হতে পারে। এ ধরনের সংলাপ একঘেয়ে বা বিরক্তিকর বক্তৃতায় পর্যবসিত না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। সংলাপকে প্রাণবন্ত করার লক্ষ্যে আবেগ, অনুভূতি, বিস্ময় ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশক শব্দ প্রয়োজন মতো ব্যবহার করা সঙ্গত। তবে এগুলোর অতিরিক্ত ব্যবহার ঘটানো যাবে না।

ঘ. সাহিত্যধর্মী সংলাপ যেন আকর্ষণীয় ও জীবন্ত হয় সেজন্য তা কাঠখোট্টা বা অপ্রয়োজনীয় অংশ যথাসম্ভব পরিহার করতে হয়। প্লটের জন্য অপরিহার্য নয় এমন সংলাপ বর্জনীয়।

ঙ. সাহিত্যধর্মী সংলাপ এমন হবে হতে যে সংলাপের চরিত্রগুলোকে বাস্তবের রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে হয়। সংলাপের মধ্যে তাই চরিত্রের ক্রিয়াও নির্দেশিত হতে পারে।

চ. সংলাপের শুরুতে একসঙ্গে কতকগুলো তথ্য দেওয়া উচিত নয়। সংলাপ যত এগুবে ততই ধীরে ধীরে যুক্ত হবে তথ্য। তথ্য এমনভাবে পরিবেশন করতে হবে যাতে তা স্বাভাবিকভাবে প্রসঙ্গক্রমে কথার পরে কথা হিসেবে আসে। তবে প্রতিটি বিষয় অনুপুঙ্খভাবে যে বলতে হবে এমন নয়। অনেক সময় বলা কথার মধ্যে অনেক না বলা কথা পাঠক বা শ্রোতা বুঝে নেয়।

ছ. সংলাপ রচনার সময় লক্ষ রাখতে হবে, সংলাপ হবে ছোট। একজনের দীর্ঘ সংলাপের মধ্যে অন্যজনের সংলাপ ঢুকিয়ে দিলে বড় সংলাপে ছেদ পড়ে এবং তা ছোট হয়ে আসে।

জ. কাল্পনিক চরিত্রের ভাব-ধারণা, অভিমত, যুক্তি ইত্যাদি ভেবে নিয়ে তা যৌক্তিকভাবে উপস্থাপনের ছক তৈরি করে নিতে হয়।

ঝ. সংলাপ রচনা সম্পূর্ণ হওয়ার পর তা যেন বাস্তব ও স্বতঃস্ফূর্ত ধরনের হয়। যেভাবে বাস্তব চরিত্র কথা বলে, তর্ক করে, মত প্রকাশ করে, যুক্তি উপস্থাপন করে–রচিত সংলাপ যেন তার অনুরূপ হয়।

ঞ. সংলাপে চরিত্রগুলোর কথোপকথন হবে একের পর এক। কোনো চরিত্র যেন একচেটিয়া প্রাধান্য না পায়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

ট. সংলাপের ভাষা এমন হওয়া উচিত যেন তার ভেতর দিয়ে চরিত্রের নৈতিকতা, শিক্ষার মান, সামাজিক বৈশিষ্ট্য, বয়স, লিঙ্গ, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়। কার সঙ্গে বক্তা কথা বলছে তার প্রভাবও তার সংলাপের ভাষায় পড়ে। বক্তা বিব্রত, উৎকণ্ঠিত, রাগান্বিত কিনা, সংলাপে তা ফুটে উঠতে হবে।

ঠ. সংলাপের শুরুটা হবে চমকপ্রদ ও নাটকীয়। তা যেন হঠাৎ করে শেষ না হয়।

ড. ইতিবাচক বক্তব্যের মধ্যদিয়ে সংলাপ শেষ হওয়া ভালো।

সংলাপ রচনার নমুনা

বক্তব্যধর্মী সংলাপ

সুখ

[বনের ধারে অন্ধকার রাত। চাঁদের ম্লান আলো। ছোট একটি কুঁড়েঘরের সামনে হাসু মিয়া ও রহমত গালে হাত দিয়ে ভাবছে।]

রহমত : কী তাজ্জব কথা, পাঁচ গ্রামে এক জনও সুখী মানুষ পেলাম না। যাকেই ধরি, সেই বলে, না ভাই, আমি সুখী নই।

হাসু : আর তো সময় নাই ভাই, এখন বারটা। সুখী মানুষ নাই, সুখী মানুষের জামাও নাই। মোড়ল তো তাহলে এবার মরবে।

রহমত : আহা রে, আমরা এখন কী করব! কোথায় একটা মানুষ পাব, যে কিনা...

হাসু : পাওয়া যাবে না। সুখী মানুষ পাওয়া যাবে না। সুখ বড় কঠিন জিনিস। এ দুনিয়াতে ধনী বলছে, আরও ধন দাও, ভিখারি বলছে, আরও ভিক্ষা দাও, পেটুক বলছে, আরও খাবার দাও। শুধু দাও আর দাও। সবাই অসুখী। কারও সুখ নেই।

রহমত : আমরাও বলছি, মোড়লের জন্য জামা দাও, আমাদের বখশিশ দাও। আমরাও অসুখী।

হাসু : চুপ চুপ ! ঘরের মধ্যে কে যেন কথা বলছে।

রহমত : ভূত নাকি ? চলেন, পালিয়ে যাই। ধরতে পারলে মাছ ভাজা করে খাবে।

হাসু : এই যে, ভাই। ঘরের মধ্যে কে কথা বলছ ? বেরিয়ে এস।

রহমত : ভূতকে ডাকবেন না।

[ঘর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এলো।]

লোক : তোমরা কে ভাই? কী চাও?

হাসু : আমরা খুব দুঃখী মানুষ। তুমি কে?

লোক : আমি একজন সুখী মানুষ।

হাসু : আঁ! তোমার কোনো দুঃখ নাই?

লোক : না। সারা দিন বনে বনে কাঠ কাটি। সেই কাঠ বাজারে বেচি। যা পাই, তাই দিয়ে চাল কিনি, ডাল কিনি। মনের সুখে খেয়ে দেয়ে গান গাইতে গাইতে শুয়ে পড়ি। এক ঘুমেই রাত কাবার।

হাসু : বনের মধ্যে একলা ঘরে তোমার ভয় করে না? যদি চোর আসে?

লোক : চোর আমার কী চুরি করবে?

হাসু : তোমার সোনাদানা, জামা জুতা?

[লোকটি প্রাণখোলা হাসি হাসছে।]

রহমত : হা হা করে পাগলের মতো হাসছ কেন ভাই!

লোক : তোমাদের কথা শুনে হাসছি। চোরকে তখন বলব, নিয়ে যাও, আমার যা কিছু আছে নিয়ে যাও।

হাসু : তুমি তাহলে সত্যিই সুখী মানুষ।

লোক : দুনিয়াতে আমার মতো সুখী কে? আমি সুখের রাজা। আমি মস্ত বড় বাদশা।

রহমত : ও বাদশা ভাই, তোমার গায়ের জামা কোথায়? ঘরের মধ্যে রেখেছ? তোমাকে একশ টাকা দেব। জামাটা নিয়ে এস।

লোক : জামা!

রহমত : জামা মানে জামা! এই যে, আমাদের এই জামার মতো জিনিস। তোমাকে পাঁচশ টাকা দেব। জামাটা নিয়ে এস, মোড়লের খুব কষ্ট হচ্ছে।

লোক : আমার তো কোনো জামা নাই ভাই!

হাসু : মিছে কথা বল না।

লোক : মিছে বলব কেন? আমার ঘরে কিছু নাই। সেই জন্যই তো আমি সুখী মানুষ।

[মমতাজ উদ্‌দীন আহমদের 'সুখী মানুষ' নাটিকার অংশবিশেষ]

বিচক্ষণধর্মী সংলাপ

বিচার

[খলিফা হারুন-অর-রশীদ নিজ অভ্যাস মতো উজিরের সাথে বেড়াতে বের হয়েছিলেন। পূর্ণিমা রাতে জোছনার আলোয় দেখলেন একস্থানে কতকগুলো বালক চাঁদের আলোয় বসে খেলা করছে। কৌতূহলী খলিফা সেখানে দাঁড়ালেন।]

বালক : ভাই ! চলো আজ আমরা আলী ও নাজিমের বিচার খেলি।

[বালকদের মধ্যে একজন আলী ও একজন নাজিম সাজল। একজন আলী সেজে একটি ভাঙা কলসিতে কতকগুলো মাটির ঢেলাপূর্ণ জলপাইয়ের কলসি তৈরি করল। বিচার আরম্ভ হলে আলী নালিশ করল। কাজি নাজিমকে হাজির করে জিজ্ঞেস করল–]

কাজি : আলী যা বলেছে তা কী সত্য?

নাজিম : হুজুর জলপাইয়ের কথা সত্য, তবে মোহরের কথা মিথ্যা।

কাজি : আচ্ছা কদিন আগে কলসিটি দিয়েছিল?

নাজিম : তা প্রায় দুই বছর হবে।

কাজি : বেশ, তখন কলসিতে কি এই জলপাই ছিল?

নাজিম : হ্যাঁ হুজুর ছিল। কিন্তু আমি তা ছুঁইনি।

কাজি : [একজন বালককে] যাও তো একজন জলপাই ব্যবসায়ী ডেকে নিয়ে এসো।

[একজন বালক জলপাই-ব্যবসায়ী সেজে কাজির সামনে এসে দাঁড়াল।]

কাজি : আচ্ছা জলপাই কতদিন পর্যন্ত ভালো থাকে বলো তো?

ব্যবসায়ী : যত্নে রাখলে বড়জোর ছয় মাস টাটকা থাকে।

কাজি : [কলসিটি দেখিয়ে] এই জলপাইগুলো দ্যাখো তো কত দিনের?

ব্যবসায়ী : [পরীক্ষার ভান করে] হুজুর, বেশি হলে এক মাস আগে এগুলো গাছ থেকে পাড়া হয়েছে।

কাজি : [নাজিমকে] সব তো শুনলে। তুমি ভীষণ মিথ্যাবাদী। নিশ্চয়ই তুমি কলসির ভিতরের মোহরগুলো নিয়ে নতুন জলপাই দিয়ে কলসিটি ভর্তি করে রেখেছিলে। অতএব এখনই আলীর মোহরগুলো ফিরিয়ে দাও। অন্যথায় তোমায় বন্দি করব।

[নাজিম তখন সব স্বীকার করে আলীর মোহরগুলো ফিরিয়ে দিল। বালকের বিচারক্ষমতা দেখে খলিফা ও উজির বিস্মিত হলেন এবং বালকদের অনেক পুরস্কার দিলেন।]

[আরব্য উপন্যাস 'কিশোর কাজি' অবলম্বনে]

ক্ষুদে গল্প লেখা

ক্ষুদে গল্প অর্থাৎ ক্ষুদ্র গল্প, যা ছোটগল্পের চেয়ে ছোট। আমরা প্রতিদিনই কথার প্রসঙ্গে গল্প বলি। আমরা যখন কাউকে কোনো ঘটনার কথা বলি কিংবা কোনো ঘটনার নিজের কোনো ভূমিকার কথা বলি তখন আমরা কিছু ঘটনার গল্প বলি। আমাদের চারপাশে প্রতিদিন যা ঘটে তার মধ্যেই গল্পের উপাদান তৈরি হয়। তা লেখার মধ্যদিয়ে তৈরি হয় গল্প লেখার কাজ।

গল্প গড়ে ওঠে প্রথমত কোনো কাহিনির ভিত্তিতে। কাহিনির সূচনায় তৈরি হয় গল্পের পটভূমি। তারপর তা বিস্তার লাভ করে এবং ধীরে ধীরে পরিসমাপ্তির দিকে অগ্রসর হয়।

গল্পের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক ঘটনাবিন্যাস। ক্ষুদে গল্পে ঘটনার বিস্তৃতির সুযোগ থাকে না। তাই স্বল্প বিস্তৃতির মধ্য দিয়ে লেখকের উপস্থাপনা নৈপুণ্যে এবং গুণ ও বিন্যাস দক্ষতায় তা রসমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

গল্পের তৃতীয় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য পরিবেশ রচনা। গল্পের ঘটনা কোথায় ঘটছে–শহরে না গ্রামে না পাহাড়ে–জঙ্গলে, বাড়িতে না রাস্তায়, শিল্পাঞ্চলে না পার্কে–যেখানেই ঘটুক না কেন সেই পরিবেশ রচনা ছাড়া গল্প বাস্তবের জীবনরসে সমৃদ্ধ হয় না।

গল্পের চতুর্থ দিক চরিত্র সৃষ্টি। চরিত্র এমনভাবে সৃষ্টি করতে হয় যেন তার মধ্যদিয়ে লেখকের চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

গল্পের পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ দিক সংলাপ। উপযুক্ত ও চমৎকার সংলাপ কাহিনিকে এগিয়ে নেয়, চরিত্রের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলে। এজন্য গল্পে প্রয়োজন মতো সংলাপের ব্যবহার করতে হয়। সংলাপের মধ্যদিয়ে চরিত্রের নিজস্বতা প্রকাশ পায়।

গল্পের ভাষার দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। ভাষা হতে হবে বিষয়নির্ভর, সহজ-সরল ও সাবলীল। কাহিনি বর্ণনার ভাষা ও সংলাপের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখতে হবে।

গল্প লেখার কলাকৌশল

ক. গল্প লেখা অভ্যাস করতে হলে সবার আগে মনোযোগ দিতে হবে চারপাশে। নিত্যদিনের মানুষের মাঝে কী ঘটছে তা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করতে হবে।

খ. গল্প লেখার আগে যে বিষয় বা কাহিনিসূত্র বা সংকেত অবলম্বন করে গল্প লিখতে হবে সে বিষয়ে মনে মনে কাহিনির একটা খসড়া অবয়ব দাঁড় করিয়ে নিতে হয়।

গ. উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণত তিন ধরনের গল্প লেখার অভ্যাস ও অনুশীলন করতে হয়। ক. বিষয়–সূত্র অবলম্বনে, খ. সংকেত–সূত্র অবলম্বনে, ও গ. নীতিবাক্য অবলম্বনে। এ ধরনের কাহিনি ছোট হয়। এতে সাধারণত উপকাহিনি থাকে না, চরিত্রসংখ্যাও সীমিত। তাই ক্ষুদে গল্প লেখার সময় কাহিনিকে জটিল না করাই ভালো।

ঘ. গল্পের চরিত্র যেন তাদের জীবনবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রবণতা, অভ্যাস অনুযায়ী কথা বলে। চরিত্রের ভাষা যেন গল্পকারের ভাষা হয়ে না দাঁড়ায়।

ঙ. গল্পের শুরু থেকে পাঠকের মনে কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে হয় যাতে গল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাঠক আগ্রহ নিয়ে গল্পটি পড়ে।

চ. গল্পের পরিবেশ রচনা করার জন্য ঘটনার জায়গা, সময়, আবহাওয়া, প্রাকৃতিক পরিবেষ্টন প্রভৃতি উল্লেখ করা প্রয়োজন।

গল্পের নমুনা

নিমগাছ

কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে।
পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ!
কেউবা ভাজছে গরম তেলে।
খোস দাদ হাজা চুলকানিতে লাগাবে।
চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।
কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে।
এমনি কাঁচাই...
কিম্বা ভেজে বেগুন-সহযোগে।
যকৃতের পক্ষে ভারি উপকার।
কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কত লোক... দাঁত ভালো থাকে। কবিরাজরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ।
বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুশি হন।
বলে–'নিমের হাওয়া ভালো, থাক্, কেটো না।'
কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না।
আবর্জনা জমে এসে চারিদিকে।
শান দিয়ে বাঁধিয়েও দেয় কেউ-সে আর-এক আবর্জনা।
হঠাৎ একদিন একটা নতুন ধরনের লোক এলো।
মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না, মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু।
বলে উঠল,–'বাহ্, কী সুন্দর পাতাগুলি... কী রূপ! থোকা-থোকা ফুলেরই বা কী বাহার... একঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে। বাহ–'
খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল।
কবিরাজ নয়, কবি।
নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না । মাটির ভিতরে শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে। ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মীবউটার ঠিক এক দশা।

নিমগাছ : বনফুল

বুদ্বু

সেদিনের কথা আমার এখানো মনে পড়ে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনা। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তিনদিন থাকার পরই আমাদের কয়েকজনকে বদলি করা হলো দিনাজপুর কারাগারে। তোমরা সবাই জানো কিনা বলতে পারিনে, সরকারি কর্মচারীর মতো সরকারি কয়েদিরও বদলি আছে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আমাদের অবস্থানটা কর্তৃপক্ষের কোনো অজানা কারণে মনঃপূত নয়, তাই আমাদের যেতে হবে সুদূর উত্তরবঙ্গে দিনাজপুরে। রাত

নটার সময় গাড়িতে চেপেছি। ফুলছড়ি ঘাটে গিয়ে যখন নেমেছি, তখন ভোর হয় হয়। খেয়া পারাপারের স্টিমারে যখন উঠেছি, তখন চারদিক অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অনেক দূরে দূরে নৌকাগুলোর ভেতর থেকে কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। শুধু যমুনার কালো জলের উপর ভোরের প্রথম আভা এসে পড়েছে আর ঝিকমিক করে উঠছে। ছলাৎ ছলাৎ জলের শব্দ শোনা যায়। ভোর হতেই কিন্তু পট পরিবর্তন হয়ে গেলো। অনেকগুলো পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনেই তাকিয়ে দেখি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র এই স্টিমারেই আছে। বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ওরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। যদিও আমাদের সঙ্গে গোয়েন্দা বিভাগের লোক ও পুলিশের লোক ছিল, তবুও আমরা খোলাখুলিই ছাত্রদের সাথে আলাপ করলাম, আর একসঙ্গে বসে চা-ও খেলাম। তারপর খেয়া পার হয়ে আবার রেলগাড়িতে চেপে দিনাজপুর স্টেশনে এসে নেমেছি। মনটা খুব দমে গেল। কোথায় আমার চিরপরিচিত ঢাকা আর কোথায় উত্তরবেঙ্গর এই প্রান্তসীমার দিনাজপুর। গাড়ি থেমে নামতেই টের পেলাম যে, হিমালয়ের কাছাকাছি এসেছি। ফাল্গুন মাস। বেলা প্রায় এগারোটা, তবু বেশ শীত। একটা চাঁদর গায়ে জড়িয়ে নিলাম। ডেপুটি-জেলার অফিসেই ছিলেন। গম্ভীর স্বরে আমাদের বসতে বললেন। ইতোমধ্যে আমাদের আসার খবর পেয়ে জেলার সাহেব ছুটে এলেন। এক নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের নিয়ে গেলেন। পরিচ্ছন্ন একটি বাংলো ঘর। সামনে এক ফালি উঠোন। মাঝখানে একটি বাতাবি লেবুর গাছ, ফুলে ফুলে একেবারে ছেয়ে আছে; অজস্র মৌমাছি এসে জমেছে আর ফাল্গুনের এলোমেলো বাতাসে চারিদিকে একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। শুনতে পেলাম, কবি কাজী নজরুল ইসলাম নাকি বন্দি হিসেবে এই জেলে বেশ কিছুদিন ছিলেন। ঐ বাতাবি লেবু গাছের নিচে চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসে নাকি কবি লিখতেন। ভাবতে পার, এই খবরটা পেয়ে কেমন লাগলো আমার?

মনটা তবু খুবই বিষণ্ন ছিল। সম্পূর্ণ একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কা মনের মধ্যে ভারি হয়ে আছে। আমরা তিনজন অধ্যাপক ও স্থানীয় একজন উকিল মোট চারজন থাকি এই বাংলোয়, আর থাকে আমাদের কাজ করার জন্য সাধারণ কয়েদি, যাদের জেলখানার নাম হচ্ছে 'ফালতু'। বিকেল বেলা জেলের ডাক্তার সাহেব এলেন। ভদ্রলোককে দেখেই আমার ভালো লাগলো। লম্বা, গৌরবর্ণ, প্রশস্ত ললাট–সমস্ত চেহারায় একটা প্রশান্ত নম্রতা। আলাপ করে খুব খুশি হলাম।

আমাদের বললেন, আমাকে স্যার, ছাত্রই মনে করবেন, যখন যা দরকার নিঃসঙ্কোচে বলবেন, আমি আপনাদের পরিচর্যার জন্যেই রয়েছি। পরদিন সকালে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডাক্তার বিদায় হলেন।

ডাক্তারের এই একান্ত আপনজনের মতো ব্যবহারে মনটা অনেকখানি হালকা হয়ে গিয়েছিল। পরদিন ডাক্তার এলেন। সঙ্গে বছর পাঁচেক বয়সের একটি সুন্দর ফুটফুটে ছেলে। দেখেই আমার খুব ভালো লাগলো। ডাক্তার বললেন, আমার ছেলে আপনাদের দেখতে এসেছে। আমি বললাম, খুব ভালো কথা। এমন একজন মহামান্য অতিথি পেয়ে আমরাও ধন্য হয়েছি। বলে কোলে তুলে নিতেই ও বিনা দ্বিধায় আমার কোলে এলো। আদর করে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কী বল তো? উত্তরে বলতে লাগলো, আমার নাম বুলু, আমার বাবার নাম শাহেদ,

আমার মায়ের নাম শামীম, আমার নানার নাম... হঠাৎ ডাক্তারের চোখে চোখ পড়তেই ও থেমে গেল। আমি বলে উঠলাম, হয়েছে, খুব হয়েছে।

একেবারে এত নাম কি আমি মনে রাখতে পারি? টেবিল থেকে বিস্কুট এনে ওকে দিলাম। বুলু বেশ সহজভাবেই খেতে লাগল। তারপর টেবিলের উপর আমার বইগুলো দেখে আমায় বললে, তুমি পড়? বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে বলতে লাগল, আমিও পড়ি–টিয়ে মার বিয়ে লাল গামছা দিয়ে... ইত্যাদি। কার সাধ্য থামায় ওকে। আমি বললাম, আমি তোমার মতো পারিনে। অল্প অল্প পারি।

শুনে ও খুব হাসল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এত বড়–পড়তে পার না? তারপর সে কি হাসি। অবশেষে ডাক্তার ওকে থামাল।

সেদিন বুলু বলে গেল। কিন্তু পরদিন আবার ঠিক সময় মতো এসে হাজির! ডাক্তার বললেন, কিছুতেই ওকে বাড়ি রাখা গেল না। ও আসবেই। হাতে একটি ছড়ার বই, ঐটি আমাকে পড়ে শোনাবে বলে নিয়ে এসেছে। অগত্যা আমাকে ওসব শুনতে হলো। ডাক্তার সংকুচিত হয়ে বললেন, আপনাকে ও প্রতিদিন খুব বিরক্ত করে। আপনার ধৈর্যের প্রশংসা করতে হয়। আমি বললাম, এমন বিরক্ত করার লোক এই বিচ্ছিন্নতার দ্বীপে কোথায় পাব আমি। বুলু না এলে আমার খুব খারাপ লাগবে।

ডাক্তারও আমার অনুরোধ রোজই বুলুকে নিয়ে আসতেন। বুলুকে নিয়ে সময় আমার বেশ ভালই কাটত। ও চলে গেলেই কেমন খালি খালি লাগত।

বদলির জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম। হঠাৎ একদিন খবর পেলাম আমার আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। আবার আমি ঢাকা জেলে ফিরে যেতে পারব। খবর পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি। আবার বুলুর কথা ভাবেতই মনটা খারাপ হয়ে গেল ! ওকে ছেড়ে থাকতে হবে–এ কথাটা যেন আর ভাবতেই পারিনে। তবু আবার ঢাকা চলে আসতে হলো।

আসবার দিন সকাল বেলায়ই ডাক্তার সাথে বুলুও এলো। আদর করে ওকে কোলে তুলে নিলাম। তারপর ধীরে ধীরে ওকে বললাম, বুলু আমি ঢাকা যাবো। তুমি আমার কাছে কী চাও?

প্রথমে বললো, আমি ও ঢাকা যাবো। তারপর কী ভেবে হঠাৎ আমার কানের কাছে এসে ফিস ফিস করে বললো, 'রাষ্টভাষা বাংলা চাই, নূরুল আমিনের কল্লা চাই।' আমি তো অবাক! এ কী কথা এতটুকু শিশুর মুখে। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললাম, ডাক্তার সাহেব, এবার আপনার সরকারি চাকুরি রাখা কাঠিন হবে। ছেলের মুখে এ সব কী শুনছি।

ডাক্তার অসহায়ের মতো বললেন, কী করব স্যার, জেলখানার সামনেই বাসা। রাতদিন মিছিলের মুখে ঐ কথাই শুনে শুনে মুখস্থ করে রেখেছে। আমি ঠেকাব কী করে?

এরপর দিনাজপুর থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আবার ফিরে এসেছি। প্রথম কদিন বুলুর জন্যে মন কেমন করতো। তাপরপর আবার ভুলে গিয়েছিলাম।

এতদিনের বিচিত্র পরিবর্তনে এসব কাহিনি ভুলেই গিয়েছিলাম... আর এ কাহিনি বলবার কথাও মনে হতো না যদি না, সেদিন আর এক কাণ্ড ঘটতো। সেদিনের পরে সতেরো বছর চলে গেছে। এক সাহিত্য সভা থেকে বাসায় ফিরছি বাসার সামনে রিকশা থেকে নামার পরেই হঠাৎ এক ভদ্রলোক আমার হাত চেপে ধরলেন: আমায় চিনতে পারেন স্যার? আমি কিন্তু আপনাকে চিনতে পেরেছি।

আমার নাম শাহেদ। আমি ডাক্তার। আপনি যখন দিনাজপুর জেলে, তখন আমি ছিলাম সেখানে ডাক্তার। তাকিয়ে থাকলাম। কিন্তু ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে সেই সতেরো বছর আগেকার ডাক্তার সাহেবের চেহারার কোনো মিলই যেন পাইনে। হঠাৎ ভদ্রলোক আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন, আপনার বুলুকে মনে আছে স্যার, বুলু? ও এবার ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বেরিয়েছিল। চাকুরিও পেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ সেদিন মশাল হাতে বেরিয়ে গেল। আর ফিরে এলো না।

ডাক্তার আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন। আমি স্তব্ধ রুদ্ধবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। বহুদিনের বিস্মৃতির অন্ধকার যে ছবিটি আমার মনের মধ্যে ফুটে উঠেছিল, তা বাইশ বছরের যুবকের নয়, পাঁচ বছরের একটি ছোট্ট শিশুর। আর মনে হলো : কানের কাছে যেন ফিস ফিস করে সে বলছে, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'।

ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেম। কোনো কথাই বলতে পারলাম না তাঁকে।

বুলু: অজিত কুমার গুহ

রহমানের মা

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সবেমাত্র স্বাধীন হয়েছে। যারা মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন তাদের স্মৃতি তখন উড়তে শেখা পাখির বাচ্চার মতো, বুঝি তা অনন্ত ভবিষ্যতের অভিসারী। দখলদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বাছাইকরা খুনেরা যে হাজার হাজার মেয়ের সম্ভ্রম নষ্ট করেছিল তাদের বীরাঙ্গনা বলা হচ্ছে এবং তারা সামাজিকভাবে সমাদর পাচ্ছেন। পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে থাকা কঙ্কাল আর করোটি সরিয়ে ফেলা হলেও সেগুলো কারও মন থেকে সরে যায়নি। ঢাকার শহিদ মিনারের চত্বর থেকে শুরু করে বুড়িগঙ্গার বাঁধ পর্যন্ত রাস্তার আশেপাশে দখলদার বাহিনী আগুন লাগিয়ে যেসব এলাকা পুড়িয়ে দিয়েছিল সেগুলোর অঙ্গার তখনো যেন কালো কালো আঙুলে শহরের আকাশকে বিধছে। এই অবস্থায় ১৯৭১-এর ২৬শে মার্চের স্বাধীনতা দিবসের সমস্ত অনুষ্ঠানে ঐকান্তিকতার সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা আর বীরাঙ্গনাদের সম্মানিত করা হচ্ছে। শহিদদের নামে এলাকায় জয়-জয়কার করা হচ্ছে। একই সঙ্গে বিশেষভাবে সম্মান জানানো হচ্ছে শহিদদের আত্মীয়-স্বজনকেও।

মহানগরীতে সভা-সমিতির একটা বড় আকর্ষণ শহিদের কোনো প্রিয়জনকে উপস্থিত করা। এই রেওয়াজ সামনে রেখে ঢাকার শহরতলিতে একটা মহল্লার অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণলিপিতে জানানো হয়েছিল সভায় রহমানের মা উপস্থিত থাকবেন। ৭১-এর ২৬শে মার্চের রাতে মহল্লার চব্বিশ পঁচিশ বছরের জোয়ান ছেলে আবদুর রহমান ইয়াহিয়া খানের সাঁজোয়া বাহিনীর বিশাল

ঢলের সামনে রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বড় রাস্তার ভাঙাচোরা নানারকম জিনিসপত্র দিয়ে তৈরি একটা ব্যারিকেডের পেছনে। বলা বাহুল্য, প্রাণ দিয়েছিল। তার প্রৌঢ় মাকে এতদিন মহল্লার সবাই চুপি চুপি সান্ত্বনা জানিয়ে আসছিল। স্বাধীনতার পরে আর সান্ত্বনা নয়। এবার সম্মান বীরের মা হিসেবে পাওনা।

একটা স্কুল বাড়ির আঙিনায় চেয়ার পেতে সভা। স্কুলের বারান্দায় মঞ্চ। তার সামনের চেয়ারগুলোতে মহল্লার গণ্যমান্য পুরুষেরা। মঞ্চে প্রধান অতিথি হিসেবে একজন নামকরা লোকের চেয়ারের পাশে সভাপতির চেয়ার, তার পাশেই রহমানের মায়ের জন্য চেয়ার। মঞ্চে টেবিলে একটা সদ্য ধোয়া সুজনির ওপর হারমোনিয়াম আর ফুলদানি। মহল্লার যে সব জোয়ান ছেলে রহমানের সঙ্গে একত্রে নানা রকম সামাজিক রাজনৈতিক কাজ করেছে, তারা ঘোরাফেরা করছে। উনিশ কুড়ি বছরের দুটি মেয়ে রয়েছে এদের সঙ্গে।

সভা শুরু হলো। মহল্লার একজন বৃদ্ধ কোরআন থেকে পাঠ করলেন। এরপর জাতীয় সঙ্গীত সোনার বাংলা গাইলো স্কুলের ছেলেমেয়েরা। সভাপতি ঘোষণা করলেন রহমানের মা আসছেন। সবাই দেখলো কয়েকজন যুবক ছেলের আগুপিছুতে রহমানের মা সভায় ঢুকছেন। একঝলকেই সবাই দেখলো তাঁকে। আপাদমস্তক বোরকায় মোড়া। পায়ে পাতলা চটি, তাদের মধ্যে শীর্ণ দুটি পা।

বোরকার বাইরে দুদিকে দুটি নিরলঙ্কার হাত মাঝে মাঝে রহমানের সাথী যুবক ছেলেদের কাঁধে ভর করা। গতি ক্ষিপ্র, বারান্দায় উঠলেন কয়েক লহমার মধ্যে আঙ্গিনায় ঠাসাঠাসি করে বসানো চেয়ারের ফাঁকগুলোকে পেরিয়ে। তাঁকে তরুণীরা চেয়ারে বসিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। প্রধান অতিথি ভাষণ দিলেন সমস্ত বাংলাদেশের পক্ষে থেকে শহিদ আবদুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। সভাপতি মহল্লার বনেদী সমস্ত বাসিন্দার পক্ষ থেকে রামানের মায়ের গৌরবের কথা বললেন একবারে ঘরোয়া ভাষায়।

বোরকায় আপাদমস্তক ঢাকা রহমানের মা কাঠের পুতুলের মতো চেয়ারে আড়ষ্ট হয়ে বসে বক্তৃতা শুনলেন। ডান হাতে ধরা রইল মুখের ওপর দুচোখের দুটো ছ্যাঁদাওয়ালা আবরণীয় ফ্যালিটি। এর পরে যথারীতি গান ও কবিতা আবৃত্তি হলো। আবদুর রহমানের যুবক সাথীরা দুচার কথা বলে চাচি আম্মাকে সান্ত্বনা জানালো। অবশেষে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করা হলো রহমানের মাকে।

রহমানের মা কোনোরকম ভূমিকা না করে বললেন, "রহমাইন্যা চাইছিল দ্যাশটারে স্বাধীন করতে। দ্যাশ স্বাধীন হইছে। এহন আপনারা দশজনে যদি দ্যাশের মাইনষেরে খাওন পরন থাকন দিবার পারেন, তাইলে আপনারা আপনেগো কামং করবেন। মহল্লার মাইয়্যা ছ্যাওয়ালগো লেহাপড়া শিখানোর এই ইস্কুলটার লাইগ্যা রহমান খাটছে। এই ইস্কুলটা যেন থাহে। আমি আমার রহমাইনারে দিছি। আর কালে কইরা বেওয়া হইছিলাম। এতটা ডাগর করছিলাম। আমার আর কিছু নাই। তবু কই। দ্যাশের লাইগ্যা যদি কাজে ডাকেন, আমু। আমি শহিদের মা। আমি রহমানের মা।"

হাততালিতে সভা জমজমাট হয়ে উঠল। এরপরেই রহমানের মা একটা অঘটন ঘটালেন।

তিনি তাঁর মুখের ওপর নেমে আসা বোরকার একফালি আবরণীকে এক ঝটকায় মাথারওপর তুলে দিয়ে সমস্ত সভার দিকে দৃপ্ত নয়নে তাকালেন। তাঁর দারিদ্র্য ও শোকে-দুঃখে শীর্ণ মুখখানিতে অপূর্ব গর্বের দীপ্তি। মহল্লার প্রবীণতমদেরও প্রতি তিনি আজ আর সংকোচ পোষণ করলেন না। পর মুহূর্তেই তিনি তাঁর পাশের তরুণী দুটিকে দুহাতে টেনে নিয়ে বারান্দা থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে কয়েক লহমার মধ্যে ঠাসাঠাসি চেয়ার আর লোক ভেদ করে সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। মুখের আবরণীটি মাথার ওপরেই তোলা রইল।

রহমানের মা : রণেশ দাশগুপ্ত

লখার একুশ

লখার রাতের বিছানা ফুটপাতের কঠিন শান। এই শান দিনের বেলায় রোদে পুড়ে গরম হয়। রাতে হিম লেগে বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়। ঠাণ্ডা শানে শুয়ে লখার বুকে কাশি বসে। গায়ে জ্বর ওঠে।

বাপকে লখা দেখে নি। চেনে না। মা তার ত্যানাখানি পরে দিনভর কেঁদে-কেঁদে ভিখ মেঙে ফেরে। লখার দিন কাটে গুলি খেলে, ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে মারামরি করে আর খাবরের দোকানের এঁটোপাতা চেটে। রাতে মায়ের পাশে লখার খিদের কষ্ট ভুলে যায়।

এই লখা, ছায়া দেখলে বুক কাঁপে যার, সে আজ ভোররাতে মায়ের পাশে থেকে উঠে পড়ল। মা গলা হাঁ করে ঘুমুচ্ছে। লখা চুপি চুপি পা ফেলে হারিয়ে গেল ধোঁয়া-ধোঁয়া কুয়াশার মধ্যে।

খানিকটা এগিয়ে উঁচু রেললাইন যেন দুটো মরা সাপ। পাশাপাশি শুয়ে আছে চুপচাপ। লখা ইটের টুকরো দিয়ে ইস্পাতে লাইনে ঠুক-ঠুক ঠুকে তার উপর কান পাতলা। হ্যাঁ, শব্দ শোনা যাচ্ছে। যেন গানের সুরলহরি বয়ে যাচ্ছে কানের ভিতর দিয়ে। লখা ভারি মজার দুষ্টু ছেলে। গানের মজা ফুরিয়ে গেলে পর এক লাফে লাইন পেরিয়ে ওপারে পৌছে গেল। সেখানে মস্ত নিচু খাদ। তার ভিতর গাড়িয়ে পড়লে হাত-পা ভাঙবে নির্ঘাত। খুব সাবধানে খাদ পেরিয়ে ওপারের ভাঙায় উঠে এলো সে। ডাঙাটা আসলে বনজঙ্গলে অন্ধকার। রাঁ রাঁ করে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে আর ধেড়ে ধেড়ে গাছের ঝাঁকড়া ছাড়া মাথা নেড়ে নেড়ে ভয় দেখাচ্ছ লখাকে।

খচ করে কাঁটা ঢুকে গেল বাঁ পায়ে। কীসের কাঁটা? হবে হয়তো বাবলা-টাবলার। লখা উবু বসে কাঁটাটা খসিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলে দিল। কিন্তু বিষ তো যায় না। কী অসহ্য যন্ত্রণা। আঁ আঁ বলে কেঁদে দিল লখা। কিন্তু কাঁদলে তো চলবে না। সময় নেই আর। তাকে যে যেতেই হবে। আবছা অন্ধকার ফিনফিনে ঠাণ্ডা। গাছের পাতা বেয়ে শিশির গড়িয়ে পড়ছে। খুক খুক করে কাশি আসছে লখার। খালি গা শিশিরে ভিজে শীত লাগছে। একটা ছ্যাঁচড়া ডাল লখার হাফপ্যান্টটা টেনে ধরেছে পিছন দিক দিয়ে। প্যান্ট আধখসা অবস্থা দৌড়াতে লাগল সে।

একটা খেঁকশেয়াল বুঝি তাকিয়ে দেখছিল তাকে। দেখুক গে। এখন ভয় ভয় করলে দেরি হয়ে যাবে। কজেই এবার চোখ-কান বুজে দৌড় শুরু করতে হলো তাকে। আর শেষটায় সেই অদ্ভুত গাছটার নিচে পৌছে গেল লখা, যার ডালে ডালে রক্তের মতো টুকটুকে লাল ফুল।

দিনের বেলায় রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে থোকা থোকা ফুলের লাল ঝুঁটির পানে তাকিয়ে থাকে সে। এখন ওই উপরের এক থোকা ফুল তার পেড়ে আনা চাই।

হাতের মুঠো পাকিয়ে মনটাকে শক্ত করে নিলো লখা। তারপর চড় চড় করে গাছে উঠে গেল। একেবারে কাঠবেড়ালির বাচ্চা যেন । মগডালের কাছাকাছি এসে কয়েকটা তুলোমিঠের মতো বড় বড় থোকা পেয়ে গেল সে। শিশিরে ভেজা তুলতুলে। তা হোক, তোমরা এখন আমার। নাও সব টুপটাপ নেমে এসো তো আমার মুঠোর মধ্যে। কষ্ট লাগছে। আহা! কীসের কষ্ট? এই তো একটু পরে আমি তোমাদের এমন একটা উঁচু জায়গায় নিয়ে রেখে দেব, যেখান অবধি তোমার এই গাছের মগডালে কোনোদিন উঠতে পারবে না। এসো, এসো, লক্ষ্মীসোনারা সব নেমে এসো তো।

ফুল নিয়ে যখন মাঠিতে নেমে এলো লখা, তখন সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে তার। কনুই ও বুকে চটচটে ঠাণ্ডা। হাত দিয়ে টের পায়, টাটকা রক্ত। গাছে ডালপালা কাঁটায় ভার্তি। গা-হাত-পা ছিড়ে গেছে আচঁড় লেগে। তাতে কী! জিতে গেছি আমি। গর্বে বুক ফুলে ওঠে লখার।

সেদিন সকাল ছিল বড় আশ্চর্য সুন্দর। আকাশে হালকা কুয়াশা। অল্প অল্প শীত। আর দক্ষিণের সামান্য বাতাস। পথে পথে মিছিলের ঢল নেমেছে। শত শথ মানুষ। হাতে ফুলের গুচ্ছ। ঠোঁটে প্রভাতফেরির গান। ধীর পায়ে শহিদ মিনারের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই ভিড়ের মধ্যে ক্ষুদে টোকাই লখাকে ঠিকই দেখা যাচ্ছে। তাকে চিনতে কষ্ট হয় না। কারণ মিছিলের সবার গায়ে চাঁদর, কোট, সোয়েটার। শুধু তার গা খোলা উদাম, গাঢ় কালো। হাত উপচে পড়ছে রক্তলাল ফুলের গুচ্ছ। মিছিলে পা মিলিয়ে সেও চলেছে শহিদ মিনারে ফুল দিতে। সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গেয়ে চলছে–আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি? কিন্তু তার গলা দিয়ে কথা তো ফোটে না, শুধু শব্দ হয় আঁ আঁ আঁ আঁ।

আসলে কথা ফুটবে কী করে? লখা যে জন্মবোবা। বাংলা বুলি তার মুখে ফুটতে পায় না। সে মনে মনে বলে–অ আ ক খ। বাইরে শব্দ হয়–আঁ আঁ আাঁ আঁ ।

লখার একুশে : আবুবকর সিদ্দিক

ব্যবহারিক বাংলা : সংক্ষিপ্ত আলোচনা

একুশে ফেব্রুয়ারি

বাংলাদেশ ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র। আর এই স্বাধীন দেশে একুশে ফেব্রুয়ারি 'শহিদ দিবস' এবং বিশ্বব্যাপী দিনটি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে খ্যাত। এটি বাঙালি জনগণের ভাষা আন্দোলনের একাধারে মর্মান্তিক ও গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিবিজড়িত একটি দিন। ১৯৫২ সালের এ দিনে (৮ ফাল্গুন, ১৩৫৯) বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে কয়েকজন তরুণ শহিদ হন। তাই এ দিন বাঙালির কাছে তারপর থেকেই 'শহিদ দিবস' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে দিবসটি জাতিসঙ্ঘের সদস্য দেশসমূহে যাথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে। বঙ্গীয় সমাজে বাংলা ভাষার অবস্থান নিয়ে বাঙালির আত্ম-অন্বেষায় যে ভাষাচেতনার উন্মেষ ঘটে, তারই সূত্র ধরে বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় ১৯৭৪ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে ভাষা-বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের মার্চে এ নিয়ে সীমিত পর্যায়ে আন্দোলন হয় এবং ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তার চরম প্রকাশ ঘটে। অবশ্য বলে রাখা ভালো, বাংলার মর্যাদা রক্ষার লড়াই চলছিল মধ্যযুগ থেকেই। এই লড়াই-ই 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন'-এ রূপ লাভ করে।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করে রাজপথে বেরিয়ে এলে পুলিশ তাদের ওপর গুলি চালায়। এতে আবুল বরকত, আবদুল জব্বার ও আবদুস সালামসহ কয়েকজন ছাত্রযুবা হতাহত হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ ঢাকাবাসী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে সমবেত হয়। নানা নির্যাতন সত্ত্বেও ছাত্রদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ জানাতে পরের দিন ২২শে ফেব্রুয়ারি পুনরায় রাজপথে নেমে আসে। তারা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহিদদের জন্য অনুষ্ঠিত গায়েবি জানাজায় অংশগ্রহণ করে। ভাষাশহিদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য ২৩শে ফেব্রুয়ারি এক রাতের মধ্যে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে গড়ে ওঠে একটি স্মৃতিস্তম্ভ, যা সরকার ২৬শে ফেব্রুয়ারি গুঁড়িয়ে দেয়। উল্লেখ্য, এই প্রথম স্মারকটির নাম ছিল 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ'। কিন্তু পরে সেখান থেকে 'স্মৃতিস্তম্ভ' বাংলা শব্দটি বাদ পড়ে এবং যুক্ত হয় আরবি শব্দ 'মিনার'। একুশে ফেব্রুয়ারি ঘটনার মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন আরও বেগবান হয়। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলে ৯ই মে অনুষ্ঠিত গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তখন থেকে প্রতি বছর এ দিনটি জাতীয়ভাবে 'শোক দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছিল।

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় ২১শে ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা ০১ মিনিটে প্রথমে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং পরে একাদিক্রমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষকবৃন্দ, ঢাকাস্থ বিভিন্ন দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এবং সর্বস্তরের জনগণ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে এসে শহিদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। এ সময় 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে

ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি' গানের করুণ সুর বাজতে থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষিত হয়। এদিন শহিদ দিবসের তাৎপর্য ধরে রেডিও, টেলিভিশন এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দেশের সংবাদপত্রগুলিও বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে।

একুশের চেতনাতেই বাঙালি স্বাধিকার আন্দোলন করে এবং সে পথ ধরেই আসে দেশের ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা। ফলে একুশের চেতনা শুধু ভাষা আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এই চেতনার বিকাশই হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি যে চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে বাঙালিরা রক্ত দিয়ে মাতৃভাষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, আজ তা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

মুক্তিযুদ্ধ

বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাসে 'মুক্তিযুদ্ধ' সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যার নেতৃত্ব দিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর এই মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়েই অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ শুরু হয় এবং ঐ বছর ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় লাভের মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের ওপর নানাভাবে বৈষম্য সৃষ্টি করে। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানিরা বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে। তারপর নানা আন্দোলনে অনেক শহিদ হয়েছেন। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের ১৬৭টিতেই আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে এবং আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একক প্রতিনিধি হিসেবে আবির্ভূত হন। কিন্তু তাঁর হাতে ক্ষমতা দেয়া হয় না অন্যায়ভবে। ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন এরপর শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা 'অপারেশন সার্চ লাইটে'র নামে বাঙালি হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। আর তখন, অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর বঙ্গবন্ধুকে আটক করে পাকিস্তানিরা অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের সব এলাকায় স্বাধীনতার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান গড়ে ওঠে। এই অভ্যুত্থানে অংশ নেয় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, পেশাজীবী নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষ। পাকপাহিনীর আক্রমণ ও গণহত্যা মোকাবেলার জন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মতো গড়ে তোলে প্রতিরোধ। শত্রু সেনারা সংখ্যায় অনেক ও তারা ছিল অনেক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, তাই মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যায় এবং যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে দেশ স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ করেন। এদিকে ১০ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার তথা মুজিবনগর সরকার

গঠিত হয়। এর আগেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ২৭শে মার্চ বাঙালিদের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি তাঁর সরকারের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং এর মধ্য দিয়েই স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সমর্থনের সূচনা ঘটে। পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনীর পাশাপাশি ব্যক্তিনামে আরও অনেক বাহিনী সংগঠিত হয়। মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা নিয়মিত ও অনিয়মিত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। অনিয়মিত বাহিনী 'গণবাহিনী ' নামে পরিচিত ছিল। নিয়মিত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের সৈন্যরা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গণপ্রজাতন্ত্রী চিন দেশ এ যুদ্ধকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে উল্লেখ করে পাকিস্তানকেই কৌশলগত সমর্থন দেয়। পক্ষান্তরে, ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তাদের মিত্র দেশসমূহ এবং জাপান ও পশ্চিমের অনেক দেশের সাধারণ জনগণ বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেয়। দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানি সশস্ত্র সৈন্যদের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র বাঙালির তীব্র লড়াই চলে। সারা দেশের এই লড়াই এগারটি সেক্টরে বিভক্ত করে পরিচালনা করা হয়েছে। যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহিদ, তিন লক্ষ মা-বোন সম্ভ্রম প্রদান করে। পাকিস্তানি বাহিনী ধীরে ধীরে এ লড়াইয়ে পরাজিত হতে থাকে। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝতে পেরে ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনারা তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আল-বদর বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নিয়ে এদেশের বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ এবং হত্যা করে। কিন্তু তারা বাংলার স্বাধীনতার সূর্য উদয়কে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিকেলে রমনা রেসকোর্সে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) যৌথ কমান্ডের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং পাকিস্তান বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। তাই ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর 'বিজয় দিবস' হিসেবে পালিত হয়। কিন্তু ১৯৭১ সালেই ১৬ই ডিসেম্বরের দিন বাঙালি স্বাধীনতার স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ, ঐ দিনও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে আটকে রাখা হয়েছিল পাকিস্তানের কারাগারে। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানের গারদ ভেঙে বঙ্গবন্ধু যখন স্বদেশের মাটিতে পদার্পণ করেন, তখনই বাঙালি লাভ করে স্বাধীনতার পরিপূর্ণ স্বাদ।

বাংলা নববর্ষ

পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ। বঙ্গাব্দের এই সূচনার দিনটি সারা পৃথিবীর বাঙালির কাছে খুবই আনন্দের। এটি একটি উৎসবও। এক সময় নববর্ষ পালিত হতো আর্তব উৎসব বা ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে। তখন এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল কৃষির, কারণ কৃষিকাজ ছিল ঋতুনির্ভর। এই কৃষিকাজের সুবিধার্থেই মুগল সম্রাট আকবর ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১০/১১ই মার্চ বাংলা সন প্রবর্তন করেন এবং তা কার্যকর হয় তাঁর সিংহাসন-আরোহণের সময় থেকে (৫ই নভেম্বর ১৫৫৬)। হিজরি চান্দ্রসন ও বাংলা সৌরসনকে ভিত্তি করে বাংলা সন প্রবর্তিত হয়। নতুন সনটি প্রথমে 'ফসলি সন' নামে পরিচিত ছিল, পরে তা বঙ্গাব্দ নামে পরিচিত হয়।

নববর্ষ পালন ঘরে ঘরে আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে হয়ে থাকে; ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে হালখাতা অনুষ্ঠান হয় আর এ উপলক্ষ্যে সমস্ত বৈশাখ মাসে বৈশাখী মেলা বসে। এ মেলা কবে থেকে

শুরু হয় তার সঠিক ইতিহাস জানা যায়নি। তবে পহেলা বৈশাখে নানা ধরনের অনুষ্ঠান, নাচ, গান, থিয়েটার, যাত্রা, পুতুল নাচ, নাগর দোলা, ম্যাজিক, খেলাধুলা, সার্কাস ইত্যাদি হয়ে থাকে। প্রতি বছর এই দিনটি সারা দেশে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

বাংলা নববর্ষে ধর্মীয় ভেদাভেদ থাকে না। সব ধর্মের লোকেরা উৎসবে আনন্দের সাথে যোগদান করে। এটি বাঙালির ঐতিহ্য হওয়ায় হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি সব ধর্মের মানুষ এই উৎসব পালন করে থাকে। বাংলাদেশে এই উৎসব আড়ম্বর পরিবেশে পালন করা হয়ে থাকে। এই দিনে বাঙালির কিছু সাধারণ রীতি আছে। তারা খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠে। তারপর ভালো খাবার গ্রহণ, সুন্দর পোশাক পরিধান এবং সত্য-সুন্দর বচনে কথা বলা–এভাবেই সারা দিন তারা কাটায়। পুরুষেরা পাঞ্জাবি আর নারীরা শাড়ি পরিধান করে সারা দিন ঘোরাঘুরি করে। এই দিন নানা ধরনের খাবারের আয়োজন করা হয়। ছোট ছেলেমেয়েরাও এই দিন খুব আনন্দ করে থাকে। ঢাকা শহরে এই দিনটি বিশেষ ভাবে পালন করা হয়। রমনার বটমূলে সবাই আনন্দের সাথে যায়। ছায়ানট ভোর থেকে 'এসো হে বৈশাখ, এসো হে বৈশাখ' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সঙ্গীতানুষ্ঠান পালন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই দিনটি এক বিশেষ উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা আয়োজিত 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' জাতিসংঘ সংস্থা ইউনেস্কোর অধরা বা ইনট্যানজিবল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান লাভ করে।

পহেলা বৈশাখে বাঙালি তাদের অতীতের সুখ দুঃখ ভুলে গিয়ে নুতনের আহ্বানে সাড়া দেয়। উদ্দেশ্য থাকে মূলত আনন্দ উপভোগ। এটা মানুষের মধ্যে আন্তরিক প্রীতির সঞ্চার করে। বাংলা নববর্ষ বাঙালির জীবনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন দৃঢ় করে। এ দিনটি আমাদের কাছে মুক্তির বার্তা বয়ে আনে। মানুষের জীবনে হতাশা দূর হয়। এই দিন মানুষের মাঝে মিলনের বন্ধন সৃষ্টি করে। তাই তারা পুরনো বছরের জীর্ণতাকে বিসর্জন দেয়, প্রভাতের আলোয় নিজেদের জীবনকে আলোকিত করার চেষ্টা করে। শহরের যান্ত্রিক জীবনে শহরবাসী এই দিনটি উপভোগ করে থাকে। বলা যায়, নববর্ষ বাঙালির মননে অনেক পরিবর্তন সাধন করে। এটাকে নিয়ে বাঙালিরা গর্ব করে। এ সামাজিক বন্ধনের রীতি অনেক আগে থেকে চলে আসছে। আগে জমিদাররা তাদের খাজনার টাকা নেওয়ার দিন প্রজাদের নানা ধরনের আপ্যায়নের বন্দোবস্ত করেন। এটাকে পুণ্যাহ বলে, আবার এই দিন মহাজনরা প্রজাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। এইভাবে এই পহেলা বৈশাখ মানুষের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধন স্থাপন করেন। এটি মানুসের মনে উদারতা ও সম্প্রীতিবোধ জাগায়। বাঙালি জাতির একটি সর্বজনীন উৎসব হলো বাংলা নববর্ষ।

এর মাধ্যমে আমাদের জাতীয় পরিচয় ফুটে ওঠে। বাংলার নববর্ষ উদ্‌যাপন বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে সুশোভিত। বাঙালির জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে এসব অনুষ্ঠানের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। এ অনুষ্ঠানগুলো অঞ্চলের গণ্ডি পেরিয়ে সর্বজনীন রূপ লাভ করেছে। নববর্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ আশা-আনন্দের স্বপ্ন দেখে। বিচিত্র আশাকে বুকে ধারণ করে এ দেশের নববর্ষ উদ্‌যাপন করে। এই দিন সারা বিশ্বের বাঙালিরা অদৃশ্য সুতোয় নিজেদের গাঁথে।

বাংলার উৎসব

উৎসব বলতে সাধারণত আনন্দের অনুষ্ঠানকে বোঝায়। ইংরেজি 'Festival' শব্দের অর্থ উৎসব। বাংলাদেশ উৎসবের দেশ। এ দেশে সারা বছর নানা ধরনের উৎসব পালন করা হয়। কারণ, বাঙালি আনন্দে থাকতে ভালোবাসে, আনন্দে রাখতে চায়। এ-দেশের বাঙালিরা নানা ধরনের উৎসব পালন করে থাকে। যেমন : সামাজিক উৎসব, ধর্মীয় উৎসব, পারিবারিক উৎসব ইত্যাদি। সময়ের বিবর্তনে এ-সব উৎসবের রূপ বদলায়। বাংলাদেশে ধর্মীয় উৎসবগুলোতে যেমন নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষ অংশগ্রহণ করেন, তেমনি সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে সমাজের নানা ধর্মের, পেশার, গোত্রের মানুষ অংশ নেই। এ-দেশে মুসলমানরা হজ, ইদুল-ফিতর, ইদুল-আযহা, মুহররম, হিন্দুরা দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা, কালী পূজা, বৌদ্ধরা বুদ্ধ-পূর্ণিমা, খ্রিস্টানরা বড়দিন পালন করে। আবার মেলা হলো সামাজিক উৎসব আর পহেলা বৈশাখ, নবান্ন ইত্যাদি হলো সর্বজনীন উৎসবের দৃষ্টান্ত।

ইদ মুসলমানদের সবেচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। বছরে দুই বার ইদ পালন করা হয়। প্রথমে ইদুল-ফিতর, পরে ইদুল–আজহা। ইদুল-ফিতরের রমজান মাসে মুসলমানরা পুরো এক মাস রোজা রাখে। ইদুল-আজহা হলো আত্মত্যাগের ইদ। একে 'কুরবানির ইদ'ও বলা হয়। এই ইদে মুসলমানরা পশু কুরবানির মাধ্যমে আল্লাহর কাছে মনের পরীক্ষা তথা মনের পশুকে তারা কুরবানি করে। মুহররম হলো একটি মাসের নাম। কারবালার ইমাম হোসেনের শহিদ হবার দিনটি মহররম মাসের ১০ তারিখে পালন করা হয়। শবেবরাত মুসলমানদের আরেকটি ধর্মীয় উৎসব। এই দিন রাতে মুসলমানরা সারা রাত ধরে আল্লাহর ইবাদত করে। এই রাতকে অনেকে ভাগ্যের রজনীও বলে থাকেন।

হিন্দুদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজার একটি পৌরাণিক কাহিনি আছে। দুর্গম নামক অসুরকে বধ করার কারণে মায়ের নাম দুর্গা। তিনি দুর্গমকে বধ করে জীবজগতকে দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা করেন। বাংলাদেশে দুর্গাপূজা হয় শরৎকালে। সপ্তমী দিনে জাঁকজমকের সঙ্গে পূজা শুরু হয়। অষ্টমীর দিনে উৎসবের ধুম হয় সবচেয়ে বেশি। দুর্গাপূজা উৎসবে হিন্দুরা সাম্য, মৈত্রী, শক্তি এ তিন আদর্শের শিক্ষা লাভ করে। এটাই দুর্গাপূজার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। 'চৈতপূজা'র উৎসব হিন্দুদের আর একটি বড় অনুষ্ঠান। এ উৎসবের আর এক নাম চড়ক পূজার উৎসব। বাংলাদেশে হিন্দুদের আর একটি উৎসবের নাম রথযাত্রা। আষাঢ় মাসে এ উৎসব পালন করা হয়। এই যাত্রা উৎসব জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা থেকে শুরু হয়। হিন্দুসমাজের অন্য একটি বিশেষ উৎসবের নাম জন্মাষ্টমী। এটা হচ্ছে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি। শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন এই তিথিতে ।

বৌদ্ধসমাজের সবচেয়ে বড় উৎসব হলো বুদ্ধ-পূর্ণিমা। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে আগত গৌতমবুদ্ধকে কেন্দ্র করে এ উৎসব পালন করা হয়। এটা মূলত বৈশাখী পূর্ণিমা। গৌতম বুদ্ধ এ ধর্মের প্রবর্তন করেন। এটি বৌদ্ধসমাজের খুবই গৌরবময় দিন। বুদ্ধের জীবন ও দর্শন গভীর অনুভূতি দিয়ে মেনে নেওয়া হলো এ উৎসবের সার্থকতা। 'জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক'–বুদ্ধের এ বাণী বুদ্ধ-পূর্ণিমার সারকথা। 'প্রবারণা' ও 'কঠিন চীবর দান' বৌদ্ধসমাজের আর একটি বড় উৎসব। প্রবারণা কথার অর্থ হল বিশেষভাবে বারণ বা নিবারণ করা। আর খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় উৎসব হলো বড়দিন। এর ইংরেজি নাম 'ক্রিসমাস'। ঐ দিন

খ্রিস্টানদের মহাপুরুষ যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন। ২৫শে ডিসেম্বর এই দিনটি পালন করা হয়।

তাছাড়া এদেশে নানা ধররে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় উৎসব পালন করা হয়। যেমন: ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে নানা ধরনের উৎসব পালন করা হয়। বাংলা বছরের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখে নববর্ষ উৎসব, হালখাতা, পুণ্যাহ, নবান্ন, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ ও মনীষীদের জন্ম উৎসব ইত্যাদি পালন করা হয়।

তবে এদেশে সব ধরনের উৎসব পালনে শালীনতা, পবিত্রতা ও প্রচলিত বিধিবিধান মেনে চলা হয়। সবাই ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করে। এমন কি ধর্মীয় উৎসবগুলোও শাস্ত্রীয় আয়োজনের পর তা সর্বজনের উৎসবে পরিণত হয়। কারণ 'ধর্ম যার যার কিন্তু উৎসব ও অংশগ্রহণ সবার'। এটাই বাংলার উৎসবের নিজস্বতা। বাঙালি বার মাসে তের উৎসবে ভেসে থাকে বলে দুঃখের পাঁক এ জাতিকে স্পর্শ করতে পারে না।

ষড়ঋতু

বাংলাদেশ প্রাকৃতির সৌন্দর্যের লীলাভূমি। আর এ প্রকৃতির নানা রূপ আমাদের মুগ্ধ করে। কবি এ দেশকে 'রূপসী বাংলা' বলেছেন। পাশ্চাত্যে চার ঋতু থাকলেও এ দেশে বার মাসে ছয়টি ঋতুর আগমন হয়। এক এক ঋতুর ধরন এক এক রকম। প্রতিটি ঋতুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে।

প্রথম ঋতুর নাম গ্রীষ্মকাল। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস নিয়ে গ্রীষ্মকাল। এই সময় তাপমাত্রা বেশি থাকে ও ধীরে ধীরে গরম পড়তে থাকে। বাংলাদেশে এ সময় সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। অধিক তাপমাত্রা এ দেশের জনজীবনে নানা ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব আনে। বিশেষ করে এই সময় ফসলের মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে যায়। কৃষকরা রোদে পুড়ে ফসলের মাঠে কাজ করে থাকেন। অপর দিকে শহরে এর প্রভাব কম নয়। এ সময় রাস্তায় খালি পায়ে হাঁটা যায় না। প্রখর রোদে রিকসা চালকরা অনেক কষ্ট করে রিকসা চালিয়ে থাকেন। এই সময় বাংলাদেশের উপর মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হওয়ার কারণে মাঝে মাঝে কাল বৈশাখী ঝড় হয়। এতে গ্রাম অঞ্চলের মানুষের ঘরবাড়ি ও জানমালের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। অনেক সময় মানুষের জীবনহানিও ঘটে। তবে গ্রীষ্মকালে নানা ধরনের ফল পাওয়া যায়। যেমন এ সময় আম, জাম, কাঁঠাল, আনারস, লিচু ও তরমুজ পাওয়া যায়। ফুলের মধ্যে ফোটে বকুল, টগর, বেলি ইত্যাদি।

বর্ষাকাল বাংলাদেশের দ্বিতীয় ঋতু। গ্রীষ্মকালের পরেই এই ঋতুর আবির্ভাব ঘটে। আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাস নিয়ে বর্ষাকাল। এক বলা হয় প্রাণের ঋতু। এ সময় থেকে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। আকাশে ঘন কাল মেঘ জমতে থাকে। আর সেই মেঘ থেকে বর্ষণের মাধ্যমে বৃষ্টি ঋতু শুরু হয়। রুক্ষ গাছপালা এবার নতুন পানি পেয়ে সজীব হয়ে ওঠে। বেশির ভাগ সময় আকাশ ঘন কাল মেঘের চাদরে ঢাকা থাকে। মাঝে মাঝে ভারি বর্ষণ হয়। বর্ষাকালে শহর ও গ্রামে দুই রকম অবস্থা দেখা যায়। অতি বর্ষণের ফলে বন্যার সৃষ্টি হয় এবং এতে গ্রামের মানুষের অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে। মানুষ কাজের জন্য বাহিরে তথা মাঠে যেতে পারে না। অনেক গরিব পরিবার এ বর্ষার সময় না খেয়েও থাকে। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারে না। চারদিকে পানি আর পানি। ফসলের মাঠে পানি জমার কারণে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। গ্রামের রাস্তা নষ্ট হয়ে যায়; ফলে তাদের চলাচলের অনেক অসুবিধা হয়। অপর দিকে শহরে বর্ষার কারণে নানা সঙ্কট সৃষ্টি হয়; স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়।

শরৎকালে আসে বর্ষাকালের পরেই। ভাদ্র আশ্বিন এই দুই মাস নিয়ে শরৎকাল । এ সময় শরতের আকাশে সাদা মেঘ ভাসতে থাকে। শরতের সোনালি রোদ যেন মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। এ সময় যেন চারদিকে রূপের দুয়ার যেন খুলে যা। এ সময় আকাশ কখনো নীল আকার ধারণ করে। নদীর তীরে সাদা কাশবন পাওয়া যায়। শরৎকালে কাশফুল, শেফালি, মল্লিকা ও শাপলা ফুলের সৌরভে ভরে যায় সমগ্র বাংলা।

কার্তিক ও অগ্রহায়ণ এই দুই মাস নিয়ে হেমন্তকালের আগমন ঘটে। হেমন্তকাল হলো ধান কাটার সময়। হেমন্তকালে কৃষকেরা নতুন ধান ঘরে তোলে। সেই ধানের চাল দিয়ে নানা ধরনের মজাদার পিঠা-পায়েস তৈরি করা হয়। এ সময় গরম কম পড়ে, হালকা শীতের অনুভব শুরু হয়। হেমন্তের প্রকৃতির আছে নিজস্ব রূপ।

শীতকাল হলো পৌষ ও মাঘ মাস নিয়ে। এ সময় তাপমাত্রা কমতে থাকে। উত্তরের হিমেল বাতাসের কারণে আমাদের দেশে প্রচণ্ড শীত পড়তে থাকে। দেশের উত্তর অংশে শীতের মাত্রা বেশি থাকে। জানুয়ারি মাসে সবচেয়ে বেশি শীত পড়ে। এ জন্য এ মাসকে শীতলতম মাস বলা হয়। এ সময় চারদিকে কুয়াশায় কিছুই দেখা যায় না। শীতকালে গ্রামে খেজুরের রস পাওয়া যায়। এ সময় নানা ধরনের সবুজ শাকসবজি পাওয়া যায়। যেমন ফুলকপি, বাঁধাকপি, শিম, মুলা ও ধনেপাতা ইত্যাদি হয়। নদী ও পুকুর শুকিয়ে যায়। কনকন শীতে মানুষ গরম কাপড় পরে।

বসন্তকালকে ঋতুর রাজা বলা হয়। ফাল্গুন ও চৈত্র মাস নিয়ে বসন্তকাল। এ সময় আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমারোহ এ সময় পরিলক্ষিত হয়। গাছে গাছে পুরাতন পাতা পড়ে যায়, নতুন পাতা গজায়। এ সময় আম গাছে মুকুল দেখা যায়। বনে বনে কোকিল ডাকে। বসন্তকালকে ঋতুরাজ বসন্ত বলা হয়। এ সময় কৃষ্ণচূঁড়া, শিমুল, পলাশ ফুল ফোটে, মানুষের মনে-প্রাণে রং ছড়ায়। বসন্তকালকে নিয়ে কবিরা নানা ধরনের রচনা করেন।

এভাবে আমাদের দেশে ছয় ঋতু বার মাসে নানা রূপ নিয়ে হাজির হয়। বিভিন্ন ঋতু প্রকৃতিকে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে তোলে। তাই বলা যায়, ষড়ঋতুর আবর্তনে বিচিত্র সৌন্দর্যের রূপে অপরূপ আমাদের এ বাংলাদেশ। পৃথিবীর আর কোনো এমন ছয়টি ঋতু দেখা যায় না।

বাংলা ভাষা

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ ও জাতির নিজস্ব ভাষা রয়েছে। বাংলাদেশের বাঙালিরও মাতৃভাষা বাংলা। বাংলা বাংলাদেশের সংবিধানস্বীকৃত একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। আকস্মিকভাবে এ ভাষা জন্মলাভ করেনি। এর রয়েছে দীর্ঘ পটভূমি।

বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। এই মতগুলোর মধ্যে কোনো ব্যাপক পার্থক্য নেই। শুধু দু'একটি স্থানে পণ্ডিতরা একমত হতে পারেননি, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। বাংলা ভাষার উদ্ভব সংক্রান্ত আলোচনা ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অভিমত সবচেয়ে বেশি মান্য হয়ে থাকে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের তালিকা থেকে বাংলা ভাষার সন্ধান করা হয়েছে। এই ভাষা বংশ পাঁচ হাজার খ্রিষ্টপূর্বকালের। এর কেন্তুম ও শতম নামে দুটি শাখা আছে। শতম থেকে ভারতীয় ও আশেপাশের ভাষার জন্ম হয়েছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন, ভারতিক ভাষা থেকে বৈদিক ও প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সৃষ্টি। খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকেই প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি। ঋগ্বেদ বৈদিক

ভাষায় রচিত। আজ বৈদিক ভাষা চলমান নেই। আর ভারতীয় আর্যভাষা অনুমান নির্ভর। আদিম প্রাকৃত প্রাচীন ভারতের এই অঞ্চলে শক্তিশালী ভাষা ছিল। পালিসহ একাধিক ভাষা এই ধারার। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দে আদিম প্রাকৃত ভাষা থেকে পালি ভাষার মতো প্রাচীন প্রাচ্য ভাষার সৃষ্টি হয় বলে শহীদুল্লাহ্ মনে করেন। আনুমানিক ৪০০ খ্রিস্টপূর্ব অব্দে এই ভাষা থেকে গৌড়ী প্রাকৃত এবং আনুমানিক ৪০০ অব্দে গৌড়ী প্রাকৃত থেকে গৌড় অপভ্রংশের সৃষ্টি। জর্জ গ্রিয়ারসন, সুনীতিকুমার সহ অধিকাংশ ভাষাবিজ্ঞানী মনে করেন মাগধী প্রাকৃত থেকেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি। কিন্তু শহীদুল্লাহ্ মনে করেন, গৌড় অপভ্রংশ থেকে আনুমানিক খ্রিস্টীয় ৫০০ অব্দে বঙ্গ কামরূপী ভাষা তৈরি হয়। তিনি বলেন, গৌড়, অপভ্রংশ এখন মৃত ভাষা। বঙ্গ কামরূপীর একটি অনুমান সিদ্ধ নাম। শহীদুল্লাহ্‌র মতে, গৌড় অপভ্রংশ হয়ে বঙ্গ কামরূপী ভাষার মাধ্যমে ৬৫০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষা স্বতন্ত্ররূপ পরিগ্রহ করে। তিনি তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' বইয়ে যা বলেছেন যে অনুসারে নিচে বাংলা ভাষার উৎপত্তি দেখানো হলো:

১। ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা – শতম (৩৫০০)
২। শতম – হিন্দ আর্য (২৫০০)
৩। হিন্দ আর্য – ভারতিক (১২০০)
৪। ভারতিক – প্রাচীন ভারতীয় আর্য
৫। প্রাচীন ভারতীয় আর্য – আদিম প্রাকৃত (৮০০)
৬। প্রাচীন প্রাচ্য – গৌড়ী প্রাকৃত
৭। গৌড়ী প্রাকৃত – গৌড় অপভ্রংশ
৮। গৌড় অপভ্রংশ – বঙ্গ কামরূপী
৯। বঙ্গ কামরূপী – বাংলা

উনিশ শতকে বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে কারো কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ভাষা সম্পর্কে সূত্র পাওয়া শুরু হয়। বিশ শতকের নবম বছরে বাংলা ভাষার জন্য উল্লেখযোগ্য সময়। ১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা ভাষা সম্পর্কে অন্যতম অবদান রাখেন। তিনি বাংলা ভাষার প্রাচীন দৃষ্টান্ত 'চর্যাপদ' গ্রন্থ আবিষ্কার করে অমর হয়ে আছেন। আর বাংলা ভাষার ইতিহাস আবিষ্কার সম্পর্কে অবদান রাখেন অনেক। যেমন বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, সুকুমার সেন প্রমুখ। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে ইত্যাদি স্থানে বাংলা ভাষার প্রচলন রয়েছে। এসব অঞ্চলে অনেকেরই মাতৃভাষা বাংলা। তা ছাড়াও যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা সহ পৃথিবীর বহু দেশেই বাঙালি জনগণ রয়েছে। সেসব স্থানে বাংলা অনেকের মাতৃভাষা। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৩০ কোটি লোকের মাতৃভাষার বাংলা। মাতৃভাষার দিক থেকে বিশ্বে বাংলা ভাষার স্থান চতুর্থ।

বাংলার লোকসংস্কৃতি

সংস্কৃতি বলতে সাধারণত মানুষের জীবনাচরণকে বোঝায়। ইংরেজি 'কালচার' শব্দের অর্থ সংস্কৃতি। আর বাংলাদেশের গ্রামীণ বা লোকায়ত মানুষের সাধারণ জীবনাচরণকে 'লোকসংস্কৃতি' বলে। বাংলার লোকসংস্কৃতি অনেক সমৃদ্ধ। এটা গ্রামীণ মানুষ নিজেদের ঐতিহ্য হিসেবে পালন

করে থাকে। সুতরাং গ্রামীণ মানুষের জীবনযাপন, খাদ্যাভ্যাস, চালচলন, রীতিনীতি, আনন্দ-বিনোদন হিসেবে দীর্ঘদিন যেসব পালন করা হয় তা আমাদের লোকসংস্কৃতির অংশ।

লোকসম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস ও আচার-আচরণ, জীবন-যাপন প্রণালি, চিত্তবিনোদনের উপায় ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে এই সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। বাংলাদেশ একটি গ্রাম-প্রধান দেশ। গ্রামের বিশাল জনগোষ্ঠী নিজস্ব জীবন প্রাণালীর মাধ্যমে শতকের পর শতক ধরে যে বহুমুখী ও বিচিত্রধর্মী সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে, তাই লোকসংস্কৃতি। আমাদের লোকসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হলো গ্রামীণ মানুষের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উৎপাদন, খাদ্যদ্রব্য, ধর্মকর্ম ও চিত্তবিনোদন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাকে অবলম্বন করেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। আমাদের দেশে তাঁতিরা তাঁতে বোনা সাধারণ শাড়ির সাথে মসলিন, জামদানি ইত্যাদি শাড়ি তৈরি করে। বাংলার কুমার সম্প্রদায় মাটি দিয়ে নানা ধরনের জিনিস তৈরি করে থাকেন, যেমনঃ তারা মাটি দিয়ে হাঁড়ি-পাতিল, দেবদেবীর মূর্তি, মনসার ঘট, লক্ষ্মীর সড়া ইত্যাদি বানায়। বাংলার ছুতাররা কাঠের নানা ধরনের মনোরম আসবাবপত্র নির্মাণ করে থাকে। যেমনঃ খাট পালঙ্ক, দরজা, চৌকাট, নৌকা নির্মাণ–এসবই লোকসংস্কৃতির অংশ। এক সময় বাংলায় ময়ূরপঙ্খি, সপ্তডিঙ্গা, চৌদ্দডিঙ্গা প্রভৃতি নৌকার সুনাম ছিল। গ্রামের মানুষ বাঁশ ও বেত দিয়ে নানা ধরনের জিনিস তৈরি করত। আবার পাট দিয়ে বাংলার মানুষ নকশি করা শিকা বানাতে পারত। নারীরা মনের মতো করে নানা ধরনের নকশি কাঁথা বানায়। এই নকশি কাঁথা বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম অংশ। নকশি কাঁথায় তারা ফুল পাতা ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর নকশা করত। বাংলার গ্রামের মানুষ রান্না-বান্নায় সুনাম অর্জন করেছে। তারা নানা ধরনের মজাদার মিষ্টান্ন ও পিঠা বানাতে পারে। এমনভাবে বাংলায় অজস্র লোকজ সংস্কৃতির উপাদান এদেশের গ্রাম বাংলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

বাংলার লোকসংস্কৃতির নানামাত্রিক রূপ আছে। যেমন লোককাহিনি, লোকসংগীত, লোকগাথা, লোকনাট্য, ছড়া, ধাঁধা, মন্ত্র, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি। তাছাড়া লোককথা, ব্রতকথা, কিংবদন্তি ও লোকপুরাণ ইত্যাদিও বাংলার এ ধারার অন্তর্গত। এর মধ্যে প্রধান হলো লোকসংগীত। জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদি, মারফতি, বাউল, গম্ভীরা, কীর্তন, ঘাটু, ঝুমুর, বোলান, আলকাপ, লেটো, গাজন, বারমাসি, ধামালি, পটুয়া, সাপুড়ে, খেমটা ইত্যাদি আমাদের লোকসংগীতের অন্তর্গত। এ গানগুলো সাধারণ গ্রামবাংলার মানুষের জীবন নিয়ে গাওয়া হয়। নদী ও নৌকাকে কেন্দ্র করে মাঝিরা ভাটিয়ারি গান গেয়ে থাকেন। যেমন বাংলাদেশে কুষ্টিয়া অঞ্চলে বাউল, পূর্বাঞ্চলে জারি গান, ঢাকা ফরিদপুর, ময়মনসিংহ অঞ্চলে ভাওয়াইয়া গান, রাজশাহী অঞ্চলে গম্ভীরা, সিলেট অঞ্চলে ভাটিয়ালি গানের প্রচলন আছে।

এ দেশে নানা ধরনের লোকক্রীড়া বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে। সাধারণত গ্রাম বাংলায় বলিখেলা, নৌকা বাইচ, বউছি, দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, নুনতা, চিকা, ডাংগুলি, কড়িখেলা, কানামাছি, ঘুড়ি উড়ানো, কবুতর উড়ানো, মোরগের লড়াই, ষাঁড়ের লড়াই ইত্যাদি বাংলার গ্রামীণ পরিবেশে হয়ে থাকে; যা আমাদের লোকসংস্কৃতির উপাদান। এছাড়াও বাংলার নানা চিত্রকলার মধ্যে এর পরিচয় পাওয়া যায়। পটচিত্র, ঘটচিত্র, দেওয়ালচিত্র, অঙ্গচিত্র, আপলনা আঁকাও আমাদের এ সংস্কৃতির অংশ।

বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি এ দেশের একটি বিশাল সম্পদ। আমাদের গ্রামীণ পরিবেশে যেসব নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে তা নানা কারণে কিছু কিছুবিলুপ্তির পথে। আমাদের এই লোকজ সম্পদকে সবার সচেতন মানসিকতা দিয়ে টিকিয়ে রাখতে হবে।

মানবতা ও নৈতিকতা

মানবতা ও নৈতিকতা দুইটি বিশেষ গুণ। প্রাণী হয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে কিন্তু তাকে 'মানুষ' হয়ে উঠতে হয় এবং নৈতিকতা অর্জন করতে হয়। এর কোনোটিই সহজাত নয় আবার কঠিনও নয়। মানবতার অপর নাম মনুষ্যত্ব অন্যদিকে, নৈতিকতা হলো মানুষের ব্যক্তির বিবেকের ওপর নির্ভরশীল। মানবতার মধ্যেমানুষের প্রতি ভালবাসা, মমত্ববোধ, দরদ ও দায়িত্ববোধ থাকে। মানবতা হলো একজন মানুষের মহৎ গুণাবলির সমাহার। আর নৈতিকতা এমন এক অর্জন যা সর্বজনীন। প্রচলিত সমাজ, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে বিবেক-সংশ্লিষ্ট চেতনাই নৈতিকতা।

এক কথায় মানুষের মহৎ গুণাবলিকে মনুষ্যত্ব বা মানবতা বলা হয়। মানবতায় মানুষকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অতএব ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও সম্প্রদায়ের বাইরে একজন মানুষকে মানুষ হিসাবে পরিচয় দেওয়াকে মানবতা বলা হয়। যেমন, মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান কবি চণ্ডীদাস বলেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' এই মানবতা মানুষের মধ্যে অপরের প্রতি ভালবাসা ও মমত্ববোধের জাগরণ ঘটায়। মানবতায় মানুষের অধিকারের কথা বলা হয়। যেমন, অসহায় মানুষের সেবা করা, দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করা। মানবতা সম্পর্কে কাজী নজরুল ইসলাম বলেন: 'আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই,/ বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর/অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'

নৈতিক অধিকার বলতে আমরা যে সব অধিকারকে বুঝি তা নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে উৎসারিত। সমাজের নৈতিকতা থেকে নৈতিক অধিকারের উদ্ভব। যে গুণ মানুষকে অন্যায় হতে বিরত রাখে এবং ন্যায় কাজে নিয়োজিত করে তাকে নৈতিকতা বলে। যেমন দরিদ্রদের সাহয্য পাবার অধিকার একটি নৈতিকতার দৃষ্টান্ত। নৈতিক অধিকার রাষ্ট্র নির্ধারণ বা প্রবর্তন করে দেয় না। এ অধিকার না মানলে রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে না। তাই নৈতিকতাকে আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। নৈতিকতা একটি সামাজিকভাবে স্বীকৃত গুণ, যা বাধ্যতামূলক ভাবে আরোপ করা যায় না।

ইংরেজি Morality শব্দ থেকে নৈতিকতা শব্দটি এসেছে। এটি ল্যাটিন শব্দ Moralitas থেকে নেওয়া হয়েছে। Moralitas বলতে সাধারণত ভাল আচরণ ও চরিত্রকে বোঝায়। অতএব Moralitas বা নৈতিকতা বলতে এমন এক ধনের কতিপয় বিধানকে বোঝায় যার দ্বারা মানুষ তার বিবেকবোধ ও ন্যায়বোধ ধারণ ও প্রয়োগ করে। Dictionary of Social Science বইতে নৈতিকতা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা হলো,"নৈতিক অধিকার যা মানুষের অনুভূতির উপর নির্ভরশীল এবং এগুলো কোনো বৈধ কর্তৃক সুক্ষিত নয়।" আবার জোনাথন হেইট-এর মতে, 'ধর্ম, ঐতিহ্য এবং মানব আচরণ–এ তিনটি থেকেই নৈতিকতার উদ্ভব হয়েছে।' নীতিবিদ ম্যুর-এর মতে, "শুভর প্রতি অনুরাগ ও অশুভর প্রতি বিরাগই হচ্ছে নৈতিকতা।"

নৈতিকতা হলো দর্শনের এমন একটি শাখা যার মাধ্যমে মানুষ নির্দিষ্ট আচরণ ও কার্যক্রমের

সূত্র সম্পর্কে মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেষ্ট হয়। তবে নৈতিক অধিকারের পেছনে সমাজের সমর্থন রয়েছে। কোনো ব্যক্তি এ অধিকার ভঙ্গ করলে সমাজে তার তীব্র সমালোচনা হতে পারে। সার্থক ও সুন্দর সামাজিক জীবনের জন্য নৈতিক অধিকার অত্যাবশ্যক। নৈতিক অধিকার ব্যক্তি ও সমাজভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। নৈতিক কর্তব্য ব্যক্তি ও সমাজের নীতিবোধের উপর নির্ভরশীল। কোনো ব্যক্তি নৈতিক কর্তব্য পালন না করলে রাষ্ট্র তাকে শাস্তি দিতে পারে না। তবে এ জন্য তাকে সামাজিক ধিক্কার ও সমাজ কর্তৃক নিন্দনীয় হতে হয়। আবার ব্যক্তিও সমাজের জন্য অনুসরণীয় নৈতিক কর্ম পালন করতে পারে। যেমন, কোনো দুস্থ প্রতিবেশীর নিয়মিত সেবা করে কোনো ব্যক্তি তার সমাজে দৃষ্টান্ত রাখতে পারে। এটি নৈতিক শিক্ষায় গ্রহণযোগ্য। তাই মানবতা ও নৈতিকতাপূর্ণ সমাজগঠনের পূর্বসূত্র ব্যক্তিমানুষের মানবিক ও নীতিবান হওয়া।

বিশ্বায়ন

বিশ্বায়ন শব্দের অর্থ বিশ্বকে একীভূত করা; বিভিন্ন দেশের মধ্যকার দূরত্ব ও তারতম্য কাটিয়ে ওঠা। সাধারণ অর্থে বিশ্বায়ন বলতে বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও পরিবেশ তাত্ত্বিক বিষয়ে একে অপরকে সাহায্য এবং সমস্যা থেকে উত্তরণকে বোঝায়। এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক বিদ্যমান। তবে, একে ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করলে নেতিবাচক দিকগুলো প্রাধান্য পায় না।

বিশ্বায়ন সম্পর্কে মালয়েশিয়ার রাজনীতিবিদ জি রাজাস্কেরন বলেন, "বিশ্বায়ন অর্থ হলো বাজার উন্মোচিত হওয়া ও বিনিয়োগে আকৃষ্ট করানো।" খুব সাধারণভাবে বিশ্বায়ন হলো দ্রব্য–উৎপাদন, বিনিয়োগ ও প্রযুক্তির আন্তঃদেশীয় অবাধপ্রবাহ। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশ্বায়ন হলো সমগ্র বিশ্বকে একটি মাত্র বিশাল বাজারে পরিণত করা। নানা ধরনের বিশ্বায়ন হয়ে থাকে। যেমন তথ্যগত বিশ্বায়নে ইন্টারনেট, ই–মেইল, ই-কমার্সের দ্বারা ঘরে বসে ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নে মূলধন, শ্রম বিনিয়োগ, উপকরণ ও বাজার উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। যেমন, বিশ্বব্যাংক, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ইত্যাদি বর্তমানে বিশ্বের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করছে। তাছাড়া সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের ফলে উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশ অপসংস্কৃতির স্বীকার হচ্ছে।

বিশ্বায়নের অনেক ইতিবাচক দিক আছে। মানুষ জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি, কম্পিউটার, ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষ খুব সহজে ঘরে বসে সব খবর জানতে পারছে। এর ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক মজবুত হচ্ছে। বৃহৎ বাজার থাকার কারণে উৎপাদন ও বিপণন অনেক সহজ হয়েছে, অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, আর আন্তর্জাতিক সংঘাত অনেকটা কমেছে। তবে এর আবার নানাবিধ নেতিবাচক প্রভাবও আছে। আর এতে ক্ষতির শিকার হন উন্নয়নশীল দেশগুলো। মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণে দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ দেশগুলো অনেক লোকসানের শিকার হন। এর মাধ্যমে ধনী দেশগুলো আরও ধনী হচ্ছে আর গরিব দেশগুলো আরও গরিব হচ্ছে। আর এ বিশ্বায়নের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হচ্ছে। দরিদ্র দেশের অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে দেশের অনেক শ্রমিক কাজ

হারিয়ে বেকার হয়ে যাচ্ছে। আর এর ফলে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তাও রক্ষা করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। অনেক দেশে অপসংস্কৃতি প্রবেশ করছে; যার কারণে সে দেশের সংস্কৃতির বিপর্যয় ঘটছে।

বাংলাদেশেও বিশ্বায়নের ইতিবাক প্রভাবের কারণে আমাদের দেশের রপ্তানিবাণিজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, দেশে বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো গেছে, না-খেয়ে মানুষ থাকে না, পরনে পোশাক আছে সবার, আমাদের পণ্য যেমন বাইরের দেশে আছে, বাইরের দেশের পণ্য তেমনি আছে আমাদের দেশে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের এ বিষয়ে অনেক করণীয় বিষয় আছে। যেমন রাষ্ট্রের তথ্য প্রযুক্তিগত অবকাঠামো আরো উন্নয়ন করতে হবে। সামাজিক, অর্থনৈতিক বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা খাতে দক্ষ জনশক্তি বিনিয়োগ করতে হবে, তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কে নিত্য নতুন চিন্তাভাবনা ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন করতে হবে, সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে, দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সুন্দর রাখতে হবে। বিশ্বায়ন যদিও যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনেক অবদান রেখেছে; তবুও অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন সর্বত্র সমানভাবে বণ্টন করা হবে। এজন্য প্রয়োজন সুষম মানের সম্পদ উন্নয়ন, রাজনৈতিক সহনশীলতা ও সুনীতি, সম্পদের সুষম বণ্টন ও স্বচ্ছ প্রশাসনিক কাঠামো। বিশ্বায়নের পথে বাংলাদেশের যাত্রা অবশ্যই সফল হবে।

আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি

আধুনিক যুগ তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। একে ইংরেজিতে 'Information technology (IT)' নামে অভিহিত করা হয়। বর্তমান যুগে প্রযুক্তি জীবনকে সহজ ও উন্নত করেছে। সাধারণত তথ্যসংরক্ষণ ও একে ব্যবহার করাকে তথ্য-প্রযুক্তি বলা হয়। এই তথ্য-প্রযুক্তির সফল ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক দেশ অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছে।

যুগের পরিবর্তের সাথে সাথে নানা ধরনের প্রযুক্তি বর্তমানে দেখা যায়। কিছুদিন আগেও রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখন প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ফ্যাক্স, সেলুলার ফোন, পেজার, স্যাটেলাইট টেলিফোন ও মোবাইল ইত্যাদি বহু উন্নততর সরঞ্জাম তৈরি হয়েছে। আর তথ্য-প্রযুক্তি মধ্যে অন্যতম হলো ফাইবার অপটিক ক্যাবল। এটি আবিষ্কারের পর এর দ্বারা বিপুল পরিমাণ তথ্য আদান-প্রদান করা যায়। এর মাধ্যমে আলোকরশ্মি পরিবাহী ফিলামেন্টের তারের ভিতর দিয়ে প্রতিসরণের মাধ্যমে একই সাথে অসংখ্য টেলিফোন কল, টেলিভিশন সংকেত ও বিপুল পরিমাণ তথ্য প্রেরণ করা যায়। বর্তমানে এটি ব্যবহার করে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে বিপুল পরিমাণ উপাত্ত পরিবহণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশেও বর্তমানে এটি ব্যবহারের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। টেলিকনফারেন্স এমন একটি প্রযুক্তি যার সাহায্যে একই স্থানে না এসে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের একদল লোক সভায় মিলিত হতে পারে। এতে অনেক সময় ও অর্থের আশ্রয় হয়। অন্য একটি প্রযুক্তির নাম হলো বুলেটিন বোর্ড। এর অন্য নাম বিবিএস যা এক ধরনের কম্পিউটার । এতে টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে প্রবেশ করা যায়। এর ব্যবহারকারী নিজের কম্পিউটারে টেলিফোন সংযোগের মাধ্যমে বোর্ডের সংরক্ষিত সংবাদ দেখতে পারে।

ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার-এর মাধ্যমে লেনদেনের কাজ করা হয়। এতে সময় অপচয় কম হয়। আধুনিক সময়ে টেলিফোন ও ডেটা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক উপায়ে দ্রুত অর্থ

স্থানান্তর করাকে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার বলা হয়। ইন্টারনেট হলো সবচেয়ে বহুল ব্যবহারিক তথ্য-প্রযুক্তি। নানা ধরনের software মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন :

১. Telenet (Telephone Network): এর মাধ্যমে ইন্টারনেটের সাহায্যে এক কম্পিউটারকে অন্য কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত করা হয়।
২. FTP Session (File Transfer Protocol): এর মাধ্যমে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে ফাইল আদান-প্রদান করা হয়।
৩. IRC (Internet Relay Chat): এর মাধ্যমে অনেক ইন্টারনেট ব্যবহারকারী নিজেদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে পারে।
৪. E-mail (Electronic Mail): এর মাধ্যমে একজন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী তাৎক্ষণিক ভাবে অন্য ইন্টানেট ব্যবহারকারীর সাথে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে।
৫. Copies: এর মাধ্যমে খুব সহজে ফাইল কপি করা যায়।
৬. WWW (World Wide Web): এখানে তথ্যগুলো মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে একই সময়ে চিত্র ও শব্দ সহকারে পাওয়া যায়।
৭. Net News: এর মাধ্যমে খুব সহজে নিউজ গ্রুপগুলোর মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করা হয়।

ইন্টারনেট প্রোটোকল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানে কিছু নিয়মনীতি প্রদান করে। যাতে সহজে তথ্য ব্যবহার ও আদান প্রদান করা যায়। যেমন :

১. Internet Network Information Center বা INIC এরা ডোমেইন নামে রেজিস্ট্রি করে।
২. Internet Society–ইন্টারনেট প্রোটোকল কি হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে।
৩. World Wide Wel Consortium–ভবিষ্যতে ওয়েব প্রোগ্রামিং ভাষা কি হবে।

বর্তমানে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে নানা অসাধ্য কাজ সম্ভব হয়েছে। এটি ব্যবহার করে কিছু দেশ যেমন উন্নতি করেছে; সাথে সাথে উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও এই তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে অবস্থার উন্নয়ন করার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশেও আধুনিক সময়ে ব্যাপক ভাবে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। সরকারি কাজে বর্তমানে তথ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যাপকভাবে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। ভর্তিপরীক্ষা, চাকরিপরীক্ষা ইত্যাদিতে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। যেমন: কালিয়াকৈরে ২৬৪ একর জমির উপর 'হাইটেক পার্ক' এবং মহাখালিতে ৪৭ একর জমির উপর 'তথ্যপ্রযুক্তি পল্লি' স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া আমাদের দেশে তথ্য-প্রযুক্তির শিক্ষাপ্রদানের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে। যাতে আগামী প্রজন্ম তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষ ও উন্নতি সাধন করতে পারে।

দ্বিতীয় খণ্ড

সাহিত্য